হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

১

সম্পাদনায়

গীতা দত্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-বারো

প্রকাশিকা :
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯

অলঙ্করণ :
সুব্রত ত্রিপাঠী

পুস্তানির ছবি :
বিমল দাস

বাঁধাই :
সুবর্ণ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০১ বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

গ্রাহক মূল্য :
পনেরো টাকা

দাম : পঁচিশ টাকা

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা

বাংলার শিশুসাহিত্যে বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত চল্লিশ বৎসর কাল যে নামগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে কবি, নাট্যরসিক ও গাল্পিক হেমেন্দ্রকুমার রায় সেগুলির অন্যতম। যদি কেউ বলেন এই সময়টায় শিশুরঞ্জন সাহিত্যে গল্পরসস্রষ্টাগণের তিনিই ছিলেন মধ্যমণি তাহলে তা অত্যুক্তি হয় না। এই দীর্ঘ সময়টার অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরাই বলবেন, শিশুপাঠ্য কোন বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকা বা বার্ষিক সংকলনে যদি তাঁর কোন গল্প না থাকতো তাহলে শিশুপাঠকসমাজের কাছে তা লাগতো বিস্বাদ। 'বিখ্যাত' শব্দটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য, তাঁর রচনার যোগ্য ঠাঁই ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুখ্যাত পত্রিকাগুলি। তবে এরূপ পত্রিকা ছিল, দু-একটি মাত্র। তদ্ব্যতীত সাহিত্য-রচনাকে তিনি বৃত্তিরূপে গ্রহণ করায় তাঁর জীবিকার্জনের ক্ষেত্রও হয় সাময়িক পত্রিকাদি। সেকালে লেখককে, বিশেষতঃ অত্যন্ত শক্তিশালী লেখককে, পারিশ্রমিক দেওয়া পত্রিকাগুলির অধিকাংশেরই ছিল সাধ্যাতীত। আজকালও এই অবস্থার যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে, অবস্থা দৃষ্টে তা বলা যায় না। হেমেন্দ্রকুমারের রচনা ছিল যে কোন সাময়িক পত্রিকা বা বার্ষিক সংকলনের পক্ষে অপরিহার্য মূল্যবান সম্পদ।

তাঁর রচনায় হাস্যরস ছিল না, করুণ রস তো নয়ই। বাংলায় তাঁর সুবিশাল পাঠক-সমাজ আমার কথা সমর্থন করবে, এ ভরসা রাখি। তাঁর রচনায় ছিল পৌরুষ প্রকাশিমনের আকাঙ্খাস্ফুরণের আনন্দ, যা দুর্দম, অজেয় ও বিপদসংকুল তাকে আয়ত্তাধীন করার উল্লাস। দেহ ও মনের বল-বীর্য-বুদ্ধি দিয়ে অজানাকে করতলগত করতে যে আনন্দমিশ্রিত শ্রান্তি-ক্লান্তিময় শ্রমের প্রয়োজন, মৃত্যু বা বিনষ্টিকে উপেক্ষা করার যে শক্তির আস্বাদ—কিশোর পাঠকসমাজ তাঁর পরিচ্ছন্ন রচনায় তাই লাভ করতো। ফলে তিনি হন তাদের অতি প্রিয়, অতি শ্রদ্ধাস্পদ 'হেমেন্দ্রকুমার রায়', বয়ঃকনিষ্ঠ সাহিত্যিক মহলের 'হেমেনদা'। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয়ের (পরশুরামের) একটি কথা। কর্মব্যপদেশে তাঁর কাছে একদিন গেছি। কথায় কথায় বাংলার শিশু-সাহিত্যের বিষয় উঠতে বলেন, বাংলার শিশুসাহিত্যে 'অ্যাডভেনচার কাহিনীর দরকার।' তখন বাংলার শিশুসাহিত্যে 'অ্যাডভেনচার' ছড়িয়ে পড়েছে। সেই দুঃসাহসিক অভিযানের পুরোধা বা পথিকৃৎ যাই বলা যাক—হেমেন্দ্রকুমার রায়। তাঁর পাশে পাশে লেখনী সঞ্চালন করতে করতে চলেছেন,

'অন্ন-ডালভোজী' স্বল্পশক্তিমান, লেখককুল। হেমেন্দ্রকুমার 'মৌচাকের' পাতায় ভর দিয়ে নির্ভয়ে চলেছেন, আসামের দিকে 'যকের ধন'-এর সন্ধানে সুবিশাল পাঠক সমাজে কি হয়-কি হয় ভাব। আর তাঁর আশপাশের যাঁরা তাঁরা ঘুরছেন, বন-জঙ্গলে বা আর কোথাও। কে বা সে সন্ধান রাখে?

বলেছি, তিনি শিশুসাহিত্যে করুণরসের বিরোধী ছিলেন। তাঁর রচনার এই বৈশিষ্ট্য ধরতে পারিনি যতদিন না তিনি আমাকে বলেছেন। একবার বিখ্যাত শিশু-সাময়িকপত্রে মৎ রচিত একটি অলৌকিক বিষয়ক গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে কিয়ৎ পরিমাণ কারুণ্যরস ছিল। হেমেন্দ্রকুমারেরও অনেক রচনা অলৌকিকতা ভিত্তিক। তিনি পরলোকে বিশ্বাসী ছিলেন। উক্ত পত্রিকা-আফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পরোক্ষে আমাকে বললেন, 'আমি ছেলেদের কাঁদানো পছন্দ করি না।' এবং কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করেন। ধারণা ছিল, তিনি অপরের, অর্থাৎ সাধারণ লেখকের রচনা পড়েন না। কিন্তু তাঁর কথায় আমার সে ধারণা পরিবর্তিত হয়। আমি বিনা মন্তব্যে অগ্রজ সাহিত্যিকের কথাগুলি শুনি। কিন্তু নিজেকে সংশোধন করতে পারি না, কারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য, জীবন-দর্শনে বৈচিত্র্য, অভিজ্ঞতায় বিভিন্নতাই তো সাহিত্যিক রচনার ভিত্তি।

অপরাপর সাহিত্যিকের মতোই তিনিও একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের ধারক ছিলেন এবং তা থেকে কোনদিন বিচ্যুত হননি বা অপরকে স্বীয় মতাবলম্বী করতে প্রয়াস পাননি অথবা তাকে পরিহার করে তাঁকে চলতেও দেখিনি। তাঁর সুহৃদ্‌বর্গের মধ্যে সকলেই ছিলেন গুণান্বিত খ্যাতিমান এবং তাঁর প্রায় সমবয়সী ও সমমতাবলম্বী। আর, সকলেই ছিলেন মজলিসী। কিন্তু মজলিসীর সে দিনও নেই; কবে তা ভেঙে গেছে। আজ মজলিসও কোথাও বসে না, বসতে পারে না, বসবেও না। এ হলো শিল্পায়নের ও গতির যুগ।

আজ থেকে প্রায় বাইশ বৎসর আগে তাঁর জীবদ্দশায় একখানি গ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম, আজ তার কিয়দংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এটি একটি লেখনী-চিত্র মাত্র যা তিনি নিজে দেখেছিলেন। কোন মন্তব্য করেছিলেন কিনা আজও জানতে পারিনি।

'...বাংলার শিশুসাহিত্যে কত সাহিত্যিক কত রকমের "অ্যাড্‌ভেনচার" করেছেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা সম্ভব অসম্ভব বহুদেশ ঘুরেছেন, বহু সম্ভব-অসম্ভব কর্মে পাঠক-পাঠিকাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ কর্মে "সম্রাটের" আসন দেওয়া হয় (শ্রী) হেমেন্দ্রকুমার রায়কে। অবশিষ্ট সকলকে তাঁর তুলনায় রাজা-মহারাজা ও সামন্তের আসন দেওয়া ছাড়া আর জায়গাও

তো নেই। বাংলার শিশুসাহিত্য-রাজ্যে এই এক বিপদ। ক্ষেত্রটি ক্ষুদ্র কিন্তু প্রকাশকদের প্রতিযোগিতায় 'সম্রাট' তিনজন এবং তিনজনই জীবিত। সৌভাগ্যক্রমে আজও সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ শুরু হয়নি। তবে এটা জানা আছে হেমেন্দ্রবাবু একদিন ঐ শব্দটিতে আমার কাছে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। এ তাঁর মার্জিত রুচিরই পরিচায়ক। তাঁর রচনাশৈলীরও বৈশিষ্ট্য এইটেই। 'সখা ও সাথীতে' ভুবনমোহন রায় এক সময়ে রচনা করেন 'সুন্দরবনে সাত বৎসর'। কিন্তু রচনাটি তিনি শেষ করতে পারেননি। সে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের কথা। তারপর থেকে বাংলার শিশুসাহিত্যের বিস্তার নানাদিকেই ঘটেছে। কিন্তু 'অ্যাড্‌ভেনচারের' দিকে হেমেন্দ্রবাবুর যা দান তাকে পথিকৃতের দান বললেও ভুল হয় না। কারণ, তাঁরই পাশাপাশি সমসাময়িক আরও অনেকে বাংলার শিশুসাহিত্যকে এইদিকে সমৃদ্ধ করতে তৎপর হন, সম্ভবতঃ তাঁরই রচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে।

'হেমেন্দ্রবাবুকে ছাত্র-ছাত্রীগণ আজ হয়তো শিশুসাহিত্যিকের আসন দেবে; কিন্তু এক সময়ে তিনি রচনা করতেন বয়স্কগণ পাঠ্য রস-সাহিত্য। ছাত্রাবস্থায় আমরা তা সানন্দে পান করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছি। রঙ্গালয়ে ও ছায়াচিত্রালয়েও তাঁর শিল্পীমনের দান আছে। কবিতা রচনায়ও তাঁর নৈপুণ্য সর্বজনবিদিত। তবে চিত্রবিদ্যায় তিনি পারদর্শী কিনা এবং নৃত্যবিদ্যায় কতটা কৃতিত্ব অর্জন করেছেন জানি না, যদিও এক সময়ে তাঁর 'নাচঘর' (পাক্ষিক পত্রিকা) ছিল। জনৈক সাহিত্য-বন্ধু আমার এই কথাগুলি পাঠ করে বলেন, এদিকেও তাঁর পারঙ্গমতা ছিল। পরে তিনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিশু-পাঠ্য মাসিক পত্রিকা 'রংমশাল' হাতে নিয়ে তার রঙিন আলোয় পাঠকমহলকে আনন্দ দিয়েছেন।

'হেমেন্দ্রবাবুর বয়স এখন ষাটের অনেকটা ঊর্ধ্বে কিন্তু মাথার দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশগুলি এক জায়গায় বিরল হয়ে এলেও একগাছিও শাদা হয়নি, অন্ততঃ আমাদের চোখে পড়ে না। নাতিদীর্ঘ, শীর্ণকায় মানুষটি বংশদণ্ডের মতো এখনও সরল। গায়ের রং কৃষ্ণাভ, গুম্ফমণ্ডিত মুখে একটা থমথমে ভাব, চশমার পিছনে চোখ দুটি একটু তন্দ্রালু, কণ্ঠস্বর স্থূল কিন্তু উচ্চারণে যেন ঈষৎ জড়িমা। যেমন অনেকেরই আছে তেমনি তাঁরও সকল বিষয়ে একটি নিজস্ব ও দৃঢ় মত আছে, যা তিনি ছাড়তে নারাজ।...'

একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে ওঠে, হেমেন্দ্রকুমারের রচনার অত্যধিক জনপ্রিয়তার মূলে কি ছিল—উপজীব্য অথবা রচনাশৈলী? আমাদের মত উভয়ই। কিন্তু

উপজীব্যগুলি যে সব সময়ে তাঁর আশপাশ থেকে সংগৃহীত হতো, এমন কথা বলা যায় না। তিনি পাশ্চাত্ত্যশিক্ষায় শিক্ষিত এক মহানগরের নাগরিক ছিলেন। তার প্রভাব মানসিকতায় থাকাই স্বাভাবিক যা থেকে অনেকেই মুক্ত নন। তিনি যে সময়ে সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সে সময়ে দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি শান্ত ছিল না। আসমুদ্র হিমাচল স্বাধীনতা-আহবে, বহির্বিশ্বে রাষ্ট্র-শক্তিগুলির জীবনপণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতার রক্তস্নানে সমাজে প্রবল কম্পন শুরু হয়েছিল। জীবন-জগত-সমাজের পূর্বকালের মূল্যবোধ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। তৎকালে এমন অবস্থা হয় যে, কবিগুরুর কথায়—

'পুরানো সঞ্চয় নিয়ে বেচাকেনা আর চলিবে না।
এসেছে আদেশ, বন্দরের বন্ধনকাল
এবারের মতো হলো শেষ—'

কিন্তু হেমেন্দ্রকুমার এদিকে ছিলেন রক্ষণশীল। তাঁর রচনায় আদর্শ বিচ্যুতির সামান্য ইঙ্গিতও প্রকাশ পায় না। সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, সংশোধনবাদ বা কোন রকমের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বাদানুবাদ তাঁর মনকে স্পর্শ করেছে, এমন কিছু তাঁর রচনায় প্রকাশ পায়নি। কারণ, মনই তো সাহিত্য-স্রষ্টা।

হেমেন্দ্রকুমারের রচনা-সম্ভার বহু, প্রকাশকমহলও বিস্তৃত এবং পাঠক-সমাজও বিশাল তবু তাঁকে বিশেষতঃ শেষ বয়সে অর্থকৃচ্ছ্র তা অপনোদনের জন্য সরকারের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। শিশুসাহিত্য রচনাকে যিনি বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেন, তাঁর অনেক গ্রন্থেরই স্বল্পমূল্যে স্বত্বাধিকারী হয় প্রকাশক মহোদয়। এইভাবে বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পরহস্তগত হয়। আইনেও এমন ব্যবস্থা নেই যদ্দ্বারা সেগুলোকে উদ্ধার করা সম্ভব। হেমেন্দ্রকুমারও এই বিচিত্র ব্যবস্থার ব্যতিক্রম নন। পরিস্থিতি ও পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে পাঠক-সমাজের রুচিও বদলায়; লেখক-সমাজেও নতুনের আবির্ভাব হয় যাঁরা পুরানো পথের পথিক হন না, হতে পারেন না। এই নতুনের পাশে পুরানো যা তা পিছনে পড়ে—সাহিত্যিক ও তাঁর সাহিত্য বিস্মৃতির তমিস্রাশ্রয়ী হন। বোধহয় এই সত্যকে উপলব্ধি করেই কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

'আসিবে ফাল্গুন পুনঃ
তখন আবার শুন
নব পথিকের গানে
নূতনের বাণী—'

সাম্প্রতিককালে যে কারণেই হোক আমাদের বাংলার প্রকাশক মহলে ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রকাশ-প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে এবং পাঠক-সমাজেও তার সাদর অভ্যর্থনা হচ্ছে। কিন্তু এ পথে দুটি অন্তরায়—দরিদ্র সাহিত্যিক কর্তৃক যেমন-তেমন মূল্যে তাঁর গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় ও গ্রন্থস্বত্ব আইনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যাঁরা অর্ধশতাব্দী পূর্বে গত হয়েছেন তাঁদের রচনা-সম্ভার প্রকাশের বাধা ঐ দুটি নয়—প্রধান বাধা কাগজের অগ্নিমূল্য ও দুষ্প্রাপ্যতা। হেমেন্দ্র-কুমারের রচনা-সম্ভার প্রকাশের বাধা প্রথম দুটি তো বটেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শেষোক্তটিও। তবে সৌভাগ্যের কথা যে, তাঁকে জীবন-রক্ষার্থে সকল গ্রন্থেরই স্বত্ব বিক্রয় করতে হয়নি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'যকের ধন' বর্তমান সম্ভার-ভুক্ত হতে পেরেছে। পূর্বেই বলেছি, তাঁর সুহৃদ্‌বর্গ ছিলেন গুণী। আমাদের বাংলার, মাত্র আমাদের বাংলার কেন, ঊনবিংশ শতকের অষ্টম দশক থেকে বিংশ শতকের পঞ্চম দশককাল অবধি ভারতীয় সংস্কৃতিতে কলকাতার জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দান অবিস্মরণীয়। হেমেন্দ্রকুমার তাঁদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হন। আচার্য যদুনাথ, কবি নজরুল প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। 'এখন যাঁদের দেখছি' নামক যে বিখ্যাত গ্রন্থে হেমেন্দ্রকুমার তাঁদের কথা সুন্দরভাবে রচনা করেছেন, সেখানিও এই সম্ভারে দেখছি। গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট ও তথ্যের দিক থেকে মূল্যবান। ঐ দুখানি ছাড়াও দেখছি, 'সন্ধ্যার পরে সাবধান' 'হিমাচলের স্বপ্ন', 'মেঘদূতের মর্তে আগমন' প্রভৃতি আরও পাঁচখানি বিখ্যাত ও বহুল প্রচারিত উপন্যাস। হেমেন্দ্রকুমার পরিণত বয়সে লোকান্তরিত হলেও তাঁর বহু কবিতা, ছড়া প্রভৃতি অ-প্রকাশিত থেকেছে। বর্তমান রচনাবলীতে সেগুলি প্রকাশ করে প্রকাশক সৎ কাজ করেছেন। আশা রাখি, তাঁর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশক মহাশয় এক সময় বাংলার আগ্রহী পাঠক-সমাজে প্রকাশে সমর্থ হবেন।

আমি এই অগ্রজ সাহিত্যিকের কথা দীর্ঘকাল পরে আর একবার লিখতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করছি।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রকাশিকার কথা

অনেক দেরিতে হলেও হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর প্রথম খণ্ড আজ পাঠক-বন্ধুদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

অনেক বাধা এসেছে আমাদের উপর স্বল্পমূল্যে সৎ সাহিত্য প্রকাশ করতে গিয়ে। স্বৈরাচারী মতবাদ আজ সর্বত্র। সাহিত্য জগতেও সে আজ মৌরুসী পাট্টা জাঁকিয়ে বসেছে। সেই স্বৈরাচারী মনোভাবের চক্রান্তজালে জড়িয়ে পড়েছিলাম আমরা। পর্বত-প্রমাণ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে আমাদের। আজকের এই শুভ মুহূর্তে সেই তিক্ত ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি করতে মন চাইছে না। কিন্তু সে কারণেই এই অহেতুক দেরি। আশা করি আমাদের সহৃদয় পাঠকবন্ধুরা এই অনিচ্ছাকৃত দেরির জন্য মার্জনা করবেন।

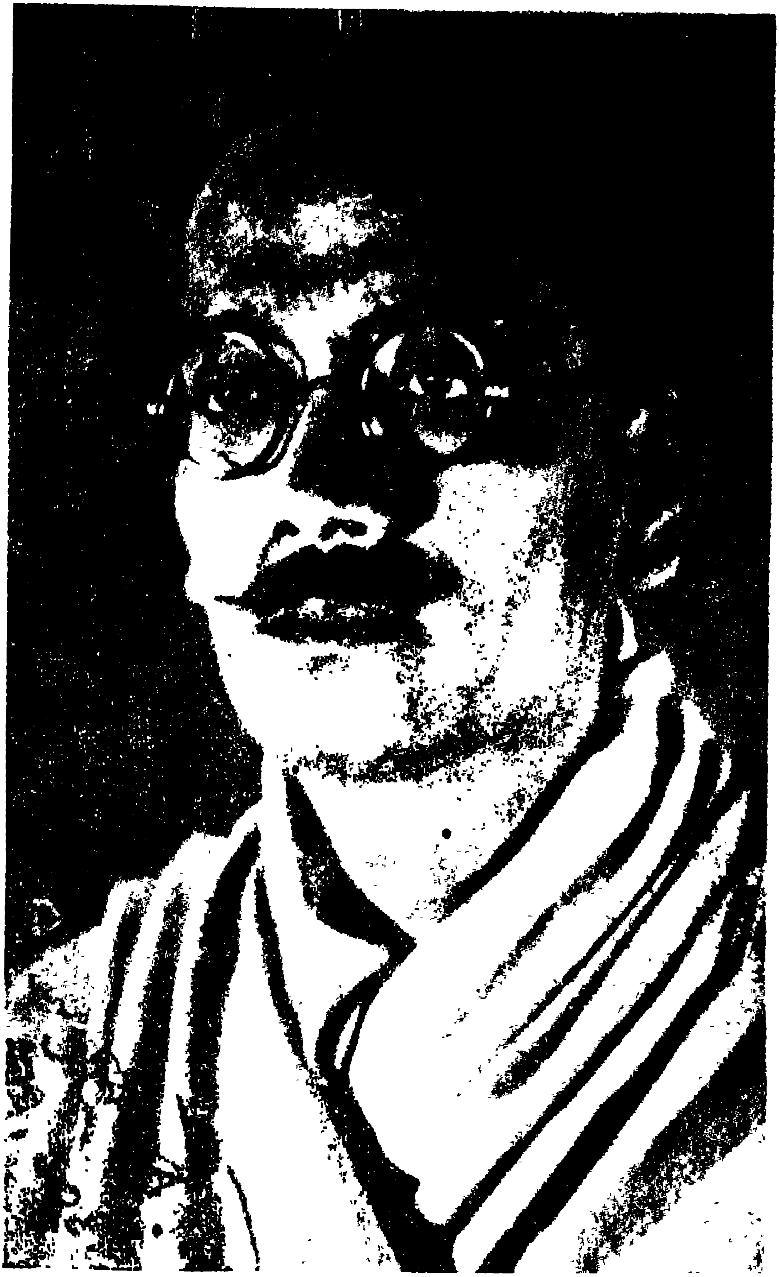
শিশু ও কিশোরদের কাছে 'যখের ধন'এর লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের পরিচয় নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন। ছোট-বড় সকলেরই ঘুম কেড়ে নেয় তাঁর প্রতিটি লেখা। আট থেকে আশি প্রত্যেকের কাছেই হেমেন্দ্রকুমার রায় একটি প্রিয় নাম। সেই হেমেন্দ্রকুমারের শিশু ও কিশোরদের জন্য লেখা রচনা আমরা কয়েকখণ্ডে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছি। সেক্ষেত্রেও এক বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদের। লেখকের এমন অনেক লেখা যার স্বত্ব তিনি বিবিধ ব্যক্তিবিশেষকে দান করে গিয়েছেন। অনুরোধ করব সেই সব সুধীজনদের কাছে—বাংলা সাহিত্য তথা আজকের পাঠকবন্ধুদের স্বার্থে 'হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী' সুষ্ঠুভাবে পূর্ণাঙ্গরূপ দিতে রচনাবলীতে সেই সব গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ দানে বাধিত করতে। এই সহযোগিতা ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে।

অনেকেই এগিয়ে এসেছেন এ-বই প্রকাশে সহযোগিতা করতে। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এই প্রসঙ্গে একটি নাম বিশেষ করে স্মরণীয়—শ্রীহৃষিকেশ বারিক মহাশয় 'মানুষ পিশাচ' গ্রন্থটি আমাদের রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। বেশকিছু পুরানো পত্রপত্রিকা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন শ্রীখগেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়। এঁদের জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

সবশেষে এ-বইএর ভালো-মন্দ বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম আমার পাঠক বন্ধুদের ওপর—তাদের ভালো লাগলেই সার্থক মনে করব আমাদের এই উদ্যোগ।

গীতা দত্ত

সূচীপত্র



জন্ম

২রা সেপ্টেম্বর ১৮৮৮

মৃত্যু

১৮ই এপ্রিল ১৯৬৩



এক ।। মড়ার মাথা

ঠাকুরদাদা মারা গেলে পর, তাঁর লোহার সিন্দুকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটি ছোট বাক্স পাওয়া গেল। সে বাক্সের ভিতরে নিশ্চয়ই কোন দামী জিনিস আছে মনে করে মা সেটি খুলে ফেললেন। কিন্তু তার মধ্যে পাওয়া গেল শুধু একখানা পুরানো পকেট-বুক, আর একখানা ময়লা-কাগজে-মোড়া কি একটা জিনিস। মা কাগজটা খুলেই জিনিসটা ফেলে দিয়ে হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'কি, কি হল মা?'

মা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'কুমার, শীগ্‌গীর ওটা ফেলে দে।'

আমি হেঁট হয়ে চেয়ে দেখলুম, একটা মড়ার মাথার খুলি মাটির উপর পড়ে রয়েছে! আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'লোহার সিন্দুকে মড়ার মাথা! ঠাকুরদা কি বুড়ো-বয়সে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন?'

মা বললেন, 'ওটা ফেলে দিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করবি চল্!'

মড়ার মাথার খুলিটা জানলা গলিয়ে আমি বাড়ীর পাশের একটা খানায় ফেলে দিলুম। পকেট-বুকখানা ঘরের একটা তাকের উপর তুলে রাখলুম। মা বাক্সটা আবার সিন্দুকে পুরে রাখলেন।···

দিন-কয়েক পরে পাড়ার করালী মুখুয্যে হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। করালী মুখুয্যেকে আমাদের বাড়ীতে দেখে আমি ভারি অবাক হয়ে গেলুম। কারণ আমি জানতুম যে ঠাকুরদাদার সঙ্গে তাঁর একটুকুও বনিবনাও ছিল না, তিনি বেঁচে থাকতে করালীকে কখনো আমাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেখিনি।

করালীবাবু বললেন, 'কুমার, তোমার মাথার ওপরে এখন আর কোন অভিভাবক নেই। তুমি নাবালক। হাজার হোক তুমি তো আমাদেরই পাড়ার ছেলে। এখন আমাদের সকলেরই উচিত, তোমাকে সাহায্য করা। তাই আমি এসেছি।'

করালীবাবুর কথা শুনে বুঝলুম তাঁকে আমি যতটা খারাপ লোক বলে ভাবতুম, আসলে তিনি ততটা খারাপ লোক নন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'যদি কখনো দরকার হয়, আমি আপনার কাছে আগে যাব।'

করালীবাবু বসে বসে এ-কথা সে-কথা কইতে লাগলেন। কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁকে বললুম, 'ঠাকুরদাদার লোহার সিন্দুকে একটা ভারি মজার জিনিস পাওয়া গেছে।'

করালীবাবু বললেন, 'কি জিনিস?'

আমি বললুম, 'একটা চন্দন-কাঠের বাক্সের ভেতরে ছিল একটা মড়ার মাথার খুলি—'

করালীবাবুর চোখ দুটো যেন দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'মড়ার মাথার খুলি ?'

—'হ্যাঁ, আর একখানা পকেট-বই।'

—'সে বাক্সটা এখন কোথায় ?'

—'লোহার সিন্দুকেই আছে।'



মড়ার মাথার খুলিটা একরাশ জঞ্জালের উপরে কাৎ হয়ে পড়ে আছে।

করালীবাবু তখনই সে কথা চাপা দিয়ে অন্য কথা কইতে লাগলেন। কিন্তু আমি বেশ বুঝলুম, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। খানিক পরে তিনি চলে গেলেন।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। শুনলাম আমার কুকুর বাঘা ভয়ানক চীৎকার করছে। বিরক্ত হয়ে দু-চারবার ধমক দিলুম, কিন্তু আমার সাড়া পেয়ে বাঘার উৎসাহ আরো বেড়ে উঠল—সে আরো জোরে চেঁচাতে লাগল।

তারপরেই, যেন কার পায়ের শব্দ পেলুম। কে যেন দুড়-দুড় করে ছাদের উপর দিয়ে চলে গেল। ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। চারিদিকে খোঁজ করলুম, কিন্তু কারুকেই দেখতে পেলুম না। ভাবলুম আমারি ভ্রম। বাঘার গলার শিকল খুলে দিয়ে, আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম।…

সকালবেলায় ঘুম ভেঙেই শুনি মা ভারি চ্যাঁচামেচি লাগিয়েছেন। বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কি মা?'

মা বললেন, 'ওরে কাল রাত্তিরে বাড়ীতে চোর এসেছিল।'

তাহলে কাল রাত্রে যা শুনেছিলুম তা ভুল নয়।

মা বললেন, 'দেখবি আয়, বড় ঘরে লোহার সিন্দুক খুলে রেখে গেছে।'

ঘরে গিয়ে দেখি সত্যিই তাই। কিন্তু চোর বিশেষ কিছু নিয়ে যেতে পারেনি—কেবল সেই চন্দন-কাঠের বাক্সটা ছাড়া।

কিন্তু মনে কেমন একটা ধোঁকা লেগে গেল! সিন্দুকে এত জিনিস থাকতে চোর খালি সেই বাক্সটা নিয়ে গেল কেন? আরো মনে পড়ল, কাল সকালে এই বাক্সের কথা শুনেই করালীবাবু কি-রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তবে কি এই বাক্সের মধ্যে কোন রহস্য আছে? সম্ভব। নইলে, একটা মড়ার মাথার খুলি কে আর এত যত্ন করে লোহার সিন্দুকের ভিতরে রেখে দেয়?

মাকে কিছু না বলেই তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটলুম। বাড়ীর পাশের খানাটার মুখে গিয়ে দেখলুম, মড়ার মাথার খুলিটা একরাশ

জঞ্জালের উপরে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। সেটাকে আর একবার পরখ করবার জন্যে তুলে নিলুম। খুলির একপিঠে গাঢ় কালো রং মাখানো ছিল—কিন্তু খানার জল লেগে মাঝে মাঝে রং উঠে গেছে! আর যেখানেই রং নেই, সেইখানেই আঁকের মতন কি কতকগুলো খোদা রয়েছে। অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে খুলিটাকে লুকিয়ে আবার বাড়ীতে আনলুম। সাবান-জলে সেটাকে বেশ করে ধুয়ে ফেলতেই কালো রং উঠে গেল। তখন আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, খুলির একপিঠের সবটায় কে অনেকগুলো অঙ্ক খুদে রেখেছে। অঙ্কগুলো এই রকম:

৩৬ (২)	৯	১৯	৫২
১৭ (২)	(৩) ১৫	৪৮	︸
(৯) ৩০	(৯) ৪৮	১৫	১৪
৫	২৯ (২)	২০	︷
(৯) ৪০	৩৭	৯	৫
৩৯	(৯) ৩৫	(৩) ১৫	৪৬
(৩) ৩৩	২৫ (২)	(৯) ৪৮	(৯) ৪০
৭	৩	(৩) ২৮	৩৩
(৯) ৩২	(৯) ৩২	৩২	২৯
৪৪	২	১৪ (২)	৩৩ (২)
৩৯	২৩	৩২ (২)	(৯) ৩৫
৪০	১৫	৩৩ (২)	
১৫ (২)	২০	২৯	
১৯	৯	৩৯	
৩৭	(৩) ১৫	২৮ (২)	
︷	(৯) ৪৮	৩৯	
৫	৩৫	২৮	
৪০	︷	৪০ (২)	
(৯) ৩০	৫	৪৮	
৪২	৩০	৪৪ (২)	
(৯) ২৯	৩১	২৮	
(৯) ১৩	(৯) ৩০	৪৫ (২)	
৩৩	৩৫	২৮	
︷	৩৫ (২)	২০	
৫	(৯) ৩৭	(৩) ৩৭	
৩৫			
(৩) ৩০			
(৯) ১৩			
৩০			
৪২			
১৫			
২০			

দুই ॥ যকের ধন

এই অদ্ভুত অঙ্কগুলোর মানে কি? অনেক ভাবলুম, কিন্তু মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না।

হঠাৎ মনে পড়ল ঠাকুরদাদার পকেট-বইয়ের কথা। সেখানাও তো এই খুলির সঙ্গে ছিল, তার মধ্যে এই রহস্যের কোন সদুত্তর নেই কি?

তখনি উপরে গিয়ে তাক থেকে পকেট-বইখানা পাড়লুম। খুলে দেখি, তার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লেখায় ভরতি। গোড়ার দিকের প্রায় ষোল-সতেরো পাতা পড়লুম, কিন্তু সেসব বাজে কথা। তারপর হঠাৎ এক জায়গায় দেখলুম:

"১৯২০ সাল, আশ্বিন মাস।—আসাম থেকে ফেরবার মুখে এক-দিন আমরা এক বনের ভিতর দিয়ে আসছি। সন্ধ্যা হয়-হয়—আমরা এক উঁচু পাহাড়ে-জমি থেকে নামছি। হঠাৎ দেখি খানিক তফাতে একটা মস্ত-বড় বাঘ। সে সামনের দিকে হুম্‌ড়ি খেয়ে যেন কার উপরে লাফিয়ে পড়বার জন্যে তাক করছে!—আরো একটু তফাতে দেখলুম, একজন সন্ন্যাসী পথের পাশে, গাছের তলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। বাঘটার লক্ষ্য তাঁর দিকেই!

আমি তখনি চীৎকার করে উঠলুম। আমার সঙ্গের কুলিরাও সে চীৎকারে যোগ দিল। সন্ন্যাসীর ঘুম ভেঙে গেল, বাঘটাও চম্‌কে ফিরে আমাদের দেখে একলাফে অদৃশ্য হল।

সন্ন্যাসী জেগে উঠেই ব্যাপারটা সব বুঝে নিলেন। আমার কাছে এসে কৃতজ্ঞ স্বরে বললেন, 'বাবা, তোমার জন্যে আজ আমি বাঘের মুখ থেকে বেঁচে গেলুম!'

আমি বললুম, 'ঠাকুর, বনের ভেতরে এমনি করে কি ঘুমোতে আছে?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'বনই যে আমাদের ঘর-বাড়ী বাবা!'

আমি বললুম, 'কিন্তু এখনি আপনার প্রাণ যেত!'

সন্ন্যাসী বললেন, 'কৈ বাবা, গেল না তো। ভগবান ঠিক সময়েই তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন।'

শুনলুম, আমরা যেদিকে যাচ্ছি, সন্ন্যাসীও সেই দিকে যাবেন। তাই সন্ন্যাসীকেও আমরা সঙ্গে নিয়ে চললুম।

সন্ন্যাসী দুদিন আমাদের সঙ্গে রইলেন। আমি যথাসাধ্য তাঁর সেবা করতে ত্রুটি করলুম না। তিন দিনের দিন বিদায় নেবার আগে তিনি আমাকে বললেন, 'দেখ বাবা, তোমার সেবায় আমি বড় তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার প্রাণরক্ষাও করেছ। যাবার আগে আমি তোমাকে একটি সন্ধান দিয়ে যেতে চাই।'

আমি বললুম, 'কিসের সন্ধান?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'যকের ধনের।'

আমি আগ্রহের সঙ্গে বললুম, 'যকের ধন! সে কোথায় আছে ঠাকুর?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'খাসিয়া পাহাড়ে।'

আমি হতাশভাবে বললুম, 'কোন্‌খানে আছে আমি তা জানব কেমন করে?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি ঠিকানা বলে দিচ্ছি। খাসিয়া পাহাড়ের রূপনাথের গুহার নাম শুনেছ?'

আমি বললুম, 'শুনেছি। প্রবাদ আছে যে, এই গুহার ভেতর দিয়ে চীনদেশে যাওয়া যায়, আর অনেককাল আগে এক চীন-সম্রাট এই গুহাপথে নাকি সসৈন্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে এসেছিলেন।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'হ্যাঁ। এই রূপনাথের গুহা থেকে পঁচিশ ক্রোশ পশ্চিমে গেলে, উপত্যকার মাঝখানে একটি সেকেলে মন্দির দেখতে পাবে। সে মন্দির এখন ভেঙে পড়েছে, কিছুদিন পরে তার কোন চিহ্নও হয়তো আর পাওয়া যাবে না। একসময়ে এখানে মস্ত এক মঠ ছিল, তাতে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরা থাকতেন। সেকালের এক

রাজা বিদেশী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করার আগে এই মঠে নিজের সমস্ত ধন-রত্ন গচ্ছিত রেখে যান। কিন্তু যুদ্ধে তাঁর হার হয়। পাছে নিজের ধন-রত্ন শত্রুর হাতে পড়ে, এই ভয়ে রাজা সে সমস্ত এক জায়গায় লুকিয়ে এক যককে পাহারায় রেখে পালিয়ে যান। তারপর তিনি আর ফিরে আসেননি। সেই ধন-রত্ন এখনো সেইখানেই আছে'—তারপর সন্ন্যাসী আমাকে বৌদ্ধমঠে যাবার পথের কথা ভালো করে বলে দিলেন।

আমি বললুম, 'কিন্তু এতদিন আর কেউ যদি সেই ধন-রত্নের সন্ধান পেয়ে থাকে?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'কেউ পায়নি। সে বড় দুর্গম দেশ, সেখানে যে বৌদ্ধমঠ আছে, তা কেউ জানে না, আর কোন মানুষও সেখানে যায় না। মঠে গেলেও, সারা জীবন ধরে ধন-রত্ন খুঁজলেও কেউ পাবে না। কিন্তু তোমাকে সেখানে গিয়ে খুঁজতে হবে না; ধন-রত্ন ঠিক কোন্‌খানে পাওয়া যাবে, তা জানবার উপায় কেবল আমার কাছে আছে।' এই বলে সন্ন্যাসী তাঁর ঝোলা থেকে একটি মড়ার মাথার খুলি বার করলেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'ওতে কি হবে ঠাকুর?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'যে যক ধন-রত্নের পাহারায় আছে, এ তারই খুলি। এই খুলিতে আমি মন্ত্র পড়ে দিয়েছি, এ খুলি যার কাছে থাকবে যক তাকে আর কিছুই বলবে না। খুলিতে এই যে অঙ্কের মত রেখা রয়েছে, এ হচ্ছে সাঙ্কেতিক ভাষা। এই সঙ্কেত বুঝবার উপায়ও আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, তাহলেই তুমি জানতে পারবে কোন্‌খানে ধন-রত্ন আছে'—এই বলে সন্ন্যাসী আমাকে সঙ্কেত বুঝবার গুপ্ত উপায় বলে দিলেন।

তারপর এক বৎসর ধরে অনেক ভাবলুম। কিন্তু একলাটি সেই দুর্গম দেশে যেতে ভরসা হল না। শেষটা আমার প্রতিবেশী করালীকে বিশ্বাস করে সব কথা জানিয়ে বললুম, 'করালী, তোমার জোয়ান বয়স, তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে তোমাকেও ধন-রত্নের অংশ দেব।'

কিন্তু করালী যে বেইমান, আমি তা জানতুম না। সে ফাঁকি দিয়ে মড়ার মাথার খুলিটা আমার কাছ থেকে আদায় করবার চেষ্টায় রইল। দু-একবার লোক লাগিয়ে চুরি করবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু পারেনি। ভাগ্যে আমি তাকে যকের ধনের ঠিকানাটা বলে দিইনি!

কিন্তু খাসিয়া-পাহাড়ে যাবার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। এই বুড়োবয়সে টাকার লোভে একলা সেই অজানা দেশে গিয়ে শেষটা কি বাঘ-ভাল্লুক-ডাকাতের পাল্লায় প্রাণ খোয়াব? অন্য কারুকেও সঙ্গে নিতে ভরসা হয় না,—কে জানে, টাকার লোভে বন্ধুই আমাকে খুন করবে কি না।

তবে, এই পকেট-বইয়ে আমি সব কথা লিখে রাখলুম। ভবিষ্যতে এই লেখা হয়তো আমার বংশের কারুর উপকারে আসতে পারে। কিন্তু আমার বংশের কেউ যদি সত্যিই সে বৌদ্ধমঠে যাত্রা করে, তবে যাবার আগে যেন বিপদের কথাটাও ভালো করে ভেবে দেখে। এ কাজে পদে পদে প্রাণের ভয়।”

পকেট-বইখানা হাতে করে আমি অবাক্ হয়ে বসে রইলুম।

তিন ॥ সঙ্কেতের অর্থ

উঃ! করালীবাবু কি ভয়ানক লোক! ঠাকুরদাদার সঙ্গে সে চালাকি করতে গিয়েছিল, কিন্তু পেরে ওঠেনি। তারপর এতদিনেও আশা ছাড়েনি। আমি বেশ বুঝলুম, এই মড়ার মাথাটা কোথায় আছে তা জানবার জন্যেই করালী কাল আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছিল। রাত্রে এইটে চুরি করবার ফিকিরেই যে আমাদের বাড়ীতে চোর এসেছিল, তাতেও আর কোন সন্দেহ নেই। ভাগ্যে মড়ার মাথাটা আমি বাড়ীর পাশের খানায় ফেলে দিয়েছিলুম!

এখন কি করা উচিত? গুপ্তধনের চাবি তো এই খুলির মধ্যেই

আছে, কিন্তু অনেকবার উল্টেপাল্টে দেখেও আমি সেই অঙ্কগুলোর ল্যাজা-মুড়ো কিছুই বুঝতে পারলুম না। পকেট-বইখানার প্রত্যেক পাতা উল্টে দেখলুম, তাতেও ঠাকুরদাদা এই সঙ্কেত্ বুঝবার কোন উপায় লিখে রাখেননি। ঠাকুরদাদার উপরে ভারি রাগ হল। আসল ব্যাপারটিই জানবার উপায় নেই!

তারপর ভেবে দেখলুম, জেনেই বা কি আর এমন হাতী-ঘোড়া লাভ হত! আমার বয়স সতেরো বৎসর। সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছি। জীবনে কখনো কলকাতার বাইরে যাইনি। কোথায় কোন্ কোণে আসাম আর খাসিয়া পাহাড়, আবার তার ভিতরে কোথায় আছে 'রূপনাথের গুহা'—এসব খুঁজে বার করাই তো আমার পক্ষে অসম্ভব! তার উপরে সেই গভীর জঙ্গল, যেখানে দিনরাত বাঘ-ভাল্লুক-হাতীরা হানা দিচ্ছে! সেকেলে এক বৌদ্ধমঠ, তার ভিতরে যকের ধন—সেও এক ভুতুড়ে কাণ্ড! শেষটা কি একলা সেখানে গিয়ে আলিবাবার ভাই কাসিমের মতন টাকার লোভে প্রাণটা খোয়াব? এসব ভেবেও বুকটা ধুকপুক করে উঠল!

হঠাৎ মনে হল বিমলের কথা। বিমল আমার প্রাণের বন্ধু, আমাদের পাড়ার ছেলে। আমার চেয়ে সে বয়সে বছর তিনেকের বড়, এ বৎসর বি-এ দেবে। বিমলের মত চালাক ছেলে আমি আর দুটি দেখিনি। তার গায়েও অসুরের মতন জোর, রোজ সে কুস্তি লড়ে—দুশো ডন, তিনশো বৈঠক দেয়। তার উপরে এই বয়সেই সে অনেক দেশ বেড়িয়ে এসেছে—এই গেল বছরেই তো আসামে বেড়াতে গিয়েছিল। তার কাছে আমি কোন কথা লুকোতুম না। ঠিক করলুম, যাওয়া হোক আর নাই হোক একবার বিমলকে এই মড়ার মাথাটা দেখিয়ে আসা যাক।

বৈকালে বিমলের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম—তখন সে বসে বসে বন্দুকের নল সাফ করছিল! আমাকে দেখে বললে, 'কিহে, কুমার যে! কি মনে করে?'

আমি বললুম, 'একটা ধাঁধা নিয়ে ভারি গোলমালে পড়েছি ভাই!'

বিমল বললে, 'কি ধাঁধা ?'

আমি মড়ার মাথার খুলিটা বার করে বললুম, 'এই দেখ !'

বিমল অবাক হয়ে খুলিটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, 'এ আবার কি ?'

আমি পকেট-বইখানা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, 'আমার ঠাকুরদার পকেট-বই। পড়লেই সব বুঝতে পারবে।'

বিমল বললে, 'আচ্ছা রোসো, আগে তাড়াতাড়ি বন্দুকটা সাফ করে নি। কাল পাখি-শিকারে গিয়েছিলুম। বন্দুকে ভারি ময়লা জমেছে।'

বন্দুক সাফ করে, হাত ধুয়ে বিমল বললে, 'ব্যাপার কি বল দেখি কুমার ? তুমি কি কোন তান্ত্রিক গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছ ? তোমার হাতে মড়ার মাথা কেন ?'

আমি বললুম, 'আগে পকেট-বইখানা পড়েই দেখ না !'—

'বেশ' বলে বিমল পকেট-বইখানা নিয়ে পড়তে লাগল। খানিক পরেই দেখলুম, বিমলের মুখ বিস্ময়ে আর কৌতূহলে ভরে উঠছে !

পড়া শেষ করেই বিমল তাড়াতাড়ি মড়ার মাথাটা তুলে নিয়ে সেটাকে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'ভারি আশ্চর্য তো !'

আমি বললুম, 'অঙ্কগুলো কিছু বুঝতে পারলে ?'

বিমল বললে, 'উঁহু !'

—'আমিও পারিনি।'

—'কিন্তু আমি এত সহজে ছাড়ব না। তুমি এখন বাড়ী যাও, কুমার ! খুলিটা আমার কাছেই থাক। আমি এটার রহস্য জানবই জানব। তুমি কাল সকালে এস।'

আমি বললুম, 'কিন্তু সাবধান !'

বিমল বললে, 'কেন ?'

আমি বললুম, 'করালী মুখুয্যে এই খুলিটা চুরি করবার জন্যে কাল আবার হয়তো তোমাদের বাড়ীতে মাথা গলাবে।'

—'আমি এত সহজে ঠকবার ছেলে নই হে !'

—'তা আমি জানি। তবু সাবধানের মার নেই।' এই বলে আমি চলে এলুম।

পরের দিন ভোর না-হতেই বিমলের কাছে ছুটলুম। তার বাড়ীতে আমার অবারিত দ্বার। একেবারে তার পড়বার ঘরে গিয়ে দেখি, বিমল টেবিলের উপরে হেঁট হয়ে একমনে কি লিখছে, আর সামনেই মড়ার মাথাটা পড়ে রয়েছে। আমার পায়ের শব্দে চম্‌কে তাড়াতাড়ি সে খুলিটাকে তুলে নিয়ে লুকিয়ে ফেলতে গেল—তারপর আমাকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে হেসে বললে, 'ওঃ, তুমি ! আমি ভেবেছিলুম অন্য কেউ !'

—'কাল তো অত সাহস দেখালে, আজ এত ভয় পাচ্ছ কেন ?'

—'কাল ? কাল সবটা ভালো করে তলিয়ে বুঝিনি। আজ বুঝছি, আমাদের এখন সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে—কাক-পক্ষী যেন টের না পায় !'

—'অঙ্কগুলো দেখে কি বুঝলে ?'

—'যা বোঝা উচিত, সব বুঝেছি।'

আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠলুম। চেঁচিয়ে বললুম, 'সব বুঝতে পেরেছ ! সত্যি ?'

বিমল বললে, 'চুপ ! চেঁচিয়ো না ! কে কোথায় শুনতে পাবে বলা যায় না। ঠাণ্ডা হয়ে ঐখানে বোসো।'

আমি একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললুম, 'খুলিতে কি লেখা আছে, আমাকে বল।'

বিমল আস্তে আস্তে বললে, 'প্রথমটা আমিও কিছু বুঝতে পারিনি। প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টা করে যখন একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছি, তখন হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন আগে একখানা ইংরিজী বই পড়েছিলুম। তাতে নানারকম সাঙ্কেতিক লিপির গুপ্তরহস্য বোঝানো ছিল। তাতেই পড়েছিলুম যে ইউরোপের চোর-ডাকাতরা প্রায়ই একরকম সঙ্কেত ব্যবহার করে। তারা

Alphabet অর্থাৎ বর্ণমালাকে যথাক্রমে সংখ্যা অর্থাৎ ১, ২, ৩ হিসাবে ধরে। অর্থাৎ one হবে A, two হবে B, three হবে C ইত্যাদি। আমি ভাবলুম হয়তো এই খুলিটাতেও সেই নিয়মে সংকেত সাজানো হয়েছে। তারপর দেখলুম, আমার অনুমান মিথ্যা নয়। তখন এই সঙ্কেতগুলো খুব সহজেই পড়ে ফেললুম।'

আমি আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলুম, 'পড়ে কি বুঝলে বল ?'

বিমল আমার হাতে একখানা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললে, 'খুলির সঙ্কেতগুলো ছাব্বিশটা ঘরে ভাগ করা। আমিও লেখাগুলো সেই ভাবেই সাজিয়েচি।'

কাগজের উপরে এই কথাগুলো লেখা ছিল :

'ভাঙা	দেউলের	পিছনে	সরলগাছ	মূলদেশ	থেকে
পূবদিকে	দশগজ	এগিয়ে	থামবে	ডাইনে	আটগজ
এগিয়ে	বুদ্ধদেব	বামে	ছয়গজ	এগিয়ে	তিনখানা
পাথর	তার	তলায়	সাতহাত	জমি	খুঁড়লে
পথ	পাবে'				

আমি চিঠিখানা পড়ে মনে মনে বিমলের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলুম।

বিমল বললে, 'সাঙ্কেতিক লিপিটা তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দি, শোনো। আমাদের বাংলা ভাষায় 'অ' থেকে শুরু করে 'ঁ' পর্যন্ত বাহান্নটি বর্ণ। সেই বর্ণগুলিকে ১, ২, ৩ হিসাবে যথাক্রমে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ১ হচ্ছে অ, ২ হচ্ছে আ, ১৩ হচ্ছে ক, ৫২ হচ্ছে ঁ প্রভৃতি।

যেখানে 'অ'-কার বা 'এ'-কার প্রভৃতি আছে, সেখানে বর্ণের যে-পাশে দরকার, সেই পাশে ব্রাকেটের ভেতর সংখ্যা লেখা হয়েছে। উদাহরণ দেখ :—'ভ' বর্ণের সংখ্যা ৩৬, আর 'আ'-কারের সংখ্যা হচ্ছে ২। অতএব, ৩৬ (২) সঙ্কেতে বুঝতে হবে 'ভা'। 'দ' বর্ণের সংখ্যা ৩০, 'এ'-কারের সংখ্যা হচ্ছে '৯'। অতএব 'দে' বোঝাতে লিখতে হবে (৯) ৩০। 'উ'-কার বর্ণের তলায় বসে। সুতরাং ৩৫

থাকলে বুঝতে হবে 'বু'। 'উ'র মত 'উ'-কারের সংখ্যাও হচ্ছে ৫। চন্দ্রবিন্দুর সংখ্যা বাহান্ন, চন্দ্রবিন্দু উপরে বসে, কাজেই 'খুঁ'র সঙ্কেত ৫২/১৪/৫৯। যুক্ত-অক্ষরকে আলাদা করে ধরা হয়েছে, যেমন—'বুদ্‌ধদেব'। যিনি এই সংখ্যাগুলি লিখেছেন, তাঁর বানান-জ্ঞান ততটা টন্‌টনে নয়। কেননা 'মূল' ও 'পূব' তাঁর হাতে পড়ে হয়েছে—'মুল' ও 'পুব'। উ-র মত উ-কারের সংখ্যা হচ্ছে ৬। কিন্তু তিনি উ-কারের সংখ্যা উ-কারের ৬-এর স্থানে বসিয়েছেন—বর্ণের তলাকার ব্রাকেটে।'

আমি মড়ার মাথার খুলিটা আর একবার পরখ করবার জন্যে তুলে নিলুম—কিন্তু দৈবগতিকে হঠাৎ সেখানা ফসকে মার্বেল বাঁধানো মেঝের উপরে সশব্দে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেটা উঠিয়ে নিয়ে, তার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে আমি বলে উঠলুম, 'ঐঃ যাঃ! খুলিটার খানিকটা চটে গিয়েছে!'

বিমল বললে, 'কোন্‌খানটা?'

আমি বললুম, 'গোড়ার চারটে ঘর—ভাঙা দেউলের পিছনে সরলগাছ—পর্যন্ত!'

বিমল বললে, 'এই কাণ্ডটি যদি আগে ঘটত, তাহলে সমস্তই মাটি হয়ে যেত। যাক্, তোমার কোন ভয় নেই,—সঙ্কেতগুলো আমি কাগজে টুকে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের সাবধান হতে হবে, অঙ্কগুলো রেখে কথাগুলো এখনি নষ্ট করে ফেলাই উচিত,'—এই বলে সে সঙ্কেতের অর্থ-লেখা কাগজখানা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেললে।

যখন দরকার হবে, পাঁচ মিনিটের চেষ্টাতেই সঙ্কেতের অর্থ আমরা ঠিক বুঝতে পারব,—কিন্তু বাইরের কোন লোক খুলির সঙ্কেত দেখে কিছুই ধরতে পারবে না!

চার ॥ সর্বনাশ

আমি বললুম, 'বিমল, সঙ্কেতের মানে তো বোঝা গেল, এখন আমরা কি করব ?'

বিমল বাধা দিয়ে বললে, 'এতে আর কিন্তু-টিন্তু কিছু নেই কুমার,—আমাদের যেতেই হবে ! এতবড় একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এর শেষ পর্যন্ত না দেখলে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না ।'

আমি বললুম, 'আমাদের সঙ্গে কে কে যাবে ?'

—'কেউ না। খালি তুমি আর আমি ।'

—'কিন্তু সে বড় দুর্গম জায়গা। লোকজন না নিয়ে কি যাওয়া উচিত ?'

বিমল বললে, 'কিছুই দুর্গম নয়, পথঘাট আমি সব চিনি, "রূপনাথের গুহা" পর্যন্ত ঠিক যাব। তারপরের পথ কিরকম জানি না বটে, কিন্তু চিনে নিতে বেশী দেরি লাগবে না। তুমি বুঝি বিপদের ভয় করছ ? ও-ভয় কোরো না। বিপদকে ভয় করলে মানুষ আজ এত বড় হতে পারত না। সোজা পথ দিয়ে তো শিশুও যেতে পারে, তাতে আর বাহাদুরি কি ? বিপদের অগ্নিপরীক্ষায় হাসিমুখে যে সফল হয়, পৃথিবীতে তাকেই বলি মানুষের মত মানুষ !'

আমি বললুম, 'কিন্তু গোঁয়ার্তুমি করে প্রাণ দিলে মানুষের মর্যাদা কি বাড়বে ? আমি অবশ্য কাপুরুষ নই—তুমি যেখানে বল যেতে রাজি আছি ! তবে অন্ধের মত কিছু করা ঠিক নয়—জানো তো, প্রবাদেই আছে—"লাফ মারবার আগে চেয়ে দেখ" ।'

বিমল বললে, 'যা ভাববার আমি সব ভেবে দেখেছি, এখন আর ভাবনা নয় !'

—'কবে যাবে ?'

—'আমি তো প্রস্তুত ! কাল বল কাল, পশু বল পশু !'

—'এত তাড়াতাড়ি! যাবার আগে বন্দোবস্ত করতে হবে তো!'

—'বন্দোবস্ত করব আর ছাই! আমরা তো সেখানে ঘর-সংসার পাততে যাচ্ছি না—এসব কাজে যতটা ঝাড়া-হাত-পায়ে যাওয়া যায়, ততই ভালো। গোটা-দুই ব্যাগ, আর আমরা দুটি প্রাণী—ব্যস!'

—'কোন্ পথে যাবে?'

বিমল বললে, 'আমাদের কামরূপ পার হয়ে এই খাসিয়া-পাহাড়ে উঠতে হবে। খাসিয়া-পাহাড়ের ঠিক পাশেই যমজ ভাইয়ের মত আর একটি পাহাড় আছে—তার নাম জয়ন্তী। এদের উপরে আছে—কামরূপ আর নবগ্রাম। পূর্বে আছে উত্তর-কাছাড়, নাগা-পর্বত আর কপিলী নদী। দক্ষিণে আছে শ্রীহট্ট, আর পশ্চিমে গারো-পাহাড়।'

—'খাসিয়া-পাহাড় কি খুব উঁচু?'

—'হুঁ, উঁচু বৈকি! কোথাও চার হাজার, কোথাও পাঁচ হাজার, আবার কোথাও বা সাড়ে ছয় হাজার ফুট উঁচু। পাহাড়ের ভেতর অনেক জলপ্রপাত আছে—তাদের মধ্যে চেরাপুঞ্জি নামে জায়গার কাছে 'মুসমাই' আর শিলং শহরের কাছে 'বীডন্স' প্রপাত দুটিই বড়। প্রথমটির উচ্চতা এক হাজার আটশো ফুট, দ্বিতীয়টি ছয়শো ফুট। উচ্চতায় প্রথম প্রপাতটি পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। পাহাড়ের মধ্যে উষ্ণ প্রস্রবণও আছে—তার জল গরম। খাসিয়া-পাহাড়ে শীত আর বর্ষা ছাড়া আর কোন ঋতুর প্রভাব বোঝা যায় না—বৃষ্টি আর ঝড় তো লেগেই আছে। বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত একটু বসন্তের আমেজ পাওয়া যায়। খাসিয়া-পাহাড়ের চেরাপুঞ্জি তো বৃষ্টির জন্যে বিখ্যাত।'

বিমল হেসে বললে, 'খালি বাঘ-ভালুক কেন, সেখানকার জঙ্গলে হাতী, গণ্ডার, বুনো মোষ আর বরাহ সবই পাওয়া যায়, কিন্তু সাপ খুব কম।'

আমি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললুম, 'তবেই তো।'

বিমল আমার পিঠ চাপড়ে বললে, 'কুমার, তুমি কলকাতার বাইরে কখনো যাওনি বলে বন-জঙ্গলকে যতটা ভয়ানক মনে করছ, আসলে তা তত ভয়ানক নয়। আর আমি সঙ্গে থাকব—তোমার ভয় কি? জানো তো, আমি এই বয়সেই ঢের বড় জন্তু শিকার করেছি। আমার ছুটো বন্দুকের পাশ আছে—একটা তোমাকে দেব। তুমি আজও কিছু শিকার করনি বটে, কিন্তু আমি তো তোমাকে অনেকদিন আগেই বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়ে দিয়েছি—এইবার শিক্ষার পরীক্ষা হবে।'

সেদিন আর কিছু না বলে বাড়ীমুখো হলুম। মনে ভয় হচ্ছিল বটে, আনন্দও হচ্ছিল খুব। নতুন নতুন দেশ দেখবার সাধ আমার চিরকাল। কেতাবে নানা দেশের ছবি দেখে আর গল্প পড়ে সেসব দেশে যাবার জন্যে আমার মন যেন উড়ু উড়ু করত। কখনো ইচ্ছে হতো রবিনসন ক্রুশোর মতন এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে, নিজের হাতে কুঁড়েঘর বেঁধে মনের সুখে দিনের পর দিন কাটাই, কখনো ইচ্ছে হতো সিন্দবাদ নাবিকের মত 'রক্' পাখির সঙ্গে আকাশে উঠি, তিমি মাছের পিঠে রান্না চড়াই, আর দ্বীপবাসী বৃদ্ধকে আছাড় মেরে জব্দ করে দিই। কখনো ইচ্ছে হতো ডুবো জাহাজে সমুদ্রের ভেতরে যাই আর পাতালরাজের ধন-ভাণ্ডার লুঠ করে নিয়ে আসি। এমনি কত ইচ্ছাই যে আমার হতো তা আর বলা যায় না,—বললে তোমরা সবাই শুনে নিশ্চয়ই খুব ঠাট্টার হাসি হাসবে

আসল কথা কি, যকের ধন পাওয়ার সঙ্গে নতুন দেশ দেখবার আনন্দ ক্রমেই আমাকে চাঙ্গা করে তুললে। মনে যা কিছু ভয়-ভাবনা ছিল, সেই আনন্দের ঢেউ লেগে সমস্তই যেন কোথায় ভেসে গেল।

বাড়ীর কাছে আসতেই আমার আদরের কুকুর বাঘা আধহাত জিভ বার করে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আমাকে আগ-বাড়িয়ে নিতে এল।

আমি বললুম, 'কি রে বাঘা, আমার সঙ্গে খাসিয়া পাহাড়ে বেড়াতে যাবি?'

বাঘা যেন আমার কথা বুঝতে পারলে। পিছনের ছু' পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, সামনের ছু' পায়ে সে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলে, তারপর আদর করে আমার মুখ চেটে দিতে এল। আমি তাড়াতাড়ি মুখ সরিয়ে নিয়ে তাকে নামিয়ে দিলুম।



কিরে বাঘা, আমার সঙ্গে খাসিয়া পাহাড়ে বেড়াতে যাবি ?"

আমার এই বাঘা বিলাতী নয়, দেশী কুকুর। কিন্তু তাকে দেখলে সে-কথা বোঝবার যো নেই। ভালোরকম যত্ন করলে দেশী কুকুরও যে কেমন চমৎকার দেখতে হয়, বাঘাই তার প্রমাণ। তার আকার মস্ত বড়, গায়ের রং হলদে, তার উপর কালো কালো ছিট, অনেকটা চিতা-বাঘের মত, তাই তার নাম রেখেছি বাঘা। ভয় কাকে বলে বাঘা তা জানে না, আর তার গায়েও বিষম জোর। একবার হাউণ্ড জাতের প্রকাণ্ড একটা বিলাতী কুকুর তাকে তেড়ে এসেছিল, কিন্তু বাঘার এক কামড় খেয়েই সে একেবারে মরোমরো হয়ে পড়েছিল। আমি ঠিক করলুম, বাঘাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।

পরের দিন সকালে তখনো আমার ঘুম ভাঙেনি, হঠাৎ কে এসে

ডাকাডাকি করে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। চেয়ে দেখি বিমল আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আশ্চর্য হয়ে উঠে বসে বললুম, 'কিহে, সকালবেলায় হঠাৎ তুমি যে?'

বিমল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'সর্বনাশ হয়েছে!'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'সর্বনাশ হয়েছে! সে আবার কি?'

বিমল বললে, 'কাল রাত্রে মড়ার মাথাটা আমার বাড়ী থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে!'

—'অ্যাঁঃ, বল কি?'—আমি একেবারে হতভম্বের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম।

পাঁচ ॥ পরামর্শ

আমি বললুম, 'মড়ার মাথা কি করে চুরি গেল, বিমল!'

বিমল বললে, 'জানি না। সকালে উঠে দেখলুম, আমার পড়বার ঘরের দরজাটা খোলা, রাত্রে তালা-চাবি ভেঙে কেউ ঘরের ভিতর ঢুকেছে। বুকটা অমনি ধড়াস করে উঠল। মড়ার মাথাটা আমি টেবিলের টানার ভেতরে চাবি বন্ধ করে রেখেছিলুম। ছুটে গিয়ে দেখি, টানাটাও খোলা রয়েছে, আর তার ভেতরে মড়ার মাথা নেই।'

আমি বলে উঠলুম, 'এ নিশ্চয়ই করালী মুখুয্যের কীর্তি। সেই-ই লোক পাঠিয়ে মড়ার মাথা চুরি করেছে। কিন্তু এই ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি, করালী কি করে জানলে যে মড়ার মাথাটা তোমার বাড়ীতে আছে?'

বিমল বললে, 'করালী নিশ্চয়ই চারিদিকে চর রেখেছে। আমরা কি করছি, না করছি, সব সে জানে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু খালি মড়ার মাথাটা নিয়ে সে কি করবে? সঙ্কেতের মানে তো সে জানে না!'

বিমল বললে, 'কুমার, শত্রুকে কখনো বোকা মনে কোরো না! আমরা যখন সঙ্কেত বুঝতে পেরেছি, তখন চেষ্টা করলে করালীই বা তা বুঝতে পারবে না কেন?'

আমি বললুম, 'কিন্তু সঙ্কেতের সবটাও যে আর মড়ার মাথার ওপরে নেই! মনে নেই, আমার হাত থেকে পড়ে কাল মড়ার মাথাটা চটে গিয়েছে!'

বিমল কি যেন ভাবতে ভাবতে বললে, 'তবু বিশ্বাস নেই!'

হঠাৎ আমার আর একটা কথা মনে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা, ঠাকুরদার পকেট-বইখানাও কি চুরি গেছে?'

বিমল বললে, 'না, এইটুকুই যা আশার কথা। পকেট-বইখানা কাল রাত্রে আমি আর একবার ভালো করে পড়বার জন্যে উপরে নিয়ে গিয়েছিলুম। ঘুমোবার আগে সেখানা আমার মাথার তলায় বালিশের নীচে রেখে শুয়েছিলুম—চোর তা নিয়ে যেতে পারেনি।'

আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম, 'যাক্, তবু রক্ষে ভাই! যকের ধনের ঠিকানা আছে সেই পকেট-বইয়ের মধ্যে। ঠিকানাটা না জানলে করালী সঙ্কেত জেনেও কিছু করতে পারবে না! কিন্তু খুব সাবধান বিমল! পকেট-বইখানা যেন আবার চুরি না যায়।'

বিমল বললে, 'সে বন্দোবস্ত আজকেই করব। পকেট-বইয়ের যেখানে যেখানে পথের কথা আর ঠিকানা আছে, সেসব জায়গা আমি কালি দিয়ে এমন করে কেটে দেব যে, কেউ তা আর পড়তে পারবে না!'

আমি বললুম, 'তাহলে আমরাও মুস্কিলে পড়ব যে!'

বিমল হেসে বললে, 'কোন ভয় নেই! ঠিকানা আর পথের বর্ণনা আর-একখানা আলাদা কাগজে নতুন একরকম সাঙ্কেতিক কথাতে আমি টুকে রাখব,—সে সঙ্কেত আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আমি বললুম, 'এখন আমরা কি করব?'

বিমল বললে, 'আগে মড়ার মাথাটা উদ্ধার করতে হবে!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কি করে?'

বিমল বললে, 'যেমন করে তারা মড়ার মাথা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছে।'

আমি বললুম, 'চোরের উপর বাটপাড়ি?'

বিমল বললে, 'তাছাড়া আর উপায় কি? আজ রাত্রেই আমি করালীর বাড়ীতে যেমন করে পারি ঢুকব। আমার সঙ্গে থাকবে তুমি।'

আমি একটু ভেব্‌ড়ে গিয়ে বললুম, 'কিন্তু করালী যদি জানতে পারে, আমাদের চোর বলে ধরিয়ে দেবে যে! সে-ই যে মড়ার মাথাটা চুরি করেছে, তারও তো কোন প্রমাণ নেই!'

বিমল মরিয়ার মত বললে, 'কপালে যা আছে তা হবে! তবে এটা ঠিক, আমি বেঁচে থাকতে করালী আমাদের কারুকে ধরতে পারবে না।'

মনকে তবু বুঝ মানাতে না পেরে আমি বললুম, 'না ভাই, দরকার নেই। শেষটা কি পাড়ায় একটা কেলেঙ্কারি হবে?'

বিমল বেজায় চটে গিয়ে বললে, 'দূর ভীতু কোথাকার! এই সাহস নিয়ে তুমি যাবে রূপনাথের গুহায় যকের ধন আনতে? তার চেয়ে মায়ের কোলের আদুরে খোকাটি হয়ে বাড়ীতে বসে থাক—তোমার পকেট-বই এখনি আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি'—এই বলেই বিমল হন্ হন্ করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি বিমলকে আবার ফিরিয়ে এনে বললুম, 'বিমল, তুমি ভুল বুঝছ—আমি একটুও ভয় পাইনি! আমি বলছিলুম কি—'

বিমল আমাকে বাধা দিয়ে বললে, 'তুমি কি বলছ, আমি তা শুনতে চাই না। স্পষ্ট করে বল, আজ রাত্রে আমার সঙ্গে তুমি করালীর বাড়ীতে যেতে রাজি আছ কি না?'

আমি জবাব দিলুম—'আছি।'

বিমল খুশি হয়ে আমার হাতদুটো আচ্ছা করে নেড়ে দিয়ে

বললে, 'হুঁ, এই তো "গুড বয়ে"র মত কথা। যদি মানুষ হতে চাও, ডানপিটে হও।'

আমি হেসে বললুম, 'কিন্তু ডানপিটের মরণ যে গাছের আগায়।'



'এই সাহস নিয়ে তুমি যাবে রূপনাথের গুহায় যকের ধন আনতে?'

বিমল বললে, 'বিছানায় শুয়ে থাকলেও মানুষ তো যমকে কলা দেখাতে পারে না! মরতেই যখন হবে, তখন বিছানায় শুয়ে মরার চেয়ে বীরের মত মরাই ভালো। তোমরা যাদের ভালো ছেলে বল— সেই গোবর-গণেশ মিন্‌মিনে ননীর পুতুলগুলোকে আমি দু-চোখে দেখতে পারি না। সায়েবের জুতো খেয়ে তাদেরই পিলে ফাটে, বিপদে পড়লে তারাই আর বাঁচে না, মরে বটে—তাও কাপুরুষের মত। এরাই বাঙালীর কলঙ্ক। জগতে যেসব জাতি আজ মাথা তুলে বড় হয়ে আছে—বিপদের ভেতর দিয়ে, মরণের কুছ-পরোয়া না রেখে তারা সবাই শ্রেষ্ঠ হতে পেরেছে। বুঝলে কুমার? বিপদ দেখলে আমার আনন্দ হয়।'

ছয় ॥ চোরের উপর বাটপাড়ি

সেদিন অমাবস্যা। চারিদিকে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। কেবল জোনাকীগুলো মাঝে মাঝে পিটপিট করে জ্বলছে—ঠিক যেন আঁধার-রাক্ষসের রাশি রাশি আগুন-চোখের মতন।

আমাদের বাড়ী কলকাতার প্রায় বাইরে, সেখানটা এখনো শহরের মতন ঘিঞ্জি হয়ে পড়েনি। বাড়ীঘর খুব তফাতে তফাতে—গাছপালাই বেশী, বাসিন্দা খুব কম। অর্থাৎ আমরা নামেই কলকাতায় থাকি, এখানটাকে আসল কলকাতা বলা যায় না।

আমাদের বাড়ীর পরে একটা মাঠ, সেই মাঠের একপাশের একটা ঝুপ্‌ঝোপের ভিতরে বিমল আর আমি সুযোগের অপেক্ষায় লুকিয়ে বসে আছি। মাঠের ওপারে করালীর বাড়ী।

মশারা আমাদের সাড়া পেয়ে আজ ভারি খুশি হয়ে ক্রমাগত ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে—বিনি পয়সার ভোজের লোভে! সে-তল্লাটে যত মশা ছিল, ব্যাণ্ডের আওয়াজ শুনে সবাই সেখানে এসে হাজির হল এবং আমাদের সর্বাঙ্গে আদর করে শুঁড় বুলিয়ে দিতে লাগল। সেই সাংঘাতিক আদর আর হজম করতে না পেরে আমি চুপি চুপি বিমলকে বললুম, 'ওহে, আর যে সহ্য হচ্ছে না।'

বিমল খালি বললে, 'চুপ!'

—'আর চুপ করে থাকা যে কত শক্ত, তা কি বুঝছ না?'

—'বুঝছি সব! আমি চুপ করে আছি কি করে?'

এ কথার উপরে আর কথা চলে না। অগত্যা চুপ করেই রইলুম।

ক্রমে মুখ-হাত-পা যখন ফুলে প্রায় ঢোল হয়ে উঠল, তখন নিশুত রাতের বুক কাঁপিয়ে গির্জে ঘড়িতে 'টং' করে একটা বাজল।

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এইবার সময় হয়েছে!'

আমি তৈরী হয়েই ছিলুম—একলাফে ঝোপের বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

বিমল বললে, 'আগে এই মুখোসটা পরে নাও।'

বিমল আজ দুপুরবেলায় রাধাবাজার থেকে দুটো দামী বিলাতী মুখোস কিনে এনেছে। দুটোই কাফ্রীর মুখ,—দেখতে এমন ভয়ানক যে, রাত্রে আচম্কা দেখলে বুড়ো-মিন্সেদেরও পেটের পিলে চমকে যাবে। মুখোস পরার উদ্দেশ্য, কেউ আমাদের দেখলেও চিনতে পারবে না।

মুখোস পরে দুজনে আস্তে আস্তে করালীর বাড়ীর দিকে এগুতে লাগলুম। তার বাড়ীর পিছন দিকে গিয়ে বিমল চুপিচুপি বললে, 'মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে নাও।'

আমি বললুম, 'কিন্তু এদিকে তো বাড়ীর ভেতরে ঢোকবার দরজা নেই।'

বিমল বললে, 'দরজা দিয়ে ঢুকবে কে? আমরা কি নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি? এদিকে একটা বড় বটগাছ আছে, সেই গাছের ডাল করালীর বাড়ীর দোতলার ছাদের ওপরে গিয়ে পড়েছে। আমরা ডাল বেয়ে বাড়ীর ভেতরে যাব।' বিমল তার হাতের চোরা লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরলে,—একটা আলোর রেখা ঠিক আমাদের বটগাছের উপরে গিয়ে পড়ল।

বাড়ীতে ঢুকবার এই উপায়ের কথা শুনে আমার মনটা অবশ্য খুশি হল না—কিন্তু মুখে আর কিছু না বলে, বিমলের সঙ্গে সঙ্গে গাছের উপর উঠতে লাগলুম।

অনেকটা উঁচুতে উঠে বিমল বললে, 'এইবার খুব সাবধানে এস। এই দেখ ডাল। এই ডাল বেয়ে গিয়ে ছাদের উপরে লাফিয়ে পড়তে হবে।'

আবছায়ার মতন ডালটা দেখতে পেলুম। বিমল আগে ডাল ধরে এগিয়ে গেল—একটা অস্পষ্ট শব্দে বুঝলুম, সে ছাদের উপরে লাফিয়ে পড়ল।

আমি দু-ধারে দু'পা রেখে আর দু'হাতে প্রাণপণে ডালটা ধরে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলুম—প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়, এই বুঝি পড়ে যাই! সেখান থেকে পড়ে গেলে স্বয়ং ধন্বন্তরিও আমাকে বাঁচাতে পারবেন না।

হঠাৎ বিমলের অস্পষ্ট গলা পেলুম—'ব্যাস! ডাল ধরে ঝুলে পড়।'

আমি ভয়ে ভয়ে ডাল ধরে ঝুলে পড়লুম।

—'এইবার ডাল ছেড়ে দাও।'

ডাল ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ধুপ করে ছাদের উপরে গিয়ে পড়লুম।

বিমল আমার পিঠ চাপড়ে বললে, 'সাবাস।'

আমি কিন্তু মনের মধ্যে কিছুমাত্র ভরসা পেলুম না। এসেছি চোরের মত পরের বাড়ীতে, ধরা পড়লেই হাতে পরতে হবে হাত-কড়া! তারপর আর এক ভাবনা—পালাব কোন্ পথ দিয়ে? লাফিয়ে তো ছাদে নামলুম, কিন্তু লাফিয়ে তো আর ঐ উঁচু ডালটা ফের ধরা যাবে না! বিমলকেও আমার ভাবনার কথা বললুম।

বিমল বললে, 'সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ বলেই আমাদের গাছে চড়তে হল। পালাবার সময় দরজা খুলেই পালাব।'

—'কিন্তু বাড়ীতে দরোয়ান আছে যে!'

—'তার ব্যবস্থা পরে করা যাবে। এখন চল, দেখি নীচে নামবার সিঁড়ি কোন্ দিকে। পা টিপে টিপে এস।'

ছাদের পশ্চিম কোণে সিঁড়ি পাওয়া গেল। বিমল আগে নামতে লাগল। আমি রইলুম পিছনে। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই একটা ঘর। বিমল দরজার উপরে কান পেতে চুপি চুপি আমাকে বললে, 'এ ঘরে কে ঘুমোচ্ছে, তার নাক ডাকছে।'

চোরা-লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখে আমরা দালানের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। একপাশে তিনটে ঘর—সব ঘরই ভেতর থেকে বন্ধ। বিমল চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। আমি তো

একেবারে হতাশ হয়ে পড়লুম। এত বড় বাড়ী, ভিতরকার খবর আমরা কিছুই জানি না, এতটুকু একটা মড়ার মাথা কোথায় লুকানো আছে, কি করে আমরা সে খোঁজ পাব? বিমলও যেমন পাগল! আমাদের খালি কাদা ঘেটে মরাই সার হল!

হঠাৎ বিমল বললে, 'ওধারকার দালানের একটা ঘরের দরজা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। চল ঐদিকে।'

বিমল আস্তে আস্তে সেইদিকে ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজাটা ঠেলতেই একটু খুলে গেল। ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বিমল খানিকক্ষণ কি দেখলে, তারপর ফিরে আমার কানে কানে বললে 'দেখ!'

দরজার ফাঁক দিয়ে যা দেখলুম, তাতে আনন্দে আমার বুকটা নেচে উঠল! টেবিলের উপর মাথা রেখে করালী নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, আর তার মাথার কাছেই পড়ে রয়েছে—আমরা যা চাচ্ছি তাই—সেই মড়ার মাথাটা! করালী নিশ্চয় সঙ্কেতগুলোর অর্থ বুঝবার চেষ্টা করছিল—তারপর কখন হতাশ ও শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। করালী তাহলে সত্যিই চোর!

বিমল খুব সাবধানে দরজাটা আর একটু খুলে, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ঘরের ভিতরে গেল। তারপর ঘুমন্ত করালীর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে মড়ার মাথাটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলে। তারপর হাসতে হাসতে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। এত সহজে যে কেল্লা ফতে হবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!

এইবার পালাতে হবে। একবার বাইরে যেতে পারলেই আমরা নিশ্চিন্ত—আর আমাদের পায় কে!

দুজনেই একতলায় গিয়ে নামলুম। উঠান পার হয়েই সদর দরজা। কিন্তু কি মুস্কিল, বিমলের চোরা-লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল, একটা খুব লম্বা-চওড়া জোয়ান দরোয়ান দরজা জুড়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে, দিব্যি আরামে নিদ্রা দিচ্ছে!

বিমল কিন্তু একটুও ইতস্ততঃ করলে না, সে খুব আস্তে আস্তে

দরোয়ানকে টপকে দরজার খিল খুলতে গেল। ভয়ে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল—একটু শব্দ হলেই সর্বনাশ।



টেবিলের উপর মাথা রেখে করালী নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু বিমল কি বাহাদুর! সে এমন সাবধানে দরজা খুললে যে একটুও আওয়াজ হল না।

হঠাৎ আমার নাকের ভিতরে কি একটা পোকা ঢুকে গেল—সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচ্চো করে খুব জোরে আমি হেঁচে ফেললুম।

দরোয়ানের ঘুম গেল ভেঙে। বাজখাই গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল—'কোন্ হ্যায় রে!'—

লণ্ঠনটা তখন ছিল আমার হাতে। তার আলোতে দেখলুম, বিমল বিদ্যুতের মতন ফিরে দাঁড়াল, তারপর বাঘের মতন দরোয়ানের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে তার গলা টিপে ধরল। খানিকক্ষণ গোঁ-গোঁ করেই চোখ কপালে তুলে দরোয়ানজী একেবারে অজ্ঞান।

তারপর আর কি—দে ছুট তো দে ছুট! ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াও তখন ছুটে আমাদের ধরতে পারত না—একদমে বাড়ীতে এসে তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

সাত ॥ জানলায় কালো মুখ

এক এক গেলাস জল খেয়ে, ঠাণ্ডা হয়ে, দুজনে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলুম। রাত তখন আড়াইটে।

বিমল বললে, 'আজ রাতে আর ঘুম নয়। কাল বৈকালের গাড়ীতে আমরা আসাম যাব।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি! এত তাড়াতাড়ি!'

বিমল বললে, 'হুঁ; তাড়াতাড়ি না করলে চলবে না। করালী রাস্কেল আমাদের ওপরে চটে রইল—মড়ার মাথা যে আমরাই আবার তার হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছি, এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে তা টের পেয়েছে! কখন কি ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসবে কে তা জানে? কালই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'মা গেছেন শান্তিপুরে, মামার বাড়ীতে। তাঁকে না জানিয়ে আমি কি করে যাব?'

বিমল বললে, 'তাঁকে চিঠি লিখে দাও—আমার সঙ্গে তুমি আসামে বেড়াতে যাচ্ছ, বড় তাড়াতাড়ি বলে যাবার আগে দেখা করতে পারলে না।'

আমি চিন্তিত মুখে বললুম, 'চিঠি যেন লিখে দিলুম, কিন্তু এত

বড় একটা কাজে যাচ্ছি, অনেক বন্দোবস্ত করতে হবে যে! কালকের মধ্যে সব গুছিয়ে উঠতে পারব কেন?'

বিমল বিরক্ত স্বরে বললে, 'তোমাকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না, বন্দোবস্ত যা করবার তা আমিই করব অখন। তুমি খালি কাপড়-চোপড় আর গোটাকতক কোট-প্যাণ্ট নিও—বুঝলে অকর্মার ধাড়ী?'

—'কেন? কোট-প্যাণ্ট আবার কি হবে?'

—'যেতে হবে পাহাড়ে আর জঙ্গলে। সেখানে ফুলবাবুর মত কাছা-কোঁচা সামলাতে গেলে চলবে না—তাহলে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে।'

আমি চুপ ক'রে ভাবতে লাগলুম।

বিমল বললে, 'ভেবেছিলুম তুজনেই যাব। কিন্তু তুমি যেরকম নাবালক গোবেচারা দেখছি, সঙ্গে আর একজনকে নিলে ভালো হয়।'

—'কাকে নেবে?'

—'আমার চাকর রামহরিকে। সে আমাদের পুরানো লোক; বিশ্বাসী, বুদ্ধিমান আর তার গায়েও খুব জোর। আমার জন্যে সে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে।'

—'আচ্ছা, সে কথা মন্দ নয়। আমিও বাঘাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তাতে তোমার আপত্তি—'

—'চুপ!' বলেই বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর ছুটে গিয়ে হঠাৎ ঘরের একটা জানলা তু-হাট করে খুলে দিলে। স্পষ্ট দেখলুম জানলার বাহির থেকে একখানা বিশ্রী কালো-কুচ্‌কুচে মুখ বিত্যুতের মতন একপাশে সরে গেল। জানলায় কান পেতে নিশ্চয় কেউ আমাদের কথাবার্তা শুনছিল! বিমলও দাঁড়াল না—ঘরের কোণ থেকে একগাছা মাথা-সমান উঁচু মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে একছুটে বেরিয়ে গেল! আমি ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম।

খানিক পরে বিমল ফিরে এসে আমাকে ডাকলে। আমি আবার

দরজা খুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কি? লোক-টাকে ধরতে পারলে?'

লাঠিগাছা ঘরের কোণে রেখে দিয়ে বিমল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'নাঃ, পিছনে তাড়া করে অনেকদূর গিয়েছিলুম, কিন্তু ধরতে পারলুম না।'

—'লোকটা কে বল দেখি?'

—'কে আবার—করালীর লোক, খুব সম্ভব ভাড়াটে গুণ্ডা। কুমার, ব্যাপার কিরকম গুরুতর তা বুঝছ কি? লোকটা আমাদের কথা হয়তো সব শুনেছে।'

—'বিমল, তুমি ঠিক বলেছ, আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়, আমরা কালকেই বেরিয়ে পড়ব।'

—'তা তো পড়ব, কিন্তু বিপদ হয়তো আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাবে।'

—'তার মানে?'

—'করালী বোধ হয় তার দলবল নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে।'

আমি একেবারে দমে গেলুম! বিমল বসে বসে ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সে বললে, 'যা-থাকে কপালে। তা বলে করালীর ভয়ে আমরা যে কেঁচোর মতন হাত গুটিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকব, এ কিছুতেই হতে পারে না। কালকেই আমাদের যাওয়া ঠিক।'

আমি কাতরভাবে বললুম, 'বিমল, গোঁয়ার্তুমি কোরো না।'

বিমল চৌকির উপরে একটা ঘুষি মেরে বললে, 'আমি যাবই যাব। তোমার ভয় হয়, বাড়ীতে বসে থাকো। আমি নিজে যকের ধন এনে তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যাব—দেখি, করালী হারে কি আমি হারি।'

আমি তার হাত ধরে বললুম, 'বিমল, আমি ভয় পাইনি। তুমি যাও তো আমিও নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু ভেবে দেখ, শেষটা বন-জঙ্গলের ভেতরে একটা খুনোখুনি হতে পারে! করালীরা দলে ভারি, আমরা তার কিছুই করতে পারব না।'

বিমল অবহেলার হাসি হেসে বললে, 'করালীর নিকুচি করেছে। কুমার, আমার গায়েই খালি জোর নেই—বুদ্ধির জোরও আমার কিছু কিছু আছে। তুমি কিছু ভেব না, আমার সঙ্গে চল, করালীকে কিরকম নাকানি-চোবানি খাওয়াই একবার দেখে নিও।'

আমি বিমলকে ভালোরকম চিনি। সে মিছে জাঁক কাকে বলে জানে না। সে যখন আমাকে অভয় দিচ্ছে, তখন মনে মনে নিশ্চয় কোন একটা নূতন উপায় ঠিক করেছে। কাজেই আমিও নিশ্চিন্তভাবে বললুম, 'আচ্ছা ভাই, তুমি যা বল আমি তাতেই রাজি!'

আট ।। শাপে বর

সারারাত জিনিস-পত্তর গুছিয়ে, ভোরের মুখে ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে যথাসময়ে আমরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের দলে রইল বিমলের পুরানো চাকর রামহরি ও আমার কুকুর বাঘা। দুটো বড় বড় ব্যাগ, একটা 'সুটকেস' ও একটা 'ইকমিক কুকার' ছাড়া বিমল আর কিছু সঙ্গে নিতে দিলে না।

ব্যাগ দুটোর ভিতরে কিন্তু ছিল না, এমন জিনিস নেই। ছুরি-ছোরা, কাঁচি, নানারকম ওষুধভরা ছোট একটি বাক্স, ফটো তুলবার ক্যামেরা, ইলেকট্রিক 'টর্চ' বা মশাল, 'ফ্লাস্ক', (যার সাহায্যে দুধ, জল বা চা ভরে রাখলে চব্বিশ ঘণ্টা সমান ঠাণ্ডা বা গরম থাকে), গোটাকতক বিস্কুট, ফল ও মাছ-মাংসের টিন (অনেক দিনে যা নষ্ট হবে না), আসাম সম্বন্ধে খানকয়েক ইংরেজী বই, ছাতা, ছোট ছোট দুটো বালিস আর সতরঞ্চি, কাফ্রির সেই দুটো মুখোস (বিমলের মতে পরে ও-দুটোও কাজে লাগতে পারে) প্রভৃতি কত রকমের জিনিসই যে এই ব্যাগ দুটোর ভিতরে ভরা হয়েছে, তা আর নাম করা যায় না। 'সুটকেসের' ভিতরে আমাদের জামা-কাপড় রইল। আমরা প্রত্যেকেই এক এক গাছা মোটা দেখে লাঠি নিলুম—দরকার হলে

এ লাঠি দিয়ে মানুষের মাথা খুব সহজেই ভাঙা যেতে পারবে। অবশ্য, বিমল বন্দুক দুটোও সঙ্গে নিতে ভুললে না।

বাড়ী ছেড়ে বেরুবার সময় মনটা যেন কেমন-কেমন করতে লাগল। দেশ ছেড়ে কোথায় কোন্ বিদেশে, পাহাড়ে-জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুক আর শত্রুর মুখে পড়তে চললুম, যাবার সময়ে মায়ের পায়ে প্রণাম পর্যন্ত করতে যেতে পারলুম না—কে জানে এ জীবনে আর কখনো ফিরে এসে মাকে দেখতে পাব কিনা! একবার মনে হল বিমলকে বলি যে, 'আমি যাব না।' কিন্তু পাছে সে আমাকে ভীরু ভেবে বসে, সেই ভয়ে মনকে শক্ত করে রইলুম।

বিমলও আমার মুখের পানে তাকিয়ে মনের কথা বোধহয় বুঝতে পারলে। কারণ, হঠাৎ সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কুমার, তোমার মন কেমন করছে?'

আমি সত্য কথাই বললুম—'তা একটু একটু করছে বৈকি!'

—'মায়ের জন্যে?'

—'হুঁ।'

—'ভেব না। খুব সম্ভব আজকেই হয়তো তোমার মাকে তুমি দেখতে পাবে!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কি করে? আমরা তো যাচ্ছি আসামে!'

—'তা যাচ্ছি বটে!'—বলেই বিমল একবার সন্দেহের সঙ্গে পিছন দিকে চেয়ে দেখলে—তার চোখ-মুখের ভাব উদ্বিগ্ন। সে নিশ্চয় দেখছিল শত্রুরা আমাদের পিছু নিয়েছে কিনা! কিন্তু কারুকেই দেখতে পাওয়া গেল না।

বিমলের বাড়ীর গাড়ী আমাদের স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমরা গাড়ীতে গিয়ে চড়ে বসলুম। গাড়ী ছেড়ে দিলে। বিমল সারা পথ অন্যমনস্ক হয়ে রইল। মাঝে মাঝে তেমনি উদ্বেগের সঙ্গে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পেছনপানে চেয়ে দেখতে লাগল।

শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে আমরা গাড়ী থেকে নামলুম। একবার চারিদিকে সতর্ক চোখে চেয়ে দেখে আমি বললুম, 'বিমল, আপাতত আমাদের কোন ভয় নেই। করালীরা আমাদের পিছু নিতে পারেনি।'

বিমল সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললে, 'তোমরা এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি টিকিট কিনে আনি।'

টিকিট কিনে ফিরে এসে, বিমল আমাদের নিয়ে স্টেশনের ভিতর গিয়ে ঢুকল। বাঘাকে জন্তুদের কামরায় তুলে দিয়ে এল। বাঘা বেচারী এত লোকজন দেখে ভড়কে গিয়েছিল। সে কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়তে রাজি হল না, শেষটা বিমল শিকলি ধরে তাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল।

গাড়ী ছাড়তে এখনো দেরি আছে। কামরার মধ্যে বেজায় গরম দেখে আমি গাড়ী থেকে নেমে পড়ে প্লাটফর্মের উপর পায়চারি করতে লাগলুম। ঘুরতে ঘুরতে গাড়ীর একেবারে শেষ দিকে গেলুম। হঠাৎ একটা কামরার ভিতর আমার নজর পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি সভয়ে দেখলুম, কামরার ভিতরে করালী বসে আছে। তুজন মিশকালো গুণ্ডার মত লোকের সঙ্গে হাত-মুখ নেড়ে সে কি কথাবার্তা কইছিল—আমাকে দেখতে পেলে না। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে নিজেদের গাড়ীতে এসে উঠে পড়লুম।

বিমল বললে, 'কিহে কুমার, ব্যাপার কি? চোখ কপালে তুলে ছুটতে ছুটতে আসছ কেন?'

আমি বললুম, 'বিমল, সর্বনাশ হয়েছে!'

বিমল হেসে বললে, 'কিছুই সর্বনাশ হয়নি! তুমি করালীকে দেখেছ তো? তা আর হয়েছে কি? সে যে আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না, আমি তা অনেকক্ষণই জানি। যাক্, তুমি ভয় পেও না, চুপ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো।'

বিমল যত সহজে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলে, আমি তা পারলুম না। আস্তে আস্তে এককোণে গিয়ে বসে পড়লুম বটে, মন কিন্তু

বিমর্ষ হয়ে রইল। বিমল আমার ভাব দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। এদিকে গাড়ী ছেড়ে দিলে।

জানি না, কপালে কি আছে। জঙ্গলের ভিতরে অপঘাতেই মরতে হবে দেখছি! করালীর সঙ্গে কত লোক আছে তা কে জানে? সে যখন আমাদের পিছু নিয়েছে, তখন সহজে কি আর ছেড়ে দেবে? আমি খালি এইসব কথা ভেবে ও নানারকমের বিপদ কল্পনা করে শিউরে উঠতে লাগলুম।

বিমল কিন্তু দিব্য আরামে সামনের বেঞ্চে পা তুলে দিয়ে বসে নিজের মনে কি একখানা বই পড়তে লাগল।

গাড়ী একটা স্টেশনে এসে থামল। বিমল মুখ বাড়িয়ে স্টেশনের নাম দেখে আমাকে বললে, 'কুমার, প্রস্তুত হও! পরের স্টেশন রাণা-ঘাট। এইখানেই আমরা নামব।'

এ আবার কি কথা! আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'রাণাঘাটে নামব! কেন?'

—'সেখান থেকে শান্তিপুরে, তোমার মামার বাড়ীতে মায়ের কাছে যাব।'

—'হঠাৎ তোমার মত বদলালে কেন?'

—'মত কিছুই বদলায়নি,—আজ কি করব, কাল থেকেই আমি তা জানি। কিন্তু তোমাকে কিছু বলিনি। এই দেখ, আমি শান্তিপুরের টিকিট কিনেছি। এর কারণ কিছু বুঝলে কি?'

—'না।'

—'আমি বেশ জানতুম, করালী আমাদের পিছু নেবে। কালকেই তার চর শুনে গেছে, আমরা আসামে যাব। আজও সে জানে, আমরা আসাম ছেড়ে আর কোথাও যাব না। সে তাই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ীর ভিতরে বসে থাকুক, আর সেই ফাঁকে আমরা রাণাঘাটে নেমে পড়ি। দিন-দুয়েক তোমার মামার বাড়ীতে বসে বসে আমরা তো মজা করে পোলাও কালিয়া খেয়ে নি! আর ওদিকে করালী যখন জানতে পারবে আমরা আর গাড়ীর ভিতরে

নেই, তখন মাথায় হাত দিয়ে একেবারে বসে পড়বে। নিশ্চয় ভাববে যে আমরা তাকে ভুলিয়ে অন্য কোন পথ দিয়ে যকের ধনের খোঁজে গেছি। সে হতাশ হয়ে কলকাতার দিকে ফিরবে, আর আমরা তোমার মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সোজা আসামের দিকে যাত্রা করব। আর কেউ আমাদের পিছু নিতে পারবে না।'

আমার পক্ষে এটা হল শাপে বর। ওদিকে করালীও জব্দ, আর এদিকে আমারও মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল,—একেই বলে লাঠি না ভেঙে সাপ মারা! বিমলের দু'খানা হাত চেপে ধরে আমি বলে উঠলুম, 'ভাই, তুমি এত বুদ্ধিমান! আমি যে অবাক হয়ে যাচ্ছি!'

গাড়ী রাণাঘাটে এসে থামতেই আমরা টপাটপ্ নেমে পড়লুম—কেউ আমাদের দেখতে পেলে না!*

নয় ।। নতুন বিপদের ভয়

তিনদিন মামার বাড়ীতে খুব আদরে কাটিয়ে মায়ের কাছ থেকে আমি বিদায় নিলুম। মা কি সহজে আমাকে ছেড়ে দিতে চান? তবু তাঁকে আমরা যকের ধন আর বিপদ-আপদের কথা কিছুই বলিনি, তিনি শুধু জানতেন আমরা আসামে বেড়াতে যাচ্ছি।

যাবার সময়ে বিমলকে ডেকে মা বললেন, 'দেখো বাবা, আমার শিবরাত্রির সল্‌তেটুকুকে তোমার হাতে সঁপে দিলুম, ওকে সাবধানে রেখ।'

বিমল বললে, 'ভয় কি মা, কুমার তো আর কচি খোকাটি নেই, ওর জন্যে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

মা বললেন, 'না বাছা, কুমারকে তুমি কোথাও একলা ছেড়ে

* বিমল ও কুমার যখন আসামে যায়, তখন ওখানে যাবার অন্য পথ ছিল। আজকাল কলকাতার যাত্রীরা সে পথ দিয়ে আসামে যায় না।

দিও না—ও ভারি গোঁয়ার-গোবিন্দ, কি করতে কি করে বসবে কিছুই ঠিক নেই। ও যদি তোমার মত শান্তশিষ্টটি হত তাহলে আমাকে এত ভেবে মরতে হত না!'

বিমল একটু মুচকে হেসে বললে, 'আচ্ছা মা, আমি তো সঙ্গে রইলুম, যাতে গোঁয়ার্তুমি করতে না পারে, সেদিকে আমি চোখ রাখব।'

আমি মনে মনে হাসতে লাগলুম। মা ভাবছেন আমি গোঁয়ার-গোবিন্দ আর বিমল শান্তশিষ্ট। কিন্তু বিমল যে আমার চেয়ে কত বড় গোঁয়ার আর ডান্‌পিটে, মা যদি তা ঘুণাক্ষরেও জানতেন!

মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আমি, বিমল আর রামহরি দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লুম—বাঘা আমাদের পিছনে পিছনে আসতে লাগল। কিন্তু শান্তিপুরের স্টেশনের ভিতরে এসে, রেলগাড়ীকে দেখেই বাঘা পেটের তলায় ল্যাজ গুঁজে একেবারে যেন মুসড়ে পড়ল। সে বুঝলে, আবার তাকে জন্তুদের গাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে একলাটি বেঁধে রেখে আসা হবে।

রাণাঘাটে নেমে আমরা আসল গাড়ী ধরলুম। বিমল খুশি-মুখে বললে, 'যাক্ এবারে আর করালীর ভয় নেই। সে হয়তো এখন আসামে বসে নিজের হাত কামড়াচ্ছে, আর আমাদের মুণ্ডুপাত করছে।'

আমি বললুম, 'আসাম থেকে করালী এখন কলকাতায় ফিরে থাকতেও পারে।'

বিমল বললে, 'কলকাতায় কেন, সে এখন যমালয়ে গেলেও আমার আপত্তি নেই। চল, গাড়ীতে উঠে বসা যাক।'

অনেক রাত্রে গাড়ী সারাঘাটে গিয়ে দাঁড়াল। যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে, পদ্মার উপর তখনো সারার বিখ্যাত পুলটি তৈরি হয়নি। সারাঘাটে সকলকে তখন গাড়ী থেকে নেমে স্টীমারে করে পদ্মার ওপারে গিয়ে আবার রেলগাড়ী চড়তে হত। কাজেই সারায় এসে আমাদেরও মাল-পত্তর নিয়ে গাড়ী থেকে নামতে হল।

আগেই বলেছি, আমি কখনো কলকাতার বাইরে পা বাড়াইনি। স্টীমারে চড়ে চারিদিকের দৃশ্য দেখে আমার যেন তাক লেগে গেল! কলকাতার গঙ্গার চেয়েও চওড়া নদী যে আবার আছে, এই পদ্মাকে দেখে প্রথম সেটা বুঝতে পারলুম। আকাশে চাঁদ উঠেছে আর গায়ে জ্যোৎস্না মেখে পদ্মা নেচে, দুলে, বেগে ছুটে চলছে—রূপোর জল দিয়ে তার ঢেউগুলি তৈরী। মাঝে মাঝে সাদা ধবধবে বালির চর চোখের সামনে কখনো জেগে উঠছে, কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে—স্বপ্নের ছবির মতন। আমার মনে হল ঐ নিরিবিলি বালির চরগুলির মধ্যে হয়তো এতক্ষণ পরীরা এসে হাসি-খুসি, খেলাধূলা করছিল। স্টীমারের গর্জন শুনে দৈত্য বা দানব আসছে ভেবে এখন তারা ভয় পেয়ে হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে মিশিয়ে গেছে!

বালির চর এড়িয়ে স্টীমার ক্রমেই অন্য তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, খালাসীরা জল মাপছে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি বলছে। স্টীমারের একদিকে নানা জাতের মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে জড়ামড়ি করে বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে গোলমাল করছে, আর একদিকে ডেকের উপরে উজ্জ্বল আলোতে চেয়ার-টেবিল পেতে বাহার দিয়ে বসে সাহেব-মেমরা খানা খাচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে অন্যদিকে মুখ ফেরাতেই দেখি, একটা লোক আড়-চোখে আমার পানে তাকিয়ে আছে। তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হতেই সে হন্ হন্ করে এগিয়ে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল!

স্টীমার ঘাটে এসে লাগল। আমরা সবাই একে একে নীচে নেমে স্টেশনের দিকে চললুম। আসাম মেল তখন আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ভোঁস ভোঁস করে ধোঁয়া ছাড়ছিল—আমরাও তার পেটের ভিতর ঢুকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলুম।

কামরার জানলার কাছে আমি বসেছিলুম। প্লাটফর্মের ওপাশে আর একখানা রেলগাড়ী—সেখানাতে দার্জিলিঙের যাত্রীদের ভিড়। ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাসের সায়েব-মেমেরা কামরার ভিতরে বিছানা পাতছিল—একঘুমে রাত কাটিয়ে দেবার জন্যে। তাদের

ঘুমের আয়োজন দেখতে দেখতে আমারও চোখ ঢুলে এল। আমিও শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছি—হঠাৎ আবার দেখলুম, স্টীমারের সেই অচেনা লোকটা প্লাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে তেমনি আড়-চোখে আমাদের দিকে বারে বারে চেয়ে দেখছে।

এবার আমার ভারি সন্দেহ হল। বিমলের দিকে ফিরে বললুম, 'ওহে, দেখ দেখ!'

বিমল বেঞ্চির উপর কম্বল পাততে পাততে বললে, 'আর দেখা-শুনো কিছু নয়—এখন চোখ বুজে নাক ডাকিয়ে ঘুমোবার সময়!'

—'ওহে, না দেখলে চলবে না। স্টীমার থেকে একটা লোক বরাবর আমাদের ওপর নজর রেখেছে—এখনো সে দাঁড়িয়ে আছে, যেন পাহারা দিচ্ছে!'

শুনেই বিমল একলাফে জানলার কাছে এসে বললে 'কৈ কোথায়?'

—'ঐ যে।'

কিন্তু লোকটাও তখন বুঝতে পেরেছিল যে, আমরা তার উপরে সন্দেহ করেছি। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল।

বিমল চিন্তিতের মত বললে, 'তাই তো, এ আবার কে?'

—'করালীর চর নয় তো?'

—'করালী? কিন্তু সে কি করে জানবে আজ আমরা এখানে আছি?'

—'হয় তো করালী আমাদের চালাকি ধরে ফেলেছে! সে জানত আমরা দু-চার দিন পরেই আবার আসামে যাব। আসামে যেতে গেলে এ পথে আসতেই হবে। তাই সে হয়তো এইখানে এতদিন ঘাঁটি আগলে বসেছিল।'

—'অসম্ভব নয়। আচ্ছা, একবার নেমে দেখা যাক, করালী এই গাড়ীর কোন কামরায় লুকিয়ে আছে কিনা।'—এই বলেই বিমল প্লাটফর্মের উপর নেমে এগিয়ে গেল।

গাড়ী যখন ছাড়ে-ছাড়ে, বিমল তখন ফিরে এল।

আমি বললুম, 'কি দেখলে?'

—'কিছু না। প্রত্যেক কামরায় তন্নতন্ন করে খুঁজেছি—করালী কোথাও নেই। বোধ হয় আমরা মিছে সন্দেহ করেছি।'

বিমলের কথায় আবার আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম—যদিও মনের মধ্যে কেমন একটা খটকা লেগে রইল।

গাড়ী ছেড়ে দিলে। বিমল বললে, 'ওহে কুমার, এই বেলা যতটা পারো ঘুমিয়ে নাও—আসামে একবার গিয়ে পড়লে হয়তো আমাদের আহার-নিদ্রা একরকম ত্যাগ করতেই হবে।'

বিমল বেঞ্চির উপরে 'আঃ' বলে সটান লম্বা হল, আমিও শুয়ে পড়লুম। সুখের বিষয়, এ কামরায় আর কেউ ছিল না, সুতরাং ঘুমে আর ব্যাঘাত পড়বার ভয় নেই।

দশ ॥ এ চোর কে?

আমরা খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি—সামনে বুদ্ধদেবের এক পাথরের মূর্তি। গভীর রাত্রি, আকাশে চাঁদ নেই, সবদিকে অন্ধকার। মাথার অনেক উপরে তারাগুলো টিপ টিপ করে জ্বলছে, তাদের আলোতে আশেপাশে ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো পাহাড়ের মাথা—আমার মনে হল সেগুলো যেন বড় বড় দানবের কালো কালো মায়ামূর্তি। তারা যেন প্রেতপুরীর পাহারাওয়ালার মত ওৎ পেতে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে—এখনি হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে! চারিদিক এত স্তব্ধ যে গায়ে কাঁটা দেয় বুক ছাঁৎ ছাঁৎ করে! শুধু রাত করছে—ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ আর ভয়ে কেঁপে গাছপালা করছে—সর্ সর্ সর সর্।

বিমল চুপিচুপি আমাকে বললে, 'এই বুদ্ধদেবের মূর্তি! এইখানেই যকের ধন আছে।'

হঠাৎ কে খল্ খল্ করে হেসে উঠল—সে বিকট হাসির প্রতিধ্বনি যেন পাহাড়ের মাথাগুলো টপকে লাফাতে লাফাতে কোথায় কতদূরে কোন্ চির-অন্ধকারের দেশের দিকে চলে গেল।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, রামহরি আঁতকে উঠে দু-হাতে মুখ ঢেকে ধুপ করে বসে পড়ল, বাঘা আকাশের দিকে মুখ তুলে ল্যাজ গুটিয়ে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে লাগল।

বিমল সাহসে ভর করে বললে, 'কে হাসলে?'

আবার সেই খল্ খল্ করে বিকট হাসি! কে যে হাসছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবে সে হাসি নিশ্চয়ই মানুষের নয়! মানুষ কখনো এমন ভয়ানক হাসি হাসতে পারে না!

বিমল আবার বললে, 'কে তুমি হাসছ?'

—'আমি!' উঃ, সে স্বর কি গম্ভীর!

—'কে তুমি? সাহস থাকে আমার সামনে এস!'

—'আমি তোমার সামনেই আছি।'

—'মিথ্যে কথা! আমার সামনে খালি বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে!'

—'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! আমাকে বুদ্ধদেবের মূর্তি ভাবচ? চেয়ে দেখ ছোকরা, আমি যক!'

বুদ্ধদেবের সেই মূর্তিটা একটু একটু নড়তে লাগল, তার চোখ দুটো ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল।

বিমল বন্দুক তুললে। মূর্তিটা আবার খল্ খল্ করে হেসে বললে, 'তোমার বন্দুকের গুলিতে আমার কিছুই হবে না।'

বিমল বললে, 'কিছু হয় কিনা দেখাচ্ছি!' সে বন্দুকের ঘোড়া টিপতে উদ্যত হল।

আকাশ-কাঁপানো স্বরে মূর্তি চেঁচিয়ে বললে, 'খবর্দার! তোমার গুলি লাগলে আমার গায়ের পাথর চটে যাবে! বন্দুক ছুঁড়লে তোমারি বিপদ হবে।'

—'হোক্‌গে বিপদ—বিপদকে আমি ডরাই না!'

—'জানো আমি আজ হাজার হাজার বছর ধরে এইখানে বসে

আছি, আর তুমি কালকের ছোকরা হয়ে আমার শান্তিভঙ্গ করতে এসেছ? কি চাও তুমি?'

—'গুপ্তধন!'

—'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! গুপ্তধন চাও,—ভারি আস্থা যে! এই গুপ্তধন নিতে এসে এখানে তোমার মত কত মানুষ মারা পড়েছে তা জানো? ঐ দেখ তাদের শুকনো হাড়।'

মূর্তির চোখের আলোতে দেখলুম, একদিকে মস্তবড় হাড়ের ঢিপি—হাজার হাজার মানুষের হাড়ে সেই ঢিপি অনেকখানি উঁচু হয়ে উঠেছে!

বিমল একটুও না দমে বললে, 'ও দেখে আমি ভয় পাই না—আমি গুপ্তধন চাই।'

—'আমি গুপ্তধন দেব না।'

—'দিতেই হবে!'

—'না, না, না!'

—'তাহলে বন্দুকের গুলিতে তোমার আগুন-চোখ কানা করে দেব!'

গর্জন করে মূর্তি বললে, 'তার আগেই তোমাকে আমি বধ করব!'

—'তুমি তো পাথর, এক পা এগুতে পার না, আমি তোমার নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি কি করবে?'

—'হাঃ হাঃ হাঃ, চেয়ে দেখ এখানে চারিদিকেই আমার প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে! আমার হুকুমে এখনি ওরা তোমাদের টিপে মেরে ফেলবে!'

—'কোথায় তোমার প্রহরী?'

—'প্রত্যেক পাহাড় আমার প্রহরী!'

—'ওরাও তো পাথর, তোমার মত নড়তে পারে না। এসব বাজে কথা রেখে হয় আমাকে গুপ্তধন দা—নয় এই তোমাকে গুলি করলুম!'—বিমল আবার বন্দুক তুললে।

—'তবে মর। প্রহরী!' মূর্তির আগুন-চোখ নিবে গেল—সঙ্গে সঙ্গে পলক না যেতেই অন্ধকারের ভিতর অনেকগুলো পাহাড়ের মত মস্তবড় কি কতকগুলো লাফিয়ে উঠে আমাদের উপরে হুড়মুড় করে এসে পড়ল। বিষম এক ধাক্কায় মাটির উপর পড়ে অসহ্য যাতনায় চেঁচিয়ে আমি বললুম—'বিমল—বিমল—'



আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'যক আর নেই?'

আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলুম, রেলগাড়ীর বেঞ্চের উপর থেকে গড়িয়ে আমি নীচে পড়ে গেছি, আর বিমল আমার মুখের উপরে ঝুঁকে বলছে, 'ভয় কি কুমার, সে রাস্কেল পালিয়েছে!'

তখনো স্বপ্নের ঘোর আমার যায়নি,—আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'যক আর নেই?'

বিমল আশ্চর্যভাবে বললে, 'যকের কথা কি বলছ কুমার?'

আমি উঠে বসে চোখ-কচলে অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, 'বিমল, আমি এতক্ষণ একটা বিদঘুটে স্বপ্ন দেখছিলুম। শুনলে তুমি অবাক হবে।'

বিমল বললে, 'আর গাড়ীর ভিতরে এখনি যে কাণ্ডটা হয়ে গেল, তা মোটেই স্বপ্ন নয়! শুনলে তুমিও অবাক হবে!'

আমি হতভম্বের মত বললুম, 'গাড়ীর ভেতরে আবার কি কাণ্ড হল?'

বিমল বললে, 'একটা চোর এসেছিল।'

—'চোর? বল কি?'

—'হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, একটা লোক আমাদের ব্যাগ হাতড়াচ্ছে। আমি তখনি উঠে তার রগে এক ঘুসি বসিয়ে দিলুম, সে ঠিকরে তোমার গায়ের উপরে গিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে তুমিও আঁতকে উঠে বেঞ্চির তলায় হলে চিৎপাত। লোকটা পড়েই আবার দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর চোখের নিমেষে জানলা দিয়ে বাইরে একলাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল!'

—'চলন্ত ট্রেন থেকে সে লাফ মারলে? তাহলে নিশ্চয়ই মারা পড়েছে!'

—'বোধ হয় না। ট্রেন তখন একটা স্টেশনের কাছে আস্তে আস্তে চলছিল।'

—'আমাদের কিছু চুরি গিয়েছে নাকি?'

—'হুঁ। মড়ার মাথাটা!' বলেই বিমল হাসতে লাগল।

—'বিমল, মড়ার মাথাটা আবার চুরি গেল, আর তোমার মুখে তবু হাসি আসছে?'

—'হাসব না কেন, চোর যে জাল মড়ার মাথা নিয়ে পালিয়েছে!'

—'জাল মড়ার মাথা! সে আবার কি?'

—'তোমাকে তবে বলি শোনো। এ-রকম বিপদ যে পথে ঘটতে পারে, আমি তা আগেই জানতুম। তাই কলকাতা থেকে

আসবার আগেই আমাদের পাড়ার এক ডাক্তারের কাছ থেকে আর একটা নতুন মড়ার মাথা জোগাড় করেছিলুম। নতুন মাথাটার উপরেও আসল মাথায় যেমন অঙ্ক আছে, তেমনি অঙ্ক ক্ষুদে দিয়েছি,—তবে এর মানে হচ্ছে একেবারে উল্টো! এই নকল মাথাটাই ব্যাগের ভেতরে ছিল। আমি জানতুম মড়ার মাথা চুরি করতে আবার যদি চোর আসে, তবে নকলটাকে নিয়েই সে তুষ্ট হয়ে যাবে। হয়েছেও তাই।'

—'বিমল, ধন্যি তোমার বুদ্ধি! তুমি যে এত ভেবে কাজ কর, আমি তা জানতুম না। আসল মড়ার মাথা কোথায় রেখেছ?'

অনেকের বাড়ীতে যেমন চোর-কুঠুরি থাকে, আমার ব্যাগের ভেতরেও তেমনি একটা লুকানো ঘর আছে। এ ব্যাগ আমি অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছি। মড়ার মাথা তার ভেতরেই রেখেছি।'

—'কিন্তু আমাদের পিছনে এ কোন্ নতুন শত্রু লাগল বল দেখি?'

—'শত্রু আর কেউ নয়—এ করালীর কাজ! সে আমার চালাকিতে ভোলেনি, নিশ্চয় এই গাড়ীতেই কোথাও ঘুপটি মেরে লুকিয়ে আছে।'

—'তবেই তো!'

—'কুমার, আবার তোমার ভয় হচ্ছে নাকি?'

—'ভয় হচ্ছে না, কিন্তু ভাবনা হচ্ছে বটে! এই দেখ না, করালীর চর যদি আজই ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে যেত?'

—'করালী আমাদের সঙ্গে নেই, এই ভেবে আমরা অসাবধান হয়েছিলুম বলেই আজ এমন কাণ্ড ঘটল। এখন থেকে আবার সাবধান হব—রামহরি আর বাঘাকে সর্বদাই কাছে কাছে রাখব, আর সকলে মিলে একসঙ্গে ঘুমবও না।'

—'করালী যখনি জানবে সে জাল মড়ার মাথা পেয়েছে, তখনি আবার আমাদের আক্রমণ করবে।'

—'আমরাও প্রস্তুত। কিন্তু সে যদি সাঙ্কেতিক লেখা এখনো পড়তে না পেরে থাকে, তবে এ জাল ধরা তার কর্ম নয়!'

গাড়ী তখন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে আর আমাদের চোখের সুমুখ দিয়ে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল বন-জঙ্গল-মাঠের দৃশ্যের পর দৃশ্য ভেসে যাচ্ছে—ঠিক যেন বায়োস্কোপের ছবির পর ছবি! আমার আর ঘুমোবার ভরসা হল না—বাইরের দিকে চেয়ে, বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলুম। প্রতি মিনিটেই গাড়ী আমাদের দেশ থেকে দূরে—আরও দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলছে, কত অজানা বিপদ আমাদের মাথার উপরে অদৃশ্যভাবে ঝুলছে! জানি না, এই পথ দিয়ে এ জীবনে কখনো দেশে ফিরতে পারব কি না!

এগারো ।। ছাতকে

আজ আমরা শ্রীহট্টে এসে পৌঁছেছি।

বিমল বললে, 'কুমার, এই সেই শ্রীহট্ট!'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, এই হচ্ছে সেই কমলালেবুর বিখ্যাত জন্মভূমি!'

বিমল বললে, 'উঁহু, কমলালেবু ঠিক শ্রীহট্ট শহরে তো জন্মায় না, তবে এখানকার প্রধান নদী সুরমা দিয়েই নৌকায় চড়ে কমলা-লেবু কলকাতায় যাত্রা করে বটে! খালি কমলালেবু নয়, এখানকার কমলামধুও যেমন উপকারী, তেমনি উপাদেয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ও অঞ্চলে আরো কি পাওয়া যায়?'

—'পাওয়া যায় অনেক জিনিস, যেমন আলু, কুমড়ো, শশা, আনারস, তুলো, আখ, তেজপাতা, লঙ্কা, মরিচ, ডালচিনি আর চূর্ণ প্রভৃতি। এসব মাল এ অঞ্চল থেকেই রপ্তানি হয়। কিন্তু এখানকার পান-সুপারির কথা শুনলে তুমি অবাক হবে!'

—'অবাক হব? কেন?'

—'বাংলা দেশের মত এখানে পানের চাষ হয় না, কিন্তু এদেশে পানের সঙ্গে সুপারির বড় ভাব। বনের ভেতরে প্রায়ই দেখবে, সুপারি-কুঞ্জেই পান জন্মেছে, সুপারি গাছের দেহ জড়িয়ে পানের লতা উপরে উঠেছে। তাছাড়া, এখানকার "সফ্‌লাং" আর একটি বিখ্যাত জিনিস।'

—'সফ্‌লাং! সে আবার কি?'

—'কেশুরের মত একরকম মূল। খাসিয়ারা খেতে বড় ভালবাসে।'

সারাদিন আমরা শ্রীহট্টেই রইলুম। এখান থেকে আমাদের গন্তব্যস্থান খাসিয়া পাহাড়কে দেখতে পেলুম। মনে হল, এর বিশাল বুকের ভিতরে না জানি কত রহস্যই লুকানো আছে, সে রহস্যের মধ্যে ডুব দিলে আর থই পাব কিনা, তাই বা কে বলতে পারে? এ তো আর কলকাতার রাস্তার কোন নম্বর-জানা বাড়ীর খোঁজে যাচ্ছি না, এই অশেষ পাহাড়-বন-জঙ্গলের মধ্যে কোথায় আছে যকের ধন, কি করে আমরা তা টের পাব? এখন পর্যন্ত করালী বা তার কোন চরের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে না পেয়ে আমরা তবু অনেকটা আশ্বস্ত হলুম। বুঝলুম, জাল মড়ার মাথা পেয়ে করালী এতটা খুসি হয়েছে যে, আমাদের উপরে আর পাহারা দেওয়া দরকার মনে করছে না! বাঁচা গেছে। এখন করালীর এই ভ্রমটা কিছুদিন স্থায়ী হলেই মঙ্গল। কারণ তার মধ্যেই আমরা কেল্লা ফতে করে নিশ্চয় দেশে ফিরে যেতে পারব।'

মাঝ-রাত্রে স্টীমারে চড়ে, সুরমা নদী দিয়ে পরদিন সকালে ছাতকে গিয়ে পৌঁছলুম।

সুরমা হচ্ছে শ্রীহট্টের প্রধান নদী। ছাতকও এই নদীর তীরে অবস্থিত। কলকাতায় ছাতকের চূণের নাম আমরা আগেই শুনেছিলুম। তবে এ চূণের উৎপত্তি ছাতকে নয়, চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে খাসিয়া পাহাড়ে এই চূণ জন্মে, সেখান থেকে রেলে করে ও নৌকা বোঝাই হয়ে ছাতকে আসে এবং ছাতক থেকে আরো নানা জায়গায় রপ্তানি হয়। চেরাপুঞ্জিতে খালি চূণ নয়, আগে সেখানে লোহার

খনি থেকে অনেক লোহা পাওয়া যেত, সেই সব লোহায় প্রায় আড়াইশো বছর আগে বড় বড় কামান তৈরি হত। কিন্তু বিলাতী লোহার উপদ্রবে খাসিয়া পাহাড়ের লোহার কথা এখন আর কেউ ভুলেও ভাবে না। চূণ ও লোহা ছাড়া কয়লার জন্যেও খাসিয়া পাহাড় নামজাদা। কিন্তু পাঠাবার ভালো বন্দোবস্ত না থাকার দরুণ, এখানকার কয়লা দেশ-দেশান্তরে যায় না।

ছাতক জায়গাটি মন্দ নয়। এখানে থানা, ডাক্তারখানা, পোস্ট-আপিস, বাজার ও মাইনর ইস্কুল—কিছুরই অভাব নেই। একটি ডাক-বাংলোও আছে, আমরা সেইখানে গিয়েই আশ্রয় নিলুম। বিমলের মুখে শুনলুম, এখানে পিয়াইন নামে একটি নদী আছে, সেই নদী দিয়েই আমাদের নৌকায় চড়ে ভোলাগঞ্জ পর্যন্ত যেতে হবে—এ সময়ে নদীর জল কম বলে নৌকো তার বেশী আর চলবে না। কাজেই ভোলাগঞ্জ থেকে মাইল-দেড়েক হেঁটে আমরা থারিয়াঘাটে যাব, তারপর পাথর-বাঁধানো রাস্তা ধরে খাসিয়া পাহাড়ে উঠব। আজ ডাক-বাংলোয় বিশ্রাম করে কাল থেকে আমাদের যাত্রা আরম্ভ।

ছাতক থেকে খাসিয়া পাহাড়ের দৃশ্য কি চমৎকার! নীলরঙের প্রকাণ্ড মেঘের মত, দৃষ্টি-সীমা জুড়ে আকাশের খানিকটা ঢেকে খাসিয়া পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, যতদূর নজর চলে—পাহাড়ের যেন আর শেষ নেই! পাহাড়ের কথা আমি কেতাবে পড়েছিলুম, কিন্তু চোখে কখনো দেখিনি, পাহাড় যে এত সুন্দর তা আমি জানতুম না; আমার মনে হতে লাগল, খাসিয়া পাহাড় যেন আমাকে ইসারা করে কাছে ডাকছে—ইচ্ছে হল তখনি এক ছুটে তার কোলে গিয়ে পড়ি।

সন্ধ্যার সময় খানিক গল্পগুজব করে আমরা শুয়ে পড়লুম। বেশ একটু শীতের আমেজ দিয়েছিল, লেপের ভিতরে ঢুকে কি আরামই পেলুম!

বিমলও তার লেপের ভিতরে ঢুকে বললে, 'ঘুমিয়ে নাও ভাই,

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে নাও। কাল এমন সময়ে আমরা খাসিয়া পাহাড়ে, এত আরামের ঘুম আর হয়তো হবে না!'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমরা তো ঘুমবো, পাহারা দেবে কে?'

বিমল বললে, 'সে ব্যবস্থা আমি করেছি। দরজার বাইরে বারান্দায় রামহরি আর বাঘা শুয়ে আছে। তার ওপরে দরজা-জানলাগুলোও ভেতর থেকে আমি বন্ধ করে দিয়েছি।'

আমার উদ্বেগ দূর হল। যদিও শত্রুর দেখা নেই, তবু সাবধানে থাকাই ভালো!

বারো ।। বিনি-মেঘে বাজ

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম তা জানি না, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল!...উঠতে গিয়ে উঠতে পারলুম না, আমার বুকের উপরে কে যেন চেপে বসে আছে। ভয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'বিমল, বিমল!'

অন্ধকারের ভিতরে কে আমার গলা চেপে-ধরে হুমকি দিয়ে বললে, 'খবর্দার, চ্যাঁচালেই টিপে মেরে ফেলব!'

আমি একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম, অনেক কষ্টে বললুম, 'গলা ছাড়ো, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!'

আমার গলা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সে বললে, 'আচ্ছা, ফের চ্যাঁচালেই কিন্তু মরবে!'

সেই ঘুট-ঘুটে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, আমার বুকের উপরে কে এ, ভূত না মানুষ?...ঘরের অন্য কোণেও একটা ঝটাপটি শব্দ শুনলুম।...তারপরেই একটা গ্যাঁঙানি আওয়াজ—কে যেন কি দিয়ে কাকে মারলে—তারপর আবার সব চুপচাপ।

অন্ধকারেই হেঁড়ে-গলায় কে বললে, 'শম্ভু, ব্যাপার কি?'

আর একজন বললে, 'বাবু, এ ছোড়ার গায়ে দস্যির জোর, আর

একটু হলেই আমাকে বুক থেকে ফেলে দিয়েছিল। আমি লাঠি দিয়ে একে ঠাণ্ডা করেছি।'

—'একেবারে শেষ হয়ে গেল নাকি?'

—'না, অজ্ঞান হয়ে গেছে বোধ হয়।'

—'আচ্ছা, তাহলে আমি আলো জ্বালি।'—বলেই সে ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বেলে বাতি ধরালে। দেখলুম, এ সেই লোকটা—ইষ্টিমারে আর ইষ্টিশানে যে গোয়েন্দার মত পিছু নিয়ে আমার পানে তাকিয়েছিল।

আমাকে তার পানে চেয়ে থাকতে দেখে সে হেসে বললে, 'কিহে স্যাঙাত, ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছ যে! আমাকে চিনতে পেরেচ নাকি?'

আমি কোন জবাব দিলুম না। আমার বুকের উপরে তখনো একটা লোক চেপে বসেছিল। ঘরের আর এককোণে বিমলের দেহ স্থির হয়ে পড়ে আছে, দেহে প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। দরজা-জানলার দিকে তাকিয়ে দেখলুম—সব বন্ধ। তবে এরা ঘরের ভিতরে এল কেমন করে?

বাতি-হাতে লোকটা আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'ছোকরা, ভারি চালাক হয়েছ—না? যকের ধন আনতে যাবে? এখন কি হয় বল দেখি?'

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'কে তোমরা?'

—'অত পরিচয়ে তোমার দরকার কিহে বাপু?'

—'তোমরা কি চাও?'

—'পকেট-বই চাই—পকেট-বই! তোমার ঠাকুরদাদার পকেট-বইখানা আমাদের দরকার। মড়ার মাথা আমরা পেয়েছি, এখন পকেট-বইখানা কোথায় রেখেচ বল।'

এত বিপদেও মনে মনে আমি না হেসে থাকতে পারলুম না। এরা ভেবেছে সেই জাল মড়ার মাথা নিয়ে যকের ধন আনতে যাবে। পকেট-বইয়ের কথাও এরা জানে। নিশ্চয় এরা করালীর লোক।

লোকটা হঠাৎ আমাকে ধমক দিয়ে বললে, 'এই ছোকরা! চুপ করে আছ যে? শীগগির বল পকেট-বই কোথায়—নইলে, আমার হাতে কি, দেখছ?' সে কোমর থেকে ফস করে একখানা ছোরা বার করলে, বাতির আলোয় ছোরাখানা বিদ্যুতের মত জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'ঐ ব্যাগের ভেতরে পকেট-বই আছে।'

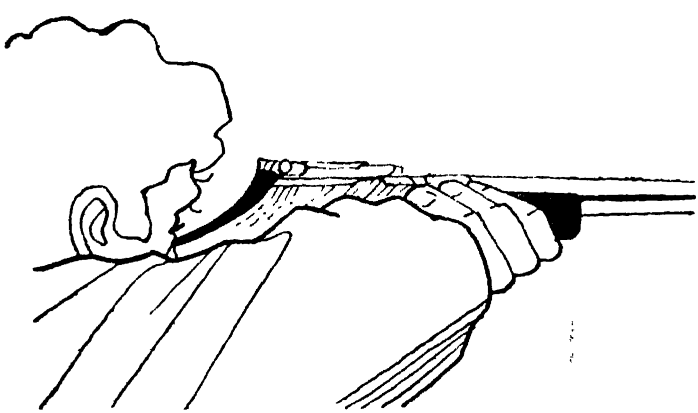
লোকটা বললে, 'হু, পথে এস বাবা, পথে এস। শম্ভু ব্যাগটা খুলে ছাখ তো।'

শম্ভু বিমলের দেহের পাশে বসেছিল, লোকটার কথায় তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে ঘরের অন্য কোণে গিয়ে আমাদের বড় ব্যাগটা নেড়ে-চেড়ে বললে, 'ব্যাগের চাবি বন্ধ।'

বাতি-হাতে লোকটা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাগের চাবি কোথায়?'

আমি কিছু বলবার আগেই বিমল হঠাৎ একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'এই যে, চাবি আমার কাছে।'—বলেই সে হাত তুললে—তার হাতে বন্দুক।

লোকগুলো যেন হতভম্ব হয়ে গেল। আমিও অবাক!



'যে এক-পা নড়বে, তাকেই আমি গুলি করে কুকুরের মত মেরে ফেলব।'

বিমল বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে বললে, 'যে এক-পা নড়বে, তাকেই আমি গুলি করে কুকুরের মত মেরে ফেলব।'

যার হাতে বাতি ছিল, সে হঠাৎ বাতিটা মাটির উপর ফেলে দিলে—সমস্ত ঘর আবার অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঝলক তুলে দুম করে বিমলের বন্দুকের আওয়াজ হল, একজন লোক 'বাবা রে, গেছি রে' বলে চীৎকার করে উঠল, আমার বুকের উপরে যে চেপে বসেছিল, সেও আমাকে ছেড়ে দিলে,—তারপরেই ঘরের দরজা খোলার শব্দ, বাঘার ঘেউ ঘেউ, রামহরির গলা। কি যে হল কিছুই বুঝতে পারলুম না, বিছানার ওপর উঠে আচ্ছন্নের মতন আমি বসে পড়লুম।...

বিমল বললে, 'কুমার, আলো জ্বালো—শীগগির।'

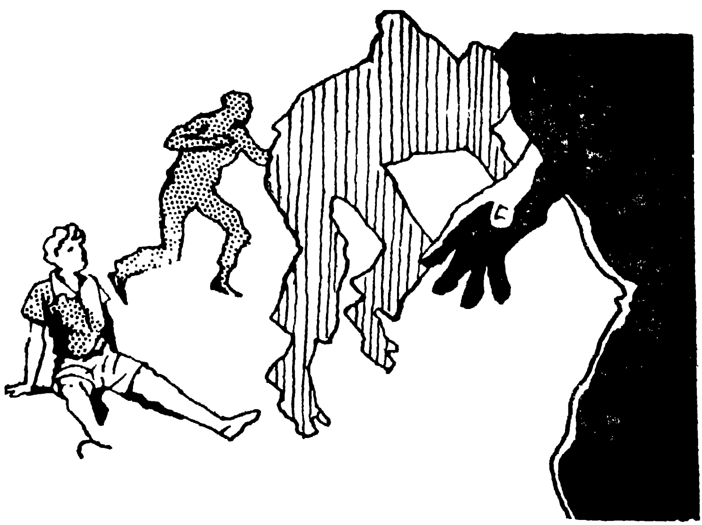
আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'কিন্তু—কিন্তু—'

—'ভয় নেই, আলো জ্বালো, তারা পালিয়েছে।'

কিন্তু আমাকে আর আলো জ্বালতে হল না—রামহরি একটা লণ্ঠন হাতে করে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল।

ঘরের ভিতরে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।

বিমল মেঝের দিকে হেঁট হয়ে পড়ে বললে, 'এই যে রক্তের দাগ।



উঃ, কি ভয়ানক তার চোখ, দপ দপ করে জ্বলছে!

গুলি খেয়েও লোকটা পালাল। বোধ হয় ঠিক জায়গায় লাগেনি—হাত-টাত জখম হয়েছে।'

রামহরি উদ্বিগ্ন মুখে বললে, 'ব্যাপার কি বাবু?'

বিমল সে কথায় কান না দিয়ে বললে, 'কিন্তু জানলা-দরজা সব বন্ধ—অথচ ঘরের ভেতরে শত্রু, ভারি আশ্চর্য তো!' তারপরে একটু থেমে, আবার বললে, 'ও, বুঝেছি। নিশ্চয় আমরা যখন ও-ঘরে খেতে গিয়েছিলুম, রাস্কেলরা তখনি ফাঁক পেয়ে এ-ঘরে ঢুকে খাটের তলায় ঘুপটি মেরে লুকিয়েছিল।'

কথাটা আমারও মনে লাগল। আমি বললুম, 'ঠিক বলেছ! কিন্তু বিমল, তুমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে, হঠাৎ কি করে দাঁড়িয়ে উঠলে?'

বিমল বললে, 'আমি মোটেই অজ্ঞান হইনি, অজ্ঞান হওয়ার ভান করে চুপচাপ পড়েছিলুম! ভাগ্যি বন্দুকটা আমার বিছানাতেই ছিল!'

এমন সময়ে বাঘা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘরের ভিতরে এসে, আদর করে আমার পা চেটে দিতে লাগল। আমি দেখলুম বাঘার মুখে যেন কিসের দাগ! এ যে রক্তের মত! তবে কি বাঘা জখম হয়েছে? তাড়াতাড়ি তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখে বললুম, 'না, অন্য কারুর রক্ত! বাঘা নিশ্চয় সেই লোকগুলোর কারুকে না কারুকে তার দাঁতের জোর বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে।'

তারিফ করে তার মাথা চাপড়ে আমি বললুম, 'সাবাস বাঘা, সাবাস!'—বাঘা আদরে যেন গলে গিয়ে আমার পায়ের তলায় পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

বিমল বললে, 'এবার থেকে বাঘাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুমবো। বাঘা আমাদের কাছে ঘরের ভেতরে থাকলে এ বিপদ হয়তো ঘটত না।'

আমি বললুম, 'তা তো ঘটত না, কিন্তু এখন ভবিষ্যতের উপায় কি? করালী নিশ্চয়ই আমাদের ছাড়ান দেবে না, এবার তার চরেরা হয়তো দলে আরও ভারি হয়ে আসবে।'

বিমল সহজভাবেই বললে, 'তা আসবে বৈকি।'

আমি বললুম, 'আর এটাও মনে রেখো, কাল থেকে আমরা লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ের ভেতরে গিয়ে পড়ব। সেখানে আমাদের রক্ষা করবে কে?'

বিমল বন্দুকটা ঠক করে মেঝের উপরে ঠুকে, একখানা হাত তুলে তেজের সঙ্গে বললে, 'আমাদের এই হাতই আমাদের রক্ষা করবে। যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তাকে বাঁচাবার সাধ্য কারুর নেই।'

—'কিন্তু—'

—'আজ থেকে "কিন্তু"র কথা ভুলে যাও কুমার, ও হচ্ছে ভীরু, কাপুরুষের কথা।' বলেই বিমল এগিয়ে গিয়ে ঘরের একটা জানলা খুলে দিয়ে আবার বললে, 'চেয়ে দেখ কুমার!'

জানলার বাইরে আমার চোখ গেল। নিঝুম রাতের চাঁদের আলো মেখে স্বর্গের মত খাসিয়া পাহাড়ের স্থির ছবি আঁকা রয়েছে! চমৎকার, চমৎকার! শিখরের পর শিখরের উপর দিয়ে জ্যোৎস্নার ঝরনা রূপোলী লহর তুলে বয়ে যাচ্ছে, কোথাও আলো, কোথাও ছায়া—ঠিক যেন পাশাপাশি হাসি আর অশ্রু! বিভোর হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম—এমন দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি!

বিমল বললে, 'কি দেখছ?'

আমি বললুম, 'স্বপ্ন।'

বিমল বললে 'না, স্বপ্ন নয়—এ সত্য। তুমি কি বলতে চাও কুমার, এই স্বর্গের দরজায় এসে আবার আমরা খালিহাতে ফিরে যাব?'

আমি মাথা নেড়ে বললুম. 'না বিমল, না,—ফিরব না, আমরা ফিরব না। আমার সমস্ত প্রাণ-মন ঐখানে গিয়ে লুটিয়ে পড়তে চাইছে! যকের ধন পাই আর না পাই—আমি শুধু একবার ঐখানে যেতে চাই।'

বিমল জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বললে, 'কাল আমরা ওখানে

যাব। আজ আর কোনো কথা নয়, এস আবার নাক ডাকানো যাক।'—বলেই বন্দুকটা পাশে নিয়ে বিছানার উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। খানিক পরেই তার নাকের গর্জন সুরু হল। তার নিশ্চিন্ত ঘুম দেখে কে বলবে যে, একটু আগেই সে সাক্ষাৎ যমের মুখে গিয়ে পড়েছিল। বিমলের আশ্চর্য সাহস দেখে আমিও সমস্ত বিপদের কথা মন থেকে তাড়িয়ে দিলুম। তারপর খাসিয়া পাহাড় আর যকের ধনের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম, তা আমি জানি না।

তেরো ॥ খাসিয়া পাহাড়ে

চেরাপুঞ্জি পার হয়ে এগিয়ে এসেছি অনেকদূর। চেরাপুঞ্জি থেকে শিলং শহর প্রায় ষোলো ক্রোশ তফাতে। এই পথটা মোটর-গাড়ী করে যাওয়া যায়। আমরা কিন্তু ওমুখো আর হলুম না। কারণ জানা-পথ ধরলে শত্রুপক্ষের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা বেশী।

পাহাড়ের পর পাহাড়—ছোট, বড়, মাঝারি। যেদিকে চাই কেবলি পাহাড়—কোন কোন পাহাড়ের শৃঙ্গের আকার বড় অদ্ভুত, দেখতে যেন হাতীর শুঁড়ের মত, উপরে উঠে তারা যেন নীলাকাশকে জড়িয়ে ধরে পায়ের তলায় আছড়ে ফেলতে চাইছে। পাহাড়গুলিকে দূর থেকে ভারি কঠোর দেখাচ্ছিল, কিন্তু কাছে এসে দেখছি সবুজ ঘাসের নরম মখমলে এদের গা কে যেন মুড়ে দিয়েছে। কত লতাকুঞ্জে কত যে ফুল ফুটে রয়েছে—হাজার হাজার চুণী-পান্না হীরা-জহরতের মত তাদের 'আহা-মরি' রঙের বাহার—এ যে ফুলপরীদের নির্জন খেলাঘর। কোথাও ছোট ছোট ঝরনা ঝির ঝির ঝরে পড়ছে, তারপর পাথরের পর পাথরের উপরে লাফিয়ে পড়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে গাইতে চোখের আড়ালে তলিয়ে গিয়েছে। কোথাও পথের দু'পাশে গভীর খাদ, তার মধ্যে শত শত ডালচিনির গাছ আর

লতাপাতার জঙ্গল শীতের ঠাণ্ডা বাতাসে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে,—সেসব খাদের পাশ দিয়ে চলতে গেলে প্রতিপদেই ভয় হয়—এই বুঝি টলে পা ফসকে অতল পাতালের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাই। সবচেয়ে বিশেষ করে চোখে পড়ে সরল গাছের সার। এত সরল গাছ আমি আর কখনো দেখিনি—সমস্ত পাহাড়ই যেন তারা একেবারে দখল করে নিতে চায়। সেসব গাছে বেশী ডালপালা-পাতার জাল নেই; মাটি থেকে তারা ঠিক সোজা হয়ে উপরে উঠে যেন সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

নির্জন পাহাড়, মাঝে মাঝে কখনো কেবল দু একজন কাঠুরের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কাঠুরেরা জাতে খাসিয়া, তাদের চেহারার সঙ্গে গুর্খাদের চেহারার অনেকটা মিল আছে—নাক থ্যাবড়া, গালের হাড় উঁচু, চোখ বাঁকা বাঁকা, মাথা ছোট ছোট।

এখানে এসে এক বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি। এতদিনেও করালীর দলের আর কোন সাড়া-শব্দ পাইনি। আমরা যে পথ ছেড়ে এমন অপথ বা বিপথ ধরব, নিশ্চয় তারা সেটা কল্পনা করতে পারেনি। হয়তো তারা এখন আমাদের ধরবার জন্যে শিলং শহরে গিয়ে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে মরছে। কেমন জব্দ!

বিমল আজ দুটো বুনো মোরগ শিকার করেছে। সেই মোরগের মাংস কত মিষ্টি লাগবে তাই ভাবতে ভাবতে খুসি হয়ে পথ চলছি।

পশ্চিম আকাশে সিঁদুর ছড়িয়ে অস্ত গেল সূর্য। আমি বললুম, 'বিমল, সারাদিন পথ চলে পা টাটিয়ে উঠেছে, ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। আজকের মত বিশ্রাম করা যাক্।'

বিমল বললে, 'কেন কুমার, চারিদিকের দৃশ্য কি তোমার ভালো লাগছে না?'

—'ভালো লাগছে না আবার! এত ভালো লাগছে যে, দেখে দেখে সাধ আর মিটছে না। কিন্তু এই ক্ষিদের মুখে রামপাখির গরম মাংস এরও চেয়ে ঢের ভালো লাগবে বলে মনে হচ্ছে।'

এই বলাবলি করতে করতে আমরা একটা ছোট ঝরনার কাছে

এসে পড়লুম। ঝরনার ঠিক পাশেই পাহাড়ের বুকে একটা গুহার মত বড় গর্ত।

বিমল বললে, 'বাঃ, বেশ আশ্রয় মিলেছে। এই গুহার ভিতরেই আজকের রাতটা দিব্যি আরামে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। রামহরি, মোটমাট এইখানেই রাখো।'

আমাদের প্রত্যেকের পিঠেই কম-বেশী মোট ছিল, সবাই সেগুলো একে একে গুহার ভিতরে নামিয়ে রাখলুম। গুহাটি বেশ বড়-সড়, আমাদের সঙ্গে আরো চার-পাঁচজন লোক এলেও তার মধ্যে থাকবার অসুবিধা হত না।

গুহার ভিতরটা ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, এইবার রান্নার উদ্যোগ করি?'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ—দাঁড়াও, আমি তোমাদের একটা মজা দ্যাখাচ্ছি, এখানে আগুনের জন্যে কিছু ভাবতে হবে না।' এই বলে একটা কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি আর রামহরি ছুরি নিয়ে তখনি মোরগ দুটোকে রান্নার উপযোগী করে তুলতে বসে গেলুম। বাঘাও সামনের দুই পায়ে ভর দিয়ে বসে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে লোলুপ চোখে,-ঘাড় বেঁকিয়ে একমনে আমাদের কাজ দেখতে লাগল, তার হাব-ভাবে বেশ বোঝা গেল; রামপাখির মাংসের প্রতি তারও লোভ আমাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

খানিক পরেই বিমল একরাশ কাঠ ঘাড়ে করে ফিরে এল। আমি বললুম, 'এলে তো খালি কতকগুলো কাঠ নিয়ে। এর মধ্যে মজাটা আর কি আছে?'

—'এই দ্যাখনা' বলেই বিমল কিছু শুকনো পাতা জড়ো করে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন জ্বাললে, তারপর একখানা কাঠ নিয়ে তার উপরে ধরতেই দপ্ করে তা জ্বলে উঠল। বিমল কাঠখানা উঁচু করে মাথার উপরে ধরলে, আর সেটা ঠিক মশালের মতই দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বাঃ, বেশ মজার ব্যাপার তো অত সহজে জ্বলে, ওটা কি কাঠ?'

বিমল বললে, 'সরল কাঠ। এ কাঠে একরকম তেলের মত রস আছে, তাই এমন সুন্দর জ্বলে। এর আর এক নাম—ধূপকাষ্ঠ।'

রামহরি সেদিন সরল কাঠেই উনুন ধরিয়ে রামপাখির মাংস চড়িয়ে দিলে। আমরা দুজনে গুহার ধারে বসে গল্প করতে লাগলুম।

তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে, একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে চাঁদা-মামার আধখানা হাসিমুখ উঁকি মারছে—সেই আবছায়া-মাখা জ্যোৎস্নার আলোতে সামনের পাহাড়, বন আর ঝরনাকে কেমন যেন অদ্ভুত দেখাতে লাগল।

বিমল হঠাৎ বললে, 'কুমার, তুমি ভূত বিশ্বাস কর?'

আমি বললুম, 'কেন বল দেখি?'

বিমল বললে, 'আমরা যাদের দেশে আছি, এই খাসিয়ারা অনেকেই ভূতকে দেবতার মতো পুজো করে। ভূতকে খুসি রাখবার জন্যে খাসিয়ারা মোরগ আর মুর্গীর ডিম বলি দেয়। যে মুল্লুকে ভূতের এত ভক্ত থাকে, সেখানে ভূতের সংখ্যাও নিশ্চয় খুব বেশী,—কি বল?'

আমি বললুম, 'না, আমি ভূত মানি না।'

বিমল বললে, 'কেন?'

—'কারণ আমি কখনো ভূত দেখিনি। তুমি দেখেছ?'

—'না, তবে আমি একটি ভূতের গল্প জানি।'

— সত্যি গল্প?'

—'সত্যি-মিথ্যে জানি না, তবে যার মুখে গল্পটি শুনেছি, সে বলে এর আগাগোড়া সত্যি।'

—'কে সে?'

—'আমাদের বাড়ীর পাশে একজন লোক বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকত, এখন সে উঠে গেছে। তার নাম ঈশান।'

—'বেশ তো, এখনো রান্না শেষ হতে দেরি আছে, ততক্ষণে

তুমি গল্পটা শেষ করে ফেল—বিশ্বাস না হোক, সময়টা কেটে যাবে।'

একটা বেজায় ঠাণ্ডা বাতাসের দম্‌কা এল। তু'জনেই ভালো করে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসলুম। বিমল এমনভাবে গল্প সুরু করলে, ঈশানই যেন তা নিজের মুখে বলছে।

চোদ্দ ॥ মানুষ, না পিশাচ?

[ঈশানের গল্প]

আমাদের বাড়ী যে গ্রামে, তার ক্রোশ-তুয়েক তফাতেই গঙ্গা। কাজেই গাঁয়ে কোন লোক মারা গেলে, গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়েই মড়া পোড়ানো হত।

সেবারে ভোলার ঠাকুরমা যখন মারা পড়ল—তখন আমরা পাড়ার জন-পাঁচেক লোক মিলে মড়া নিয়ে শ্মশানে চললুম। শ্মশানে পৌঁছোতে বেজে গেল রাত বারোটা।

পাড়াগাঁয়ের শ্মশান যে কেমন ঠাঁই, শহরের বাসিন্দারা তা বুঝতে পারবে না। এখানে গ্যাসের আলোও নেই, লোকজন গোলমালও নেই। অনেক গাঁয়েই শ্মশানে কোন ঘরও থাকে না। খোলা, নির্জন জায়গা, চারিদিকে বন-জঙ্গল, প্রতিপদেই হয়তো মড়ার মাথা আর হাড় মাড়িয়ে চলতে হয়। রাতে সেখানে গেলে খুব সাহসীরও বুক রীতিমত দমে যায়।

আমাদের গাঁয়ের শ্মশান-ঘাটে একখানা হেলে পড়া দরজা-ভাঙা কোঠাঘর ছিল। তার মধ্যেই গিয়ে আমরা মড়া নামিয়ে রাখলুম।

পাড়াগাঁয়ের শ্মশানে চিতার জ্বালানি কাঠ তো কিনতে পাওয়া

আসলে 'ঈশানের গল্প'টি আমি শুনেছিলুম স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে। ইতি—লেখক।

যায় না, কাজেই আশপাশের বন-জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতে হয়।

ভোলা বললে, 'আমি মড়া আগলে থাকি, তোমরা সকলে কাঠ আনো গে যাও।'

আমি বললুম, 'একলা থাকতে পারবে তো?'

ভোলা যেমন ডানপিটে, তার গায়ে জোরও ছিল তেমনি বেশী। সে অবহেলার হাসি হেসে বললে, 'ভয় আবার কি? যাও, যাও—দেরি কোরো না।'

আমরা পাঁচজনে জঙ্গলে ঢুকে কাঠ কাটতে লাগলুম। একটা চিতা জ্বালাবার মত কাঠ সে তো বড় অল্প কথা নয়! কাঠ কাটতেই কেটে গেল প্রায় আড়াই ঘণ্টা; বুঝলুম, আজ ঘুমের দফায় ইতি,—মড়া পোড়াতেই ডেকে উঠবে ভোরের পাখি।

সকলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শ্মশানের দিকে যাচ্ছি, এমন সময়ে আমাদের একজন বলে উঠল, 'ওহে ছাখো, ছাখো, শ্মশানের ঘরের মধ্যে কি রকম আগুন জ্বলছে!'

তাই তো, ঘরের ভিতরে সত্যিই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে যে! অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললুম। ঘরের কাছ বরাবর আসতেই লণ্ঠনের আলোতে দেখলুম, মাটির উপরে কে একজন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। লোকটাকে উল্টে ধরে লণ্ঠনটা তার মুখের কাছে নামিয়ে দেখলুম, সে আর কেউ নয়—আমাদেরই ভোলা! তার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে, সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ভোলা এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর ওখানে ঘরের ভিতরে আগুন জ্বলছে—এ কেমন ব্যাপার! সকলে হতভম্ব হয়ে ঘরের দিকটায় ছুটে গেলুম। কাছে গিয়ে দেখি, ঘরের দরজার কাছটায় কে তাল তাল মাটি এনে ঢিপির মত উঁচু করে তুলেছে, আরো খানিকটা উঁচু হলেই দরজার পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত! এসব কি কাণ্ড কিছুই বুঝতে না পেরে আমরা ঘরের ভিতরে উঁকি

মেরে দেখলুম, এককোণে একরাশ কাঠ দাউ-দাউ করে জ্বলছে, একটা কাঁচা মাংস-পোড়ার বিশ্রী গন্ধ উঠছে, আর কোথাও মড়ার কোন চিহ্নই নেই!

ভয়, বিস্ময় আর দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আমরা আবার ভোলার কাছে ফিরে এলুম। তার মুখে ও মাথায় অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেবার পর আস্তে আস্তে সে চোখ চাইলে। তারপর উঠে বসে যা বললে, তা হচ্ছে এই ঃ—

'তোমরা তো কাঠ কাটতে চলে গেলে, আমি মড়া আগলে বসে রইলুম। খানিকক্ষণ এমনি চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে আমার কেমন তন্দ্রা এল। চোখ বুজে ঢুলচি, হঠাৎ থপ করে কি একটা শব্দ হল। চম্‌কে জেগে উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। আমারই মনের ভ্রম ভেবে খাটের পায়াতে মাথা রেখে আবার আমি ঘুমোবার চেষ্টা করলুম।···খানিকক্ষণ পরে আবার সেই থপ করে শব্দ। এবার আমার সন্দেহ হল হয়তো মড়ার লোভে বাইরে শেয়াল-টেয়াল কিছু এসেছে। এই ভেবে আর চোখ খুললুম না—এমনিভাবে আরো খানিকটা সময় কেটে গেল। ওদিকে সেই ব্যাপারটা সমানই চলেছে—মাঝে মাঝে সব স্তব্ধ, আর মাঝে মাঝে থপ করে শব্দ। শেষটা জ্বালাতন হয়ে আমি আবার চোখ চাইতে বাধ্য হলুম। কিন্তু একি! ঘরের দরজার সামনেটা যে মাটিতে প্রায় ভরতি হয়ে উঠছে,—আর একটু পরেই আমার বাইরে যাবার পথও যে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে! কে এ কাজ করলে, এ তো যে-সে কথা নয়! আমার ঘুমের ঘোর চট করে কেটে গেল, সেই কাঁচা মাটির পাঁচিল টপ্‌কে তখনই আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

চাঁদের আলোয় চারিদিক ধবধব করছে। ঘর আর গঙ্গার মাঝখানে চড়া। এদিক-ওদিক চাইতেই দেখলুম, খানিক তফাতে একটা ঝাঁকড়া-চুলো লোক হেঁট হয়ে একমনে দুই হাতে ভিজে মাটি খুঁড়ছে। বুঝলুম, তারই এই কাজ। কিন্তু এতে তার লাভ কি? লোকটা পাগল নয় তো?

ভাবছি, এদিকে সে আবার একতাল মাটি নিয়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হল। মস্ত লম্বা চেহারা, মস্ত লম্বা চুল আর দাড়ি, একরকম উলঙ্গ বললেই হয়—পরনে খালি একটুকরো কপ্‌নি। সে মাথা নীচু করে আসছিল, তাই আমাকে দেখতে পেলে না। কিন্তু সে কাছে আসবামাত্র আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সে তখন মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে,—উঃ, কি ভয়ানক তার চোখ, ঠিক যেন দু'খানা বড় বড় কয়লা দপ দপ করে জ্বলছে! এমন জ্বলন্ত চোখ আমি জীবনে কখনো দেখিনি।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে তুমি ?'

উত্তরে মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে নেড়ে সে এমন এক ভুতুড়ে চীৎকার করে উঠল যে, আমার বুকের রক্ত যেন বরফ হয়ে গেল। মহা-আতঙ্কে প্রাণপণে আমি দৌড় দিলুম, কিন্তু বেশীদূর যেতে-না-যেতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম। তারপর আর কিছু আমার মনে নেই।'

ভোলার কথা শুনে বুঝলুম, সে লোকটা পিশাচ ছাড়া আর কিছু নয়। দুষ্ট প্রেতাত্মারা সুবিধা পেলেই মানুষের মৃতদেহের ভিতরে ঢুকে তাকে জ্যান্ত করে তোলে। মরা মানুষ এইভাবে জ্যান্ত হলেই তাকে পিশাচ বলে। এই রকম কোন পিশাচই ভোলার ঠাকুমার দেহকে আগুন জ্বেলে আধপোড়া করে খেয়ে গেছে! ভোলাকেও নিশ্চয় সে ফলার করবার ফিকিরে ছিল, কেবল আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়তেই এ যাত্রা ভোলা বেঁচে গেল কোনগতিকে।

সেবারে আমাদের আর মড়া পোড়াতে হল না।

পনেরো ॥ দুটো জ্বলন্ত চোখ

বিমলের গল্প শুনে আমার আঁৎটা কেমন ছাঁৎ-ছাঁৎ করতে লাগল, গুহার বাইরে আর চাইতেই ভরসা হল না—কে জানে, সেখানে

ঝোপঝাপের মধ্যে কোন বিদ্‌কুটে চেহারা ওৎ পেতে বসে আছে হয়তো !

আমার মুখের ভাব দেখে বিমল হেসে বললে, 'ও কি হে কুমার, তোমার ভয় করছে নাকি ?'

—'তা একটু একটু করছে বৈকি !'

—'এই না বললে, তুমি ভূত মানো না ?'

—'হুঁ, আগে মানতুম না, কিন্তু এখন আর মানি না বলে মনে হচ্ছে না।'

—'ভয় কি কুমার, আমার বিশ্বাস এ গল্পটার একবর্ণও সত্যি নয়, আগগোড়া গাঁজাখুরি ! ভূতের গল্পমাত্রই রূপকথা, পাছে লোকে বিশ্বাস না করে, তাই তাকে সত্যি বলে আসর জমানো হয়।'

কিন্তু তবু আমার মন মানল না, বিমলকে কিছুতেই আমার কাছছাড়া হতে দিলুম না। ভয়ের চোটে রামহরির রান্না রামপাখির মিষ্টি মাংস পর্যন্ত তেমন তারিয়ে খেতে পারলুম না।

গুহার বাইরের দিকে বিমল অনেকগুলো সরল কাঠ ছড়িয়ে আগুন জ্বেলে বললে, 'কোন জীবজন্তু আর আগুন পেরিয়ে এগিয়ে আসতে পারবে না। তোমরা দুজনে এখন ঘুমোও—আমি জেগে পাহারা দি। আমার পর কুমারের পালা, তারপর রামহরির।'

ছাতকের ডাক-বাংলোর সেই ব্যাপারের পর থেকে রোজ রাত্রেই আমরা এমনি পালা করে পাহারা দি।

আমি আর রামহরি গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম।...

মাঝরাত্রে বিমল আমাকে ঠেলে তুলে বললে, 'কুমার, এইবার তোমার পালা।'

শীতের রাত্রে লেপ ছাড়তে কি সাধ যায়—বিশেষ এই বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে ! কিন্তু তবু উঠতে হল,—কি করি, উপায় তো আর নেই !

গুহার সামনের আগুন নিভে আসছিল, আরো খানকতক কাঠ

তাতে ফেলে দিয়ে, কোলের উপরে বন্দুকটা নিয়ে দেয়াল ঠেসে বসলুম।

চাঁদ সেদিন মাঝরাত্রের আগেই অস্ত গিয়েছিল, বাইরে ঘুট-ঘুট করছে অন্ধকার। পাহাড়, বন, ঝোপঝাপ সমস্ত মুছে দিয়ে, জেগে আছে খালি অন্ধকারের এক সীমাহীন দৃশ্য, আর তারই ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে ঝরনার অশ্রান্ত ঝর্ঝর, শতশত গাছের একটানা মর্-মর্, লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝির একঘেয়ে ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ—।

হঠাৎ আর একরকম শব্দ শুনলুম। ঠিক যেন অনেকগুলো আঁতুড়ের শিশু কাঁদছে টেঁয়্যা—টেঁয়্যা—টেঁয়্যা।

আমার বুকটা ধড়ফড় করে উঠল, এই নিশুত রাতে, এমন বন-বাদাড়ে এতগুলো মানুষের শিশু এল কোত্থেকে? একে আজ বিশ্রী একটা ভূতের গল্প শুনেছি, তার উপরে গহন বনের এক থম্থমে অন্ধকার রাত্রি, তার উপরে আবার এই বেয়াড়া চীৎকার! মনের ভিতরে জেগে উঠল যত-সব অসম্ভব কথা।

আবার সেই অদ্ভুত কাঁদুনি!

আমার মনে হল এ অঞ্চলের যত ভূত-পেত্নী বাসা ছেড়ে চরতে বেরিয়ে গেছে, আর বাপ-মায়ের দেখা না পেয়ে ভুতুড়ে খোকারা এক সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে কান্নার কন্সার্ট।

ভয়ে সিঁটিয়ে ভাবছি—আর একটু কোণ ঘেঁসে বসা যাক্, এমন সময়ে—ও কি ও!

গুহার বাইরে—অন্ধকারের ভিতরে দু'দুটো জ্বলন্ত কয়লার মতন চোখ একদৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে আছে!

বুক আমার উড়ে গেল—এ চোখদুটো যে ঠিক সেই শ্মশানের পিশাচের মত!···এখানে পিশাচ আছে নাকি?

ধীরে ধীরে চোখদুটো আরো কাছে এগিয়ে এসে আবার স্থির হয়ে রইল। আমার মনে হল, আঁধার সমুদ্রে সাঁতার কাটছে যেন দুটো আগুন-ভাঁটা।

আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলুম না—ঠক্ ঠক্ করে

কাঁপতে কাঁপতে বন্দুকটা কোন রকমে তুলে ধরে দিলুম তার ঘোড়া টিপে—গুড়ুম করে ভীষণ এক আওয়াজ হল,—সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত চোখদুটো গেল নিবে।

বন্দুকের শব্দে বিমল, রামহরি আর বাঘা একসঙ্গেই জেগে উঠল, বিমল ব্যস্ত হয়ে বললে—'কুমার, কুমার, ব্যাপার কি ?'

আমি বললুম, 'পিশাচ, পিশাচ !'

—'পিশাচ কি হে ?'

—'হ্যাঁ, ভয়ানক একটা পিশাচ এসে দুটো জ্বলন্ত চোখ মেলে আমার পানে তাকিয়েছিল, আমি তাই বন্দুক ছুড়েছি !'

বিমল তখনি আমার হাত থেকে বন্দুকটা টেনে নিলে। তারপর একহাতে লণ্ঠন, আর একহাতে বন্দুক নিয়ে আগুন টপকে গুহার বাইরে গিয়ে চারিদিকে তন্ন তন্ন করে দেখে এসে বললে, 'কোথাও কিছু নেই। ভূতের গল্প শুনে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে কুমার, তুমি ভুল দেখেচ।'

এমন সময় আবার সেই ভুতুড়ে খোকারা কোত্থেকে কেঁদে উঠল।

আমি মুখ শুকিয়ে বললুম, 'ঐ শোনো।'

—'কি ?'

—'ভূতেদের খোকারা কাঁদছে। রামহরি, তুমিও শুনেছ তো ?'

বিমল আর রামহরি দুজনেই একসঙ্গে হো হো করে হাসি সুরু করে দিলে।

আমি রেগে বললুম, 'তোমরা হাসছ যে ? এ কি হাসির কথা ?'

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'শহরের বাইরে তো কখনো পা দাওনি, শহর ছাড়া দুনিয়ার কিছুই জানো না—এখনো একটি আস্ত বুড়ো খোকা হয়ে আছ। যা শুনছ, তা ভূতেদের খোকার কান্না নয়, বকের ছানার ডাক।'

—'বকের ছানার ডাক ?'

—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কাছেই কোন গাছে বকের বাসা আছে। বকের ছানার ডাক অনেকটা কচিছেলের কান্নার মত।'

বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে গেলুম। কিন্তু সেই জ্বলন্ত চোখদুটো তো মিথ্যে নয়! বিমল যতই উড়িয়ে দিক, আমি স্বচক্ষে দেখেছি—আর আমি যে ভুল দেখিনি, তা দিব্যি-গেলে বলতে পারি। কিন্তু আজ যে-রকম বোকা বনে গেছি, তাতে এদের কাছে সে ব্যাপার নিয়ে আপাততঃ কোন উচ্চবাচ্য না করাই ভালো।

ষোল ।। 'পিশাচ' রহস্য

পরের দিন সকালে উঠে দেখি, আর এক মুস্কিল। রামহরির কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। কাজেই সেদিন আমাদের সেখানেই থেকে যেতে হল—জ্বর-গায়ে রামহরি তো আর পথ চলতে পারে না। ক্রমাগত পথ চলে চলে আমাদেরও শরীর বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল, কাজেই এই হঠাৎ-পাওয়া ছুটিটা নেহাৎ মন্দ লাগল না।

সেদিনও বিমল দুটো পাখি মেরে আনলে, নিজের হাতেই আমরা রান্নার কাজটা সেরে নিলুম।

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালকের রাতের সেই ভুতুড়ে ব্যাপারটার কথা আবার আমার মনে পড়ে গেল। বিমলের কাছে সে কথা তুলতে-না-তুলতেই সে হেসেই সব উড়িয়ে দিলে। আমি কিন্তু অত সহজেই মনটাকে হাল্কা করে ফেলতে পারলুম না—আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি। ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, বাপ রে!

সেদিনও সরল কাঠের আগুন জ্বেলে গুহার মুখটা আমরা বন্ধ করে দিলুম। আজ রামহরির অসুখ,—কাজেই আমাদের দু'জনকেই পালা করে পাহারা দিতে হবে। আজও প্রথম রাতে পাহারার ভার নিলে বিমল নিজে।

যখন আমার পালা এল, তখন গভীর রাত্রি। আজও চাঁদ ডুবে গেছে, আর অন্ধকারে বুকের ভিতর থেকে নানা অস্ফুট ধ্বনির সঙ্গে

শোনা যাচ্ছে সেই গাছের পাতার মর্মরানি, ঝরনার ঝর্ঝরানি আর বকের ছানাদের কাতরানি।

গুহার মুখের আগুনটা কমে আসছে দেখে আমি কতকগুলো চ্যালাকাঠ তার ভিতরে ফেলে দিলুম। তারপরেই শুনলুম কেমন একটা শব্দ—গুহার বাইরে কে যেন খড়মড় করে শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।



বিমল এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে বাগিয়ে ধরলে।

কিন্তু প্রাণপণে তাকিয়েও সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই দেখতে পেলুম না, শব্দটাও একটু পরে থেমে গেল।

কিন্তু আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

বাঘা মনের সুখে কুণ্ডলী পাকিয়ে, পেটের ভিতরে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছিল, আমি তাকে জাগিয়ে দিলুম। বাঘা উঠে একটা হাই

তুলে আর মাটির উপর একটা ডন দিয়ে নিয়ে, আমার পাশে এসে তুই থাবা পেতে বসল। একহাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হলুম।

আবার সেই শব্দ! বাঘার দিকে চেয়ে দেখলুম, সেও তুই কান খাড়া করে ঘাড় বাঁকিয়ে শব্দটা শুনছে। তারপরেই সে একলাফে গুহার মুখে গিয়ে পড়ল, কিন্তু আগুনের জন্যে বাইরে যেতে না পেরে, সেইখানেই দাঁড়িয়ে গর্‌গর্‌ করতে লাগল।

তার গজরানিতে বিমলের ঘুম ভেঙ্গে গেল, উঠে বসে সে বললে, 'আজ আবার কি ব্যাপার! বাঘা অমন করছে কেন?'

আমি বললুম, 'বাইরে কিসের একটা শব্দ হচ্ছে, কে যেন চলে বেড়াচ্ছে।'

'সে কি কথা!'—বলেই বিমল এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে বাগিয়ে ধরলে।

শব্দটা তখন থেমে গেছে—কিন্তু ও কি ও! আবার যে সেই তুটো জ্বলন্ত চোখ অন্ধকারের ভিতর থেকে কটমট করে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে!

বাঘা ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠল, আমিও বলে উঠলুম—'দেখ বিমল, দেখ!'

কিন্তু আমি বলবার আগেই বিমল দেখেছিল, সে মুখে কিছু বললে না, চোখতুটোর দিকে বন্দুকটা ফিরিয়ে একমনে টিপ করতে লাগল।

চোখতুটো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল—হঠাৎ বিমল বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম্‌ করে শব্দ, আর একটা ভীষণ গর্জন, তারপরেই সব চুপ, চোখতুটোও আর নেই!

বিমল আমার দিকে ফিরে বললে, 'এই চোখতুটোই কাল তুমি দেখেছিলে?'

—'হ্যাঁ। এইবার তোমার বিশ্বাস হল তো?'

—'তা হয়েছে বটে, কিন্তু এ পিশাচের নয়, বাঘের চোখ।'

—'বাঘ?'

—'হ্যাঁ। বোধ হয় এতক্ষণে সে লীলাখেলা সাঙ্গ করেছে, তবু বলা তো যায় না, আজ রাত্রে আর বাইরে গিয়ে কাজ নেই—কি জানি একেবারে যদি মরে না থাকে—আহত বাঘ ভয়ানক জীব।'

পরদিন সকালে উঠে দেখলুম—বিমল যা বলেছে তাই! গুহার মুখ থেকে খানিক তফাতে, পাহাড়ের উপরে একটা মরা বাঘ পড়ে রয়েছে—আমরা মেপে দেখলুম—পাকা ছয় হাত লম্বা! বিমলের টিপ আশ্চর্য, বন্দুকের গুলি বাঘটার ঠিক কপালে গিয়ে লেগেছে।

সতেরো ॥ মরণের মুখে

দিন-তিনেক পর রামহরির অসুখ সেরে গেল, আমাদেরও যাত্রা আবার সুরু হল। আবার আমরা পাহাড়ের পথ ধরে অজানা রহস্যের দিকে এগিয়ে চললুম।

বিমল বললে, 'আমি একটু এগিয়ে যাই, আজকের পেটের খোরাক যোগাড় করতে হবে তো,—পাখি-টাখি কিছু মেলে কিনা দেখা যাক্।'—এই বলে সে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে হন্‌হন্ করে এগিয়ে চলল, খানিক পরেই আঁকাবাঁকা পথের উপরে আর তাকে দেখা গেল না—কেবল শুনতে পেলুম গলা ছেড়ে সে গান ধরেছে—

'আগে চল্, আগে চল্ ভাই!'
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই!

ক্রমে সে গানের আওয়াজও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

রামহরির শরীর তখনো বেশ কাহিল হয়েছিল, সে তাড়াতাড়ি চলতে পারছিল না, কাজেই আমাকে বাধ্য হয়েই তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হল।

সেদিন সকালের রোদটি আমার ভারি ভালো লাগছিল, মনে

হচ্ছিল যেন সারা পাহাড়ের বুকের উপরে কে কাঁচা সোনার মত মিঠে হাসি ছড়িয়ে দিয়েছে। হরেকরকম পাখির গানে চারিদিক মাৎ হয়ে আছে, গাছপালার উপরে সবুজের ঢেউ তুলে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, আর এখানে-ওখানে আশেপাশে গোছা-গোছা রঙিন বনফুল ফুটে, সোহাগে ছুলে ছুলে মাথা নেড়ে যেন বলছে—'আমাদের নিয়ে মালা গাঁথ, আমাদের আদর কর, আমাদের মনে রেখ—ভুলো না।'

কচি-কচি ফুলগুলিকে দেখে মনে হল, এরা যেন বনদেবীর খোকা-খুকি। আমি বেছে বেছে অনেক ফুল তুললুম, কিন্তু কত আর তুলব—এত ফুল ছুনিয়ার কোন ধনীর মস্ত মস্ত বাগানেও যে ধরবে না।

এমনি নানা জাতের ফুল এদেশের সব জায়গাতেই আছে। কিন্তু আমাদের স্বদেশ যে কত বড় ফুলের দেশ, আমরা নিজেরাই সে খবর রাখি না। আমরা বোকার মত হাত গুটিয়ে বসে থাকি, আর এই সব ফুলের ভাণ্ডার দু-হাতে লুট করে নিয়ে যায় বিদেশী সাহেবরা। তারপর বড় বড় শহরের বাজারে সেই সব ফুল চড়া দামে বিকিয়ে যায়—কেনে অবশ্য সাহেবরাই বেশী। এ থেকেই বেশ বুঝতে পারি, আমাদের ব্যবসা-বুদ্ধি তো নেই-ই—তারপরে সবচেয়ে যা লজ্জার কথা, স্বদেশের জিনিসকেও আমরা আদর করতে শিখিনি।

এই ভাবতে ভাবতে পথ চলছি, হঠাৎ রামহরি বলে উঠল, 'ছোট-বাবু, দেখুন—দেখুন!'

আমি ফিরে বললুম, 'কি ?'

রামহরি আঙুল দিয়ে মাটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

পথের উপর একটা বন্দুক পড়ে রয়েছে। দেখেই চিনতে পারলুম, সে বিমলের বন্দুক।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, পথের মাঝখানে বন্দুক ফেলে বিমল গেল কোথায় ? সে তো বন্দুক ফেলে যাবার পাত্র নয় !

ব্যাপারটা সুবিধের নয়, একটা কিছু হয়েছেই। তারপর মুখ

তুলেই দেখি, বাঘা একমনে একটা জায়গা শুঁকছে, আর একটা কাতর কুঁই-কুঁই শব্দ করছে।

এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখি, সেখানে খানিকটা রক্ত চাপ বেঁধে রয়েছে।

রামহরি প্রায় কেঁদে ফেলে বললে, 'খোকাবাবু নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছেন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ রামহরি, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু কি বিপদ?'

রামহরি বললে, 'কি করে বলব ছোটবাবু, এখানে যে বাঘ-ভাল্লুক সবই আছে।'

আমি বললুম, 'বাঘে মানুষ খায় বটে, কিন্তু ব্যাগ নিয়ে তো যায় না। বিমল বাঘের মুখে পড়েনি, তাহলে বন্দুকের সঙ্গে তার ব্যাগটাও এখানে পড়ে থাকত।'

—'তবে খোকাবাবু কোথায় গেলেন?' এই বলেই রামহরি চেঁচিয়ে বিমলকে ডাকবার উপক্রম করলে।

আমি তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে বললুম, 'চুপ, চুপ,—চেঁচিও না। আমার বিশ্বাস বিমল শত্রুর হাতে পড়েছে, আর শত্রুরা কাছেই আছে, চ্যাঁচালে আমরাও এখনি বিপদে পড়ব।'

—'তাহলে উপায়?'

—'তুমি এইখানে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকো। বাঘাকেও ধরে রাখো, নইলে বাঘাও হয়তো চেঁচিয়ে আমাদের বিপদে ফেলবে। আমি আগে এদিক-ওদিক একবার দেখে আসি।'

বাঘার গলায় শিকলি বেঁধে রামহরি পথের পাশেই একটা ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসল।

প্রথমে কোন্‌দিকে যাব আমি তা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু একটু পরেই দেখলুম, খানিক তফাতে আরো রক্তের দাগ রয়েছে—আরো খানিক এগিয়ে দেখলুম আরো রক্তের দাগ। তৃতীয় দাগের পরেই একটা ঝোপের পাশে খুব সরু পথ, সেই পথের উপরে লম্বা

দাগ—যেন কারা একটা মস্ত বড় মোট ধুলোর উপর দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছে।

আমি সেই সরু পথ ধরলুম—সে পথেও মাঝে মাঝে রক্তের দাগ দেখে বুঝতে দেরি লাগল না যে, এইদিকে গেলেই বিমলের দেখা পাওয়া যাবে।

কিন্তু বিমল বেঁচে আছে কি? এ রক্ত কার? তাকে ধরে নিয়ে গেলই বা কারা? সে কি ডাকাতের হাতে পড়েছে?—কিন্তু এসব কথার কোন উত্তর মিলল না।

আচম্বিতে আমার পা থেমে গেল—খুব কাছেই যেন কাদের গলা শোনা যাচ্ছে।

আমার হাতের বন্দুকটা একবার পরখ করে দেখলুম, তার ছুটো ঘরেই টোটা ভরা আছে। তারপর ঝোপের পাশে পাশে গুঁড়ি মেরে খুব সন্তর্পণে সামনের দিকে অগ্রসর হলুম।

আর বেশী এগুতে হল না—সরু পথটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে অল্প খানিকটা খালি জমি, তারপরেই পাহড়ের খাদ।—

যে দৃশ্য দেখলুম জীবনে তা ভুলব না। সেই খোলা জমির উপরে জনকয়েক লোক দাঁড়িয়ে আছে—তাদের একজনকে দেখেই চিনলুম সে করালী!

আর একদিকে পাহাড়ের খাদের ধারেই একটা বড় গাছ হেলে পড়েছে এবং তারই তলায় পড়ে রয়েছে বিমলের দেহ। তার মাথা ও মুখ রক্তমাখা, আর হাত ও কোমরে দড়ি বাঁধা। বিমলের উপরে হুম্‌ড়ি খেয়ে বসে আছে করালীর দলের আর-একটা লোক।

শুনলুম, করালী চেঁচিয়ে বলছে, 'বিমল, এখনো কথার জবাব দাও। তোমার ব্যাগের ভেতরে পকেট-বই নেই, সেখানা কোথায় আছে বল।'

কিন্তু বিমল কোন উত্তর দিলে না।

—'তাহলে তুমি মরতে চাও?'

বিমল চুপ।

করালী বললে, 'শম্ভু!'

যে লোকটা দড়ি ধরেছিল, মুখ ফিরিয়ে বললে, 'আজ্ঞে।'

লোকটাকে চিনলুম, ছাতকের ডাক-বাংলোয় দেখেছিলুম।

করালী বললে, 'দেখ শম্ভু, আর একমিনিটের মধ্যে বিমল যদি আমার কথার জবাব না দেয়, তবে তুমি ওকে তুলে খাদের ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে দিও।'

কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল, আমার বুকটা ধুকপুক করতে লাগল, কি যে করব কিছুই স্থির করতে পারলুম না।

করালী বললে, 'বিমল, এই শেষবার তোমাকে বলছি। যদি সাড়া না দাও, তবে তোমার কি হবে বুঝতে পারছ তো? একেবারে হাজার ফুট নীচে পড়ে তোমার দেহ গুড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে, একটু চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না।'

বিমল তেমনি বোবার মতন রইল।

আর এ দৃশ্য সহ্য করা অসম্ভব। ঠিক করলুম করালী যা জানতে চায়, আমিই তার সন্ধান দেব। কাজ নেই আর যকের ধনে, টাকার চেয়ে প্রাণ ঢের বড় জিনিস। মনস্থির করে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

করালী বললে, 'বিমল, এখনো তুমি চুপ করে আছ?'

এতক্ষণ পরে বিমল বললে, 'পকেট-বই পেলেই তো তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে?'

করালী বললে, 'নিশ্চয়।'

বিমল বললে, 'ব্যাগের মধ্যে আমার একটা জামার ভেতর-দিককার পকেট খুঁজলেই তুমি পকেট-বই পাবে।'

ব্যাগটা করালীর সামনেই পড়ে ছিল, সে তখনই তার ভিতরে হাত পুরে দিল। একটু চেষ্টার পরেই পকেট-বই বেরিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে করালীর মুখে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল।

কিন্তু এ হাসি দেখে এত বিপদেও আমার হাসি পেল। কারণ আমি জানি, পকেট-বই থেকে পথের ঠিকানার কথা বিমল আগেই

মুছে দিয়েছে। এত বিপদেও বিমল ভয় পেয়ে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেনি,—ধন্যি ছেলে যা হোক!

বিমল বললে, 'তোমাদের মনের আশা তো পূর্ণ হল, এইবার আমাকে ছেড়ে দাও।'

করালী কর্কশ স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, ছেড়ে দেব বৈকি—শত্রুর শেষ রাখব না। শম্ভু, আর কেন, ছোঁড়াকে নিশ্চিন্তপুরে পাঠিয়ে দাও।'

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'করালী! শয়তান! তুমি—'

কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই শম্ভু বিমলকে ধরে হিড়হিড় করে টেনে খাদের ধারে নিয়ে গিয়ে একেবারে ঠেলে ফেলে দিলে এবং চোঁখের পলক না পড়তেই বিমলের দেহ ঝুপ করে নীচের দিকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের উপরে একটা অন্ধকারের পর্দা নেমে এল এবং মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যেতে যেতে আবার আমি শুনলুম—করালীর সেই ভীষণ অট্টহাসি!...তারপরেই আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

আঠার ॥ অবাক কাণ্ড

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলুম জানি না। যখন জ্ঞান হল, চোখ চেয়ে দেখলুম, রামহরি আমার মুখের উপরে হুম্‌ড়ি খেয়ে আছে। আমাকে চোখ চাইতে দেখে সে হাঁপ ছেড়ে বললে, 'কি হয়েছে ছোটবাবু, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে কেন?'

কেন যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, প্রথমটা আমার তা মনে পড়ল না—আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলুম—একেবারে বোবার মত।

রামহরি বললে, 'তোমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে আমার ভারি ভয় হল। বাঘাকে সেইখানেই বেঁধে রেখে তোমাকে খুঁজতে আমিই এইদিকে এলুম—'

এতক্ষণে আমার সব কথা মনে পড়ল—রামহরিকে বাধা দিয়ে পাগলের মত লাফিয়ে উঠে বললুম—'রামহরি, রামহরি—আমিও ওদের খুন করব।'

রামহরি আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কাদের খুন করবে ছোটবাবু, তুমি কি বলছ?'

বন্দুকটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে আমি বললুম, 'যারা বিমলকে খাদে ফেলে দিয়েছে।'

—'খোকাবাবুকে খাদে ফেলে দিয়েছে। অ্যাঁ—অ্যাঁ', রামহরি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি বললুম, 'এখন তোমার কান্না রাখো রামহরি। এখন আগে চাই প্রতিশোধ। নাও, ওঠ—বিমলের বন্দুকটা নিয়ে এইদিকে এস।'

আমি ঝোপ থেকে বেরিয়ে দাঁড়ালুম—ঠিক করলুম সামনে যাকে দেখব তাকেই গুলি করে মেরে ফেলব কুকুরের মত।

কিন্তু কেউ তো কোথাও নেই। খাদের পাশে খোলা জমি ধু-ধু করছে—সেখানে জনপ্রাণীকেও দেখতে পেলুম না।

রামহরি পিছন থেকে বললে, 'তুমি কাকে মারতে চাও ছোট-বাবু?'

দাঁতে দাঁত ঘষে আমি বললুম, 'করালীকে। কিন্তু এর মধ্যেই দলবল নিয়ে সে কোথায় গেল?'

—'করালী'—স্তম্ভিত রামহরির মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না।

—'হ্যাঁ রামহরি, করালী। তারই হুকুমে বিমলকে ফেলে দিয়েছে।'

রামহরি কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'কোন্‌খানে খোকাবাবুকে ফেলে দিয়েছে?'

আমারও গলা কান্নায় বন্ধ হয়ে এল। কোনরকমে সামলে নিয়ে হতাশভাবে আমি বললুম, 'রামহরি, বিমলের খোঁজ নেওয়া আর মিছে।...ঐখান থেকে হাত-পা বেঁধে তাকে খাদের ভেতর ফেলে

দিয়েছে। অত উঁচু থেকে ফেলে দিলে লোহাই গুঁড়ো হয়ে যায়, মানুষের দেহ তো সামান্য ব্যাপার। বিমলকে আর আমরা দেখতে পাব না।'

রামহরি মাথায় করাঘাত করে বললে, 'খোকাবাবু সঙ্গে না থাকলে কোন্ মুখে আবার মা-ঠাক্‌রুণের কাছে গিয়ে দাড়াব? না, এ প্রাণ আমি রাখব না। আমিও পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে মরব।' এই বলে সে খাদের ধারে ছুটে গেল।

অনেক কষ্টে আমি তাকে থামিয়ে রাখলুম। তখন সে মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

যেখান থেকে বিমলকে নীচে ফেলে দিয়েছে, আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর ধারের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলুম, বিমলের দেহটা নজরে পড়ে কিনা।

নীচের দিকে তাকাতেই আমার মাথা ঘুরে গেল। উঃ, এমন গভীর খাদ জীবনে আমি কখনো দেখিনি—ঠিক খাড়াভাবে নীচের দিকে কোথায় যে তলিয়ে গেছে, তা নজরেই ঠেকে না! তলার দিকটা একেবারে ধোঁয়া ধোঁয়া—অস্পষ্ট!

হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস আমার চোখে পড়ল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে হাত পনেরো নীচেই পাহাড়ের খাড়া গায়ে একটা বুনো গাছের পুরু ঝোপ দেখা যাচ্ছে,—আর—আর সেই ঝোপের উপরে কি ও-টা?—ও যে মানুষের দেহের মত দেখতে!

প্রাণপণে চেঁচিয়ে আমি বললুম, 'রামহরি, রামহরি, দেখবে এস!'

রামহরি তাড়াতাড়ি ছুটে এল—সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের উপরে দেহটাও নড়ে উঠল।

আমি ডাকলুম, 'বিমল, বিমল।'

নীচে থেকে সাড়া এল, 'কুমার, এখনো আমি বেঁচে আছি ভাই।'

আবার আমি অজ্ঞানের মত হয়ে গেলুম—আনন্দের প্রচণ্ড আবেগে। রামহরি তো আমোদে আটখানা হয়ে নাচ সুরু করে দিলে।

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে আমি বললুম, 'রামহরি, ধেই ধেই

করে নাচলে তো চলবে না, আগে বিমলকে ওখান থেকে তুলে আনতে হবে যে!'

রামহরি তখনি নাচ বন্ধ করে, চোখ কপালে তুলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'তাই তো ছোটবাবু, ওখানে আমরা কি করে যাব, নামবার যে কোন উপায় নেই!'

উঁকি মেরে দেখলুম বিমলের কাছে যাওয়া অসম্ভব—পাহাড়ের গা বেয়ে মানুষ তো আর টিকটিকির মত নীচে নামতে পারে না! ওদিকে বিমল যে-রকম বেকায়দায় হাজার ফুট নীচু খাদের তুচ্ছ একটা ঝোপের উপরে আটকে আছে—

এমন সময়ে নীচে থেকে বিমলের চীৎকার আমার ভাবনায় বাধা দিলে। শুনলুম, বিমল চেঁচিয়ে বলছে, 'কুমার, শীগ্‌গির আমাকে তুলে নাও,—আমি ক্রমেই নীচের দিকে সরে যাচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়ে আমি বললুম, 'কিন্তু কি করে তোমার কাছে যাব বিমল?'

বিমল বললে, 'আমার ব্যাগের ভেতরে দড়ি আছে, সেই দড়ি আমার কাছে নামিয়ে দাও।'

—'কিন্তু তোমার হাত-পা যে বাঁধা, দড়ি ধরবে কেমন করে?'

—'কুমার, কেন মিছে সময় নষ্ট করছ, শীগ্‌গির দড়ি ঝুলিয়ে দাও।'

বিমলের ব্যাগটা সেইখানেই পড়ে ছিল—ভাগ্যে করালীরা সেটাও নিয়ে যায়নি! রামহরি তখনই তার ভিতর থেকে খানিকটা মোটা দড়ি বার করে আনলে।

জোর বাতাস বইছে আর প্রতি দমকাতেই ঝোপটা দুলে দুলে উঠছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিমলের দেহ নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। কি ভয়ানক অবস্থা তার! আমার বুকটা ভয়ে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

বিমল বললে, 'দড়িটা ঠিক আমার মুখের কাছে ঝুলিয়ে দাও। আমি দাঁত দিয়ে দড়িটা ভালো করে কামড়ে ধরলে পর তোমরা দুজনে আমাকে ওপরে টেনে তুলো।'

আমি একবার সার্কাসে একজন সাহেবকে দাঁত দিয়ে আড়াই মণ ভারি মাল টেনে তুলতে দেখেছিলুম। জানি বিমলের গায়ে খুব জোর আছে, কিন্তু তার দাঁত কি তেমন শক্ত হবে?

হঠাৎ বিষম একটা ঝোড়ো বাতাস এসে ঝোপের উপরে ধাক্কা মেরে বিমলের দেহকে আরো খানিকটা নীচের দিকে নামিয়ে দিলে—কোনরকমে দেহটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে বিমল একরকম আলগোছেই শূন্যে ঝুলতে লাগল। তার প্রাণের ভিতরটা তখন যে কি রকম করছিল, সেটা তার মড়ার মত সাদা মুখ দেখেই বেশ বুঝতে পারলুম। হাওয়ার আর একটা দমকা এলেই বিমলকে কেউ আর বাঁচাতে পারবে না।

তাড়াতাড়ি দড়ি ঝুলিয়ে দিলুম—একেবারে বিমলের মুখের উপরে। বিমল প্রাণপণে দড়িটা কামড়ে ধরলে।

আমি আর রামহরি দুজনে মিলে দড়ি ধরে টানতে লাগলুম—দেখতে দেখতে বিমলের দেহ পাহাড়ের ধারের কাছে উঠে এল; তার মুখ তখন রক্তের মতন রাঙা হয়ে উঠেছে—সামান্য দাঁতের জোরের উপরেই আজ নির্ভর করছে তার বাঁচন-মরণ!

রামহরি বললে, 'ছোটবাবু, তুমি একবার একলা দড়িটা ধরে থাকতে পারবে? আমি তাহলে খোকাবাবুকে হাতে করে ওপরে তুলে নি।'

আমি বললুম, 'পারব।'

রামহরি দৌড়ে গিয়ে বিমলকে একেবারে পাহাড়ের উপরে, নিরাপদ স্থানে তুলে ফেললে। তারপর তাকে নিজের বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে আনন্দের আবেগে কাঁদতে লাগল। আমি গিয়ে তার বাঁধন খুলে দিলুম।

বললুম, 'বিমল, কি করে তুমি ওদের হাতে গিয়ে পড়লে?'

বিমল বললে, 'নিজের মনে গান গাইতে গাইতে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলুম, ওরা বোধহয় পথের পাশে লুকিয়ে ছিল, হঠাৎ পিছন থেকে আমার মাথায় লাঠি মারে, আর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।'



দেখতে দেখতে বিমলের দেহ পাহাড়ের ধারের কাছে উঠে এল।

আমি বললুম, 'তারপর যা হয়েছে, আমি সব দেখেছি। তোমাকে যে আবার ফিরে পাব. আমরা তা একবারও ভাবতে পারিনি।'

বিমল হেসে বললে, 'হ্যাঁ, এতক্ষণে নিশ্চয় আমি পরলোকে ভ্রমণ করতুম—কিন্তু ভাগ্যে ঠিক আমার পায়ের তলাতেই ঝোপটা ছিল। রাখে কৃষ্ণ মারে কে?'

আমি মিনতির স্বরে বললুম, 'বিমল, আর আমাদের যকের ধনে কাজ নেই—প্রাণ নিয়ে ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরে যাই চল।'

বিমল বললে, 'তেমন কাপুরুষ আমি নই। তোমার ভয় হয়, তুমি যাও। আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে এখান থেকে কিছুতেই নড়ব না।'

উনিশ ॥ গাছের ফাঁকে ফাঁড়া

আবার আমাদের চলা সুরু হয়েছে। এবারে আমরা প্রাণপণে এগিয়ে চলেছি। পিছনে যখন শত্রু লেগেছে, তখন যত তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছানো যায়, ততই মঙ্গল।

কত বন-জঙ্গল, কত ঝরনা, খাদ, কত পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পার হয়েই যে আমরা চলেছি আর চলেছি, তার আর কোন ঠিকানা নেই। মাঝে মাঝে আমার মনে হতে লাগল, আমরা যেন চলবার জন্যেই জন্মেছি, আমরা যেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত খালি চলবই আর চলবই! দুপুরবেলায় পাহাড় যখন উনুনে পোড়ানো চাটুর মত বিষম তেতে ওঠে, কেবল সেই সময়টাতেই আমরা চলা থেকে রেহাই পেয়ে রেঁধে-খেয়ে কিছুক্ষণ গড়িয়ে নি। রাত্রে জ্যোৎস্না না থাকলে দায়ে পড়ে আমাদের বিশ্রাম করতে হয়। নইলে চলতে চলতে রোজ আমরা দেখি,—আকাশে উষার রঙিন আভাস মস্ত এক ফাগের থালার মতন প্রথম সূর্যের উদয়, বনের পাখির ডাকে সারা পৃথিবীর জাগরণ-সন্ধ্যার আভাসে মেঘে মেঘে রামধনুকের সাত-রঙা সমারোহের মধ্যে

সূর্যের বিদায়, তারপর পরীলোক-থেকে-উড়িয়ে দেওয়া ফানুসের মত চাঁদের প্রকাশ। আবার, সেই চাঁদই কতদিন আমাদের চোখের সামনেই ক্রমে ম্লান হয়ে প্রভাতের সাড়া পেয়ে মিলিয়ে যায়,—ঠিক যেন স্বপ্নের মায়ার মতন।

কিন্তু করালীর আর দেখা নেই কেন? এতদিনে আবার তার সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়া উচিত ছিল—কারণ এখন সে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে যে, পকেট-বইয়ে পথের কোন ঠিকানাই লেখা নেই। সে কি হতাশ হয়ে আমাদের পিছন ছেড়ে সরে পড়েছে, না আবার কোন্‌দিন হঠাৎ কালবোশেখীর মতই আমাদের সামনে এসে মূর্তিমান হবে?

এমনিভাবে দিনরাত চলতে চলতে শেষে একদিন আমরা রূপনাথের গুহার সুমুখে এসে দাঁড়ালুম। শুনেছি এই গুহার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলে সুদূর চীনদেশে গিয়ে হাজির হওয়া যায়। এক-বার এক চীন-সম্রাট নাকি এই পথ দিয়েই ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে এসেছিলেন। অবশ্য, এটা ইতিহাসের কথা নয়, প্রবাদেই এ কথা বলে। রূপনাথের গুহা বড় হোক আর ছোট হোক তাতে কিছু এসে যায় না, আর তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকারও নেই। কিন্তু এখানে এসে আমরা আশ্বস্তির হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম—কেননা এতদিন আমরা এই গুহার উদ্দেশেই এগিয়ে আসছিলুম এবং এখানে পৌঁছে অন্ততঃ এইটুকু বুঝতে পারলুম যে, এইবারে আমরা নিশ্চয়ই পথের শেষ দেখতে পাব। কারণ যে জায়গায় যকের ধন আছে, এখান থেকে সে জায়গাটা খুবই কাছে—মাত্র দিন-তিনেকের পথ।

বিমল হাসিমুখে একটা গাছতলায় বসে গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে লাগল।

আমি তার পাশে গিয়ে বসে বললুম, 'বিমল, এখনি অতটা স্ফূর্তি ভালো নয়!'

বিমল ভুরু কুঁচকে বললে, 'কেন?'

—'মনে কর, বৌদ্ধমঠে গিয়ে যদি আমরা দেখি যে, যকের ধন সেখানে নেই,—তাহলে?'

—'কেনই বা থাকবে না?'

—'যে সন্ন্যাসী আমার ঠাকুরদাদাকে মড়ার মাথা দিয়েছিল, সে যে বাজে কথা বলেনি, তার প্রমাণ?'

—'না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সন্ন্যাসী সত্যকথাই বলেছে। অকারণে মিছেকথা বলে তার কোন লাভ ছিল না তো!'

আমি আর কিছু বললুম না।



একটা গাছের আড়াল থেকে করালীর কুৎসিৎ মুখখানা উঁকি মারছে!

বিমল বললে, 'ও-সব বাজে ভাবনা ভেবে মাথা খারাপ কোরো না। আপাততঃ আজকের মত এখানে বসেই বিশ্রাম কর। তারপর কাল আবার আমরা বৌদ্ধমঠের দিকে চলতে সুরু করব।'

সূর্য অস্ত গিয়েছে। কিন্তু তখনো সন্ধ্যা হতে দেরি আছে। পশ্চিমের আকাশে রঙের খেলা তখনো মিলিয়ে যায়নি—দেখলে

মনে হয়, কারা যেন মেঘের গায়ে নানা রঙের জলছবি মেরে দিয়ে গেছে।

সেদিনের বাতাসটি আমার ভারি মিষ্টি লাগছিল। বিমল নিজের মনে গান গাইছে, আর আমি চুপ করে বসে শুনছি—তার গান বাস্তবিকই শোনবার মত। এইভাবে খানিকক্ষণ কেটে গেল।

হঠাৎ সামনের জঙ্গলের দিকে আমার চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আমি বেশ দেখলুম, একটা গাছের আড়াল থেকে করালীর কুৎসিত মুখখানা উঁকি মারছে! কুৎকুতে চোখ দুটো তার গোখরো সাপের মত তীব্র হিংসায় ভরা। আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হবামাত্র মুখখানা বিদ্যুতের মত সাঁৎ করে সরে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি বিমলের গা টিপলুম, বিমল চমকে গান থামিয়ে ফেললে।

চুপিচুপি বললুম, 'করালী!'

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'কৈ?'

আমি সামনের জঙ্গলের গাছটার দিকে দেখিয়ে বললুম, 'ঐখানে।'

বিমল তখনি সেইদিকে যাবার উপক্রম করলে। কিন্তু আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'না, যেও না। হয়তো করালীর লোকেরাও ওখানে লুকিয়ে আছে। আঁচমকা বিপদে পড়তে পারো।'

বিমল বললে, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু আমি যে আর থাকতে পারছি না, কুমার। আমার ইচ্ছে হচ্চে, এখনি ছুটে গিয়ে শয়তানের টুঁটি টিপে ধরি।'

আমি বললুম, 'না, না, চল, আমরা এখান থেকে সরে পড়ি। করালী ভাবুক, আমরা ওদের দেখতে পাইনি। তারপরে ভেবে দেখা যাবে আমাদের কি করা উচিত।'

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমরা সেখান থেকে চলে এলুম। বেশ বুঝলুম, করালী যখন আমাদের এত কাছে কাছে আছে, তখন কোন-না-কোন দিক দিয়ে একটা নতুন বিপদ আসতে আর বড় দেরি

নেই। যকের ধনের কাছে এসেছি বলে আমাদের মনে যে আনন্দের উদয় হয়েছিল, করালীর আবির্ভাবে সেটা আবার কর্পূরের মতন উবে গেল। কি মুস্কিল, এই রাহুর গ্রাস থেকে কি কিছুতেই আমরা ছাড়ান পাব না?

বিশ ॥ পথের বাধা

কি দুর্গম পথ! কখনো প্রায় খাড়া উপরে উঠে গেছে, কখনো পাহাড়ের শিখরের চারিদিকে পাক খেয়ে, আবার কখনো বা ঘুটঘুটে অন্ধকার গুহার ভিতর দিয়ে পথটা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ পথে নিশ্চয় লোক চলে না, কারণ পথের মাঝে মাঝে এমন সব কাঁটা-জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে যে, কুড়ুল দিয়ে কেটে না পরিষ্কার করে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ঠাকুরদাদার পকেট-বইয়ে যদি পথের ঠিকানা ভালো করে না লেখা থাকত, তাহলে নিশ্চয় আমরা এদিকে আসতে পারতুম না। পকেট-বইখানা এখন আমাদের কাছে নেই বটে, কিন্তু পথের বর্ণনা আমরা আলাদা কাগজে টুকে নিজেদের সঙ্গে সঙ্গেই রেখেছিলুম।

পথটা খারাপ বলে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতেও পারছিলুম না। বিশ মাইল পথ আমরা অনায়াসে একদিনেই পেরিয়ে যেতুম, কিন্তু এই পথটা পার হতে আমাদের ঠিক পাঁচদিন লাগল।

কাল থেকে মনে হচ্ছে, আমরা ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কোন মানুষ নেই। চারিদিক এত নির্জন আর এত নিস্তব্ধ যে, নিজেদের পায়ের শব্দে আমরা নিজেরাই থেকে থেকে চমকে উঠছি। মাঝে মাঝে বাঘা যেই ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে, আর অমনি চারিধারে পাহাড়ে পাহাড়ে এমন বিষম প্রতিধ্বনি জেগে উঠছে যে, আমার মনে হতে লাগল, পাহাড়ের শিখরগুলো যেন হঠাৎ আমাদের পদ-শব্দে জ্যান্ত হয়ে ধমকের পর ধমক দিচ্ছে। পাখিগুলো পর্যন্ত

আমাদের সাড়া পেয়ে কিচির-মিচির করে ডেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে উড়ে পালাচ্ছে—যেন এ পথে আর কখনো তারা মানুষকে হাঁটতে দেখেনি!

পাঁচ দিনের দিন, সন্ধ্যার কিছু আগে, খানিক তফাৎ থেকে আমাদের চোখের উপরে আচম্বিতে এক অপূর্ব দৃশ্য ভেসে উঠল। সারি সারি মন্দিরের মতন কতকগুলো বাড়ী—সমস্তই যেন মিশ-কালো রঙে তুলি ডুবিয়ে, আগুনের মত রাঙা আকাশের পটে কে এঁকে রেখেছে। একটা উঁচু পাহাড়ের শিখরের উপরে মন্দিরগুলো গড়া হয়েছে। এই নিস্তব্ধতার রাজ্যে শিখরের উপরে মুকুটের মত সেই মন্দিরগুলোর দৃশ্য এমন আশ্চর্যরকম গম্ভীর যে, বিস্ময়ে আর সম্ভ্রমে খানিকক্ষণ আমরা আর কথাই কইতে পারলুম না।

সকলের আগে কথা কইল বিমল। মহা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল—'বৌদ্ধমঠ!'

আমিও বলে উঠলুম—'যকের ধন!'

রামহরি বললে, 'আমাদের এতদিনের কষ্ট সার্থক হল।'

বাঘা আমাদের কথা বুঝতে পারলে না বটে, কিন্তু এটা অনায়াসে বুঝে নিলে যে, আমরা সকলেই খুব খুসি হয়েছি। সেও তখন আমাদের মুখের পানে চেয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

আনন্দের প্রথম আবেগ কোনরকমে সামলে নিয়ে আবার তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলুম। মঠ তখনো আমাদের কাছ থেকে প্রায় মাইল-খানেক তফাতে ছিল—আমরা প্রতিজ্ঞা করলুম, আজকেই ওখানে না গিয়ে কিছুতেই আর বিশ্রাম করব না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে উঠল। বিমল আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল। আচম্‌কা সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠল—'সর্বনাশ!'

আমি বললুম, 'কি হল বিমল?'

বিমল বললে, 'উঃ, মরতে মরতে ভয়ানক বেঁচে গেছি!'

—'কেন, কেন?'

-'খবর্দার! আর এগিয়ো না, দাঁড়াও! এখানে পাহাড় ধ্বসে গেছে, আর পথ নেই!'



—খবর্দার! আর এগিয়ো না, দাঁড়াও!

মাথায় যেন বজ্র ভেঙে পড়ল—পথ নেই! বিমল বলে কি?

সাবধানে দু-চার পা এগিয়ে যা দেখলুম, তাতে মন একেবারে দমে গেল। পথের মাঝখানকার একটা জায়গা ধ্বসে গিয়ে গভীর এক ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে, ফাঁকের মুখটাও প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট চওড়া। সেই ফাঁকের মধ্যেও নেমে যে পথের এদিক থেকে ওদিক দিয়ে উঠব, এমন কোন উপায়ও দেখলুম না। পথের দুপাশে যে খাড়া খাদ রয়েছে, তা এত গভীর যে দেখলেও মাথা ঘুরে যায়। এ কি বিড়ম্বনা, এতদিনের পরে, এত বিপদ এড়িয়ে, যকের ধনের সামনে এসে শেষটা কি এইখান থেকেই বিফল হয়ে ফিরে যেতে হবে?

আমার সর্বাঙ্গ এলিয়ে এল, সেইখানেই আমি ধুপ করে বসে পড়লুম।···

খানিকক্ষণ পরে মুখ তুলে দেখলুম, ঠিক সেই ভাঙা জায়গাটার ধারে একটা মস্ত উঁচু সরল গাছের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বিমল কি ভাবছে।

আমি বললুম, 'আর কি দেখছ ভাই, এখানে বসবে এস, আজ এই-খানেই রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে, কাল আবার বাড়ীর দিকে ফিরব।'

বিমল রাগ করে বললে, 'এত সহজেই যদি হাল ছেড়ে দেব, তবে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন?'

আমি বললুম, 'হাল ছাড়ব না তো কি করব বল? লাফিয়ে তো আর ঐ ফাঁকটা পার হতে পারব না, ডানাও নেই যে, উড়ে যাব।'

বিমল বললে, 'তোমাকে লাফাতেও হবে না, উড়তেও বলছি না। আমরা হেঁটেই যাব।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'হেঁটে! শূন্য দিয়ে হেঁটে যাব কি-রকম?'

বিমল বললে, 'শোন বলছি। এই ফাঁকটার মাপ সতেরো-আঠারো ফুটের বেশী হবে না, কেমন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা, ভাঙা পথের ঠিক ধারেই যে সরল গাছটা রয়েছে, ওটা আন্দাজ কত ফুট উঁচু হবে বল দেখি?'

—'সতেরো-আঠারো ফুটের চেয়ে ঢের বেশী।'

—'বেশ, তাহলে আর ভাবনা কি? আমরা কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে গাছের গোড়াটা এমনভাবে কাটব, যাতে করে পড়বার সময়ে গাছটা পথের ঐ ভাঙা অংশের ওপরেই গিয়ে পড়ে। তাহলে কি হবে বুঝতে পারছ তো?'

আমি আহ্লাদে একলাফ মেরে বললুম, 'ওহো, বুঝেছি। গাছটা ভাঙা জায়গার ওপরে পড়লেই একটা পোলের মত হবে। তাহলেই তার ওপর দিয়ে আমরা ওধারে যেতে পারব! বিমল, তুমি হচ্ছ বুদ্ধির বৃহস্পতি! তোমার কাছে আমরা এক একটি গরুবিশেষ!'

বিমল বললে, 'বুদ্ধি সকলেরই আছে, কিন্তু কাজের সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সকলেই সমানভাবে বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে পারে না বলেই তো মুস্কিলে পড়তে হয়।...যাক, আজ আমাদের এইখানেই বিশ্রাম। কাল সকালে উঠেই আগে গাছটা কাটবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

একুশ ।। বাধার উপরে বাধা

গভীর রাত্রি। একটা ঝুঁকে-পড়া পাহাড়ের তলায় আমরা আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের দুদিকে পাহাড় আর দুদিকে আগুন। বিমল আর রামহরি ঘুমোচ্ছে আমিও কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি—কিন্তু ঘুমোইনি, কারণ এখন আমার পাহারা দেবার পালা।

চাঁদের আলোর আজ আর তেমন জোর নেই; চারিদিকে আলো আর অন্ধকার যেন একসঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

হঠাৎ বৌদ্ধমঠে যাবার পথের উপর দিয়ে শেয়ালের মত কি একটা জানোয়ার বারবার পিছনে তাকাতে তাকাতে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল—দেখলেই মনে হয় সে যেন কোন কারণে ভয় পেয়েছে।

মনে কেমন সন্দেহ হল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলুম বটে, কিন্তু চোখের কাছে একটু ফাঁক রাখলুম,—আর বন্দুকটাও কাপড়ের ভিতরেই বেশ করে বাগিয়ে ধরলুম।

এক, দুই, তিন মিনিট। তারপরেই দেখলুম, পাহাড়ের আড়াল থেকে উপরে একটা মানুষ বেরিয়ে এল…তারপর আর একজন…তারপর আরো একজন—তারপর একসঙ্গে দুইজন। সবশুদ্ধ পাঁচজন লোক।

আস্তে আস্তে চোরের মতন আমাদের দিকে তারা এগিয়ে আসছে। যদিও রাতের আবছায়ায় তফাৎ থেকে তাদের চিনতে পারলুম না—তবুও আন্দাজেই বুঝে নিলুম, তারা কারা।

সব-আগের লোকটা আমাদের অনেকটা কাছে এগিয়ে এল। আমাদের সামনেকার আগুনের আভা তার মুখের উপরে গিয়ে পড়তেই চিনলুম—সে করালী!

একটা নিষ্ঠুর আনন্দে বুকটা আমার নেচে উঠল। এই করালী! এরই জন্যে কত বিপদে পড়তে হয়েছে, কতবার প্রাণ যেতে যেতে বেঁচে গেছে, এখনো এ আমাদের যমের বাড়ী পাঠাবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে; ধরি ধরি করেও কোনবারেই একে আমরা ধরতে পারিনি—কিন্তু এবারে আর কিছুতেই এর ছাড়ান নেই।

বন্দুকটা তৈরী রেখে একেবারে মড়ার মত আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইলুম। করালী আরো কাছে এগিয়ে আসুক না,—তারপরেই তার সুখের স্বপ্ন জন্মের মত ভেঙে দেব!

পা টিপে-টিপে করালী ক্রমে আমাদের কাছ থেকে হাত পনেরো-ষোলো তফাতে এসে পড়ল—তার পিছনে পিছনে আর চারজন লোক।

আগুনের আভায় দেখলুম, করালীর সেই কুৎসিত মুখখানা আজ রাক্ষসের মতই ভয়ানক হয়ে উঠেছে। তার ডানহাতে একখানা মস্ত বড় চকচকে ছোরা, এখানা নিশ্চয়ই সে আমাদের বুকের উপরে বসাতে চায়। তার পিছনের লোকগুলোরও প্রত্যেকেরই হাতে

ছোরা, বর্শা বা তরোয়াল রয়েছে। এটা আমাদের খুব সৌভাগ্যের কথা যে, করালীরা কেউ বন্দুক জোগাড় করে আনতে পারেনি। তাদের সঙ্গে বন্দুক থাকলে এতদিন নিশ্চয়ই আমরা বেঁচে থাকতে পারতুম না।

করালী আমাদের আগুনের বেড়াটা পেরিয়ে আসবার উদ্যোগ করলে।

বুঝলুম, এই সময়। বিদ্যুতের মতন আমি লাফিয়ে উঠলুম—তারপর চোখের পলক ফেলবার আগেই বন্দুকটা তুলে দিলুম একেবারে ঘোড়া টিপে। গুড়ুম!

বিকট এক চীৎকার করে করালী মাথার উপর দু-হাত তুলে মাটির উপরে ঘুরে পড়ে গেল।

তার পিছনের লোকগুলো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—তাদের দিকেও আর একবার বন্দুক ছুঁড়তেই তারা প্রাণের ভয়ে পাগলের মত দৌড়ে পালাল।

কিন্তু বন্দুকের গুলি বোধ হয় করালীর গায়ে ঠিক জায়গায় লাগেনি, কারণ মাটির উপরে পড়েই সে চোখের নিমেষে উঠে দাঁড়াল—তারপর প্রাণপণে ছুটে অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার দোনলা বন্দুকে আর টোটা ছিল না, কাজেই তাকে আর বাধা দিতেও পারলুম না।

কয় সেকেণ্ড পরে ভীষণ এক আর্তনাদে নিস্তব্ধ রাত্রের আকাশ যেন কেঁপে উঠল—তেমন আর্তনাদ আমি জীবনে আর কখনো শুনিনি। তারপরেই আবার সব চুপচাপ।—ও আবার কি ব্যাপার?

মিনিটখানেকের মধ্যেই এই ব্যাপারগুলো হয়ে গেল। ততক্ষণে গোলমালে বিমল, রামহরি আর বাঘাও জেগে উঠেছে।

বিমলকে তাড়াতাড়ি দু-কথায় সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে বললুম, 'কিন্তু ঐ আর্তনাদ যে কেন হল বুঝতে পারছি না। আমার মনে হল একসঙ্গে যেন জন-তিনেক লোক চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।'

বিমল সভয়ে বললে, 'কি ভয়ানক! নিশ্চয়ই অন্ধকারে দেখতে

না পেয়ে তারা ভাঙা পথের সেই ফাঁকের মধ্যে পড়ে গেছে। তারা কেউ আর বেঁচে নেই।'

আমি বললুম, 'কিন্তু করালী ওদিকে যায়নি—সে এখনো বেঁচে আছে।'

রামহরি বললে, 'আহা, হতভাগাদের জন্যে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে, শেষটা অপঘাতে মরল!'

বিমল বললে, 'যেমন কর্ম, তেমনি ফল—দুঃখ করে লাভ নেই। করালীর যদি এখনো শিক্ষা না হয়ে থাকে, তবে তার কপালেও অপঘাত মৃত্যু লেখা আছে।'

আমি বললুম, 'অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে আমরা নিশ্চয় করালীর দেখা পাব না। সে মরেনি বটে. কিন্তু রীতিমত জখম যে হয়েছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।'

বিমল বললে, 'আর তিনদিন যদি বাধা না পাই, তাহলে যকের ধন আমাদের মুঠোর ভিতর এসে পড়বেই—এ আমি তোমাকে বলে দিলুম।'

আমি হেসে বললুম, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

বাইশ ।। অলৌকিক কাণ্ড

সেই সকাল থেকে আমরা ভাঙা জায়গাটার ধারে গিয়ে সরল গাছের গোড়ার উপরে ক্রমাগত কুড়ুলের ঘা মারছি আর মারছি। এমনভাবে আমরা গাছ কাটছি, যাতে করে পড়বার সময়ে সেটা ঠিক ভাঙা জায়গার উপরে গিয়ে পড়ে।

দুপুরের সময় গাছটা পড় পড় হল। আমরা খুব সাবধানে কাজ করতে লাগলুম, কারণ আমাদের সমস্ত আশা-ভরসা এখন এই গাছটার উপরেই নির্ভর করছে—একটু এদিক-ওদিক হলেই সকলকে ধুলো-পায়েই বাড়ীর দিকে ফিরতে হবে।

…গাছটা পড়তে আর দেরি নেই, তার গোড়া মড়মড় করে উঠল।

বিমল বললে, 'আর গোটাকয়েক কোপ। ব্যাস, তাহলেই কেল্লা ফতে।'

টিপ করে ঠিক গোড়া ঘেসে মারলুম আরো বার কয়েক কুড়ুলের ঘা।

বিমল বলে উঠল, 'হুঁশিয়ার! সরে দাঁড়াও, গাছটা পড়ছে।'

আমি আর রামহরি একলাফে পাশে সরে দাঁড়ালুম।

মড় মড় মড়—মড়াৎ। গাছটা হুড়মুড় করে ভাঙা জায়গাটার দিকে হেলে পড়ল।

বিমল বললে, 'ব্যাস! দেখ কুমার, আমাদের পোল তৈরী।'

গাছটা ঠিক মাঝখানকার ফাঁকটার উপর দিয়ে পাহাড়ের ওধারে গিয়ে পড়েছে, তার গোড়া রইল এদিকে, আগা রইল ওদিকে। যা চেয়েছিলুম তাই ….

আহার আর বিশ্রাম সেরে আমরা আবার বৌদ্ধমঠের দিকে অগ্রসর হলুম। রোদ্দুরে পাহাড়ে-পথ তেতে আগুন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেসব কষ্ট আমরা আজ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলুম না, মনে মনে দৃঢ়পণ করলুম যে, আজ মঠে না গিয়ে কিছুতেই আর ফিরেন নেই।

সূর্য অস্ত যায় যায়। মঠও আর দূরে নেই। তার মেঘ-ছোঁয়া মন্দিরটার ভাঙা চূড়া আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে জেগে আছে। এদিকে-ওদিকে আরো কতকগুলো ছোট ছোট ভগ্নস্তূপও দূর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আরো খানিক এগিয়ে দেখলুম, আমাদের দু-পাশে কারুকার্য করা অনেক গুহা রয়েছে। এইসব গুহায় আগে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরা বাস করতেন, এখন কিন্তু তাদের ভিতর জনপ্রাণীর সাড়া নেই।

গুহাগুলোর মাঝখান দিয়ে পথটা হঠাৎ একদিকে বেঁকে গেছে। সেই বাঁকের মুখে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলুম আমাদের সামনেই মঠের সিংহদরজা।

আমরা সকলেই একসঙ্গে প্রচণ্ড উৎসাহে জয়ধ্বনি করে উঠলুম। বাঘা আসল কারণ না বুঝেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল, ঘেউ ঘেউ ঘেউ। অনেকদিন পরে আবার সেই পোড়ো মন্দিরটার চারিদিক সরগরম হয়ে উঠল।

বিমল দু-হাত তুলে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, 'যকের ধন আজ আমাদের!'

আমি বললুম, 'চল, চল, চল। আগে সেই জায়গাটা খুঁজে বার করি।'

সিংহদরজার ভিতর দিয়ে আমরা মন্দিরের আঙিনায় গিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড আঙিনা—চারিদিকে চকবন্দী ঘর, কিন্তু এখন আর তাদের কোন শ্রী-ছাঁদ নেই। বুনো চারা-গাছে আর জঙ্গলে পা ফেলে চলা দায়, এখানে-ওখানে ভাঙা পাথর ও নানারকম মূর্তি পড়ে রয়েছে, স্থানে স্থানে জীবজন্তুর রাশি রাশি হাড়ও দেখলুম। বোধ হয় হিংস্র পশুরা এখন সন্ন্যাসীদের ঘরের ভিতর আস্তানা গেড়ে বসেছে, বাইরে থেকে শিকার ধরে এনে এখানে বসে নিশ্চিন্তভাবে পেটের ক্ষুধা মিটিয়ে নেয়।

আমি বললুম, 'বিমল, মড়ার মাথাটা এইবার বার কর, সঙ্কেত দেখে পথ ঠিক করতে হবে।'

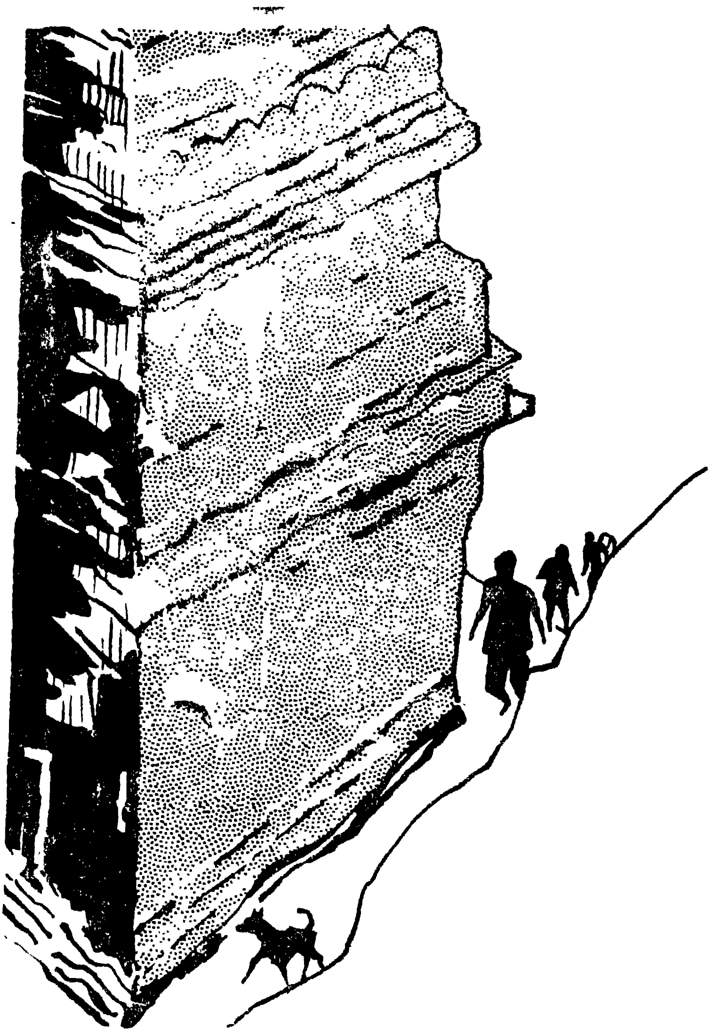
বিমল বললে, 'তার জন্যে ভাবনা কি, সঙ্কেতের কথাগুলো আমার মুখস্থই আছে।' এই বলে সে আউড়ে গেল :—'ভাঙা দেউলের পিছনে সরল গাছ। মূলদেশ থেকে পূর্বদিকে দশ গজ এগিয়ে থামবে। ডাইনে আট গজ এগিয়ে বুদ্ধদেব। বামে ছয় গজ এগিয়ে তিনখানা পাথর। তার তলায় সাত হাত জমি খুঁড়লে পথ পাবে।'

আমি বললুম, 'তাহলে আগে আমাদের ভাঙা দেউল খুঁজে বার করতে হবে।'

বিমল বললে, 'খুঁজতে হবে কেন? দেউল বলতে এখানে নিশ্চয় বোঝাচ্ছে ঐ প্রধান মন্দিরকে। ও মন্দিরটাও তো ভাঙা। আচ্ছা, দেখাই যাক না।'

আমরা বড় মন্দিরের পিছনের দিকে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

রামহরি বললে 'বাহবা, ঠিক কথাই যে! মন্দিরের পিছনে ঐ যে সরল গাছ।'



আমরা বড় মন্দিরের পিছনের দিকে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

তাই বটে। মন্দিরের পিছনে অনেকটা খোলা জায়গা, আর তার মধ্যে সরল গাছ আছে মাত্র একটি, কিছু ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।

চারিদিকে মাঝে মাঝে ছোট-বড় অনেকগুলো বুদ্ধদেবের মূর্তি রয়েছে,—কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। ভাঙা, আভাঙা পাথরও পড়ে আছে অগুন্তি।

বিমল বললে, 'এরি মধ্যে কোন একটি মূর্তির কাছে আমাদের যকের ধন আছে। আচ্ছা, সরল গাছ থেকে পুবদিকে এই দশ গজ এগিয়ে থামলুম। তারপর ডাইনে আট গজ,—হুঁ, এই যে বুদ্ধদেব। বাঁয়ে ছয় গজ—কুমার, দেখ দেখ, ঠিক তিনখানাই পাথর পরে পরে সাজানো রয়েছে। মড়ার মাথার সঙ্কেত তাহলে মিথ্যে নয়।'

আহ্লাদে বুক আমার দশখানা হয়ে উঠল—মনের আবেগ আর সহ্য করতে না পেরে আমি সেই পাথরগুলোর উপরে ধুপ করে বসে পড়লুম।

বিমল বললে, 'ওঠ—ওঠ। এখন দেখতে হবে, পাথরের তলায় সত্যি সত্যিই কিছু আছে কি না।'

আমরা তিনজনে মিলে তখনি কোমর বেঁধে পাথর সরিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে গেলুম।...

প্রায় হাত-সাতেক খোঁড়ার পরেই কুড়ুলের মুখে মুখে কি-একটা শক্ত জিনিস ঠক্ ঠক্ করে লাগতে লাগল। মাটি সরিয়ে দেখা গেল, আর একখানা বড় পাথর।

অল্প চেষ্টাতেই পাথরখানা তুলে ফেলা গেল—সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম গর্তের মধ্যে সত্য-সত্যই একটা বাঁধানো সুড়ঙ্গ-পথ রয়েছে।

আমাদের তখনকার মনের ভাব লেখায় খুলে বলা যাবে না। আমরা তিনজনেই আনন্দবিহ্বল হয়ে পরস্পরের মুখের পানে তাকিয়ে বসে রইলুম।

কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপারে বুকটা আমার চমকে উঠল। গর্তের ভিতর থেকে হু-হু করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

—'বিমল, দেখ—দেখ!'

বিমল সবিস্ময়ে গর্তের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'তাই তো,

কি কাণ্ড! এতদিনের বন্ধ গর্তের ভেতর থেকে ধোঁয়া আসছে কেমন করে?'

তখন সন্ধ্যা হতে আর বিলম্ব নেই—পাহাড়ের অলিগলি ঝোপ-ঝাপের ধারে ধারে অন্ধকার জমতে সুরু হয়েছে, চারিদিক এত স্তব্ধ যে পাখিদের সাড়া পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

গর্ত থেকে ধোঁয়া তখনও বেরুচ্ছে, আর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরে ঘুরে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

বিমল আস্তে আস্তে বললে, 'সামনেই রাত্রি, আজ আর হাঙ্গামে কাজ নেই। কাল সকালে সব ব্যাপার বোঝা যাবে। এস, গর্তের মুখে আবার পাথর চাপিয়ে রাখা যাক।'

তেইশ ।। মরণের হাসি

মনটা কেমন দমে গেল। অতগুলো পাথর-চাপানো বন্ধ গর্তের মধ্যে ধোঁয়া এল কেমন করে? আগুন না থাকলে ধোঁয়া হয় না, কিন্তু গর্তের ভিতর আগুনই বা কোথেকে আসবে? আগুন তো জ্বালে মানুষেরই হাত! অনেক ভেবে কিছু ঠিক করতে পারলুম না।

সে রাত্রে মঠের একটা ঘরের ভিতরে আমরা আশ্রয় নিলুম। খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার আগে বিমলকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'হ্যাঁ, হে, তুমি যকের কথায় বিশ্বাস কর?'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, শুনেছি যক একরকম প্রেতযোনি। তারা গুপ্তধন রক্ষা করে। কিন্তু যক আমি কখনো চোখে দেখিনি, কাজেই তার কথা আমি বিশ্বাসও করি না।'

আমি বললুম, 'তুমি ভগবানকে কখনো চোখে দেখনি, তবু ভগবানকে যখন বিশ্বাস কর, তখন যকের কথাতেও বিশ্বাস কর না কেন?'

বিমল বললে, 'হঠাৎ যকের কথা তোলবার কারণ কি কুমার ?'

—'কারণ আমার বিশ্বাস ঐ গুপ্তধনের গর্তের ভেতরে ভুতুড়ে কিছু আছে। নইলে—'

—'নইলে-টইলের কথা যেতে দাও। ভূত-দানব যাই-ই থাক, কাল আমি গর্তের মধ্যে ঢুকবই'—দৃঢ়স্বরে এই কথাগুলো বলেই বিমল শুয়ে পড়ে কম্বল মুড়ি দিলে।

আমার বুকের ছম্‌ছমানি কিন্তু গেল না। রামহরির কাছ ঘেঁসে বসে বললুম, 'আচ্ছা রামহরি, তুমি যক বিশ্বাস কর ?'

—'করি ছোটবাবু।'

—'তোমার কি মনে হয় না রামহরি, ঐ গর্তের ভেতরে যক আছে ?'

—'যকই থাকুক আর রাক্ষসই থাকুক, খোকাবাবু যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব'—এই বলে রামহরিও লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

যেমন মনিব, তেমনি চাকর। দুটিতে সমান গোঁয়ার। আমি নাচার হয়ে বসে বসে পাহারা দিতে লাগলুম।···

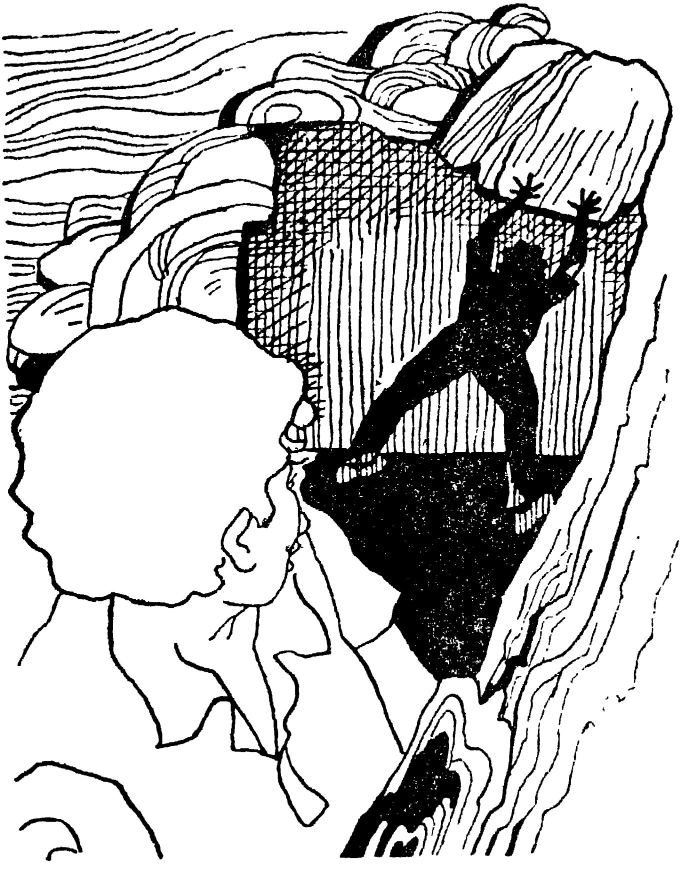
ভোরবেলায় উঠেই আমরা আবার যথাস্থানে গিয়ে হাজির। গর্তের মুখ থেকে পাথরগুলো আবার সরিয়ে ফেলা হল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও আজ কিন্তু ধোঁয়া দেখতে পাওয়া গেল না।

বিমল আশ্বস্ত হয়ে বললে, বোধ হয় অনেককাল বন্ধ থাকার দরুণ গর্তের ভেতরে বাষ্প-টাষ্প কিছু জমেছিল, তাকেই আমরা ধোঁয়া বলে ভ্রম করেছিলুম।'

বিমলের এই অনুমানে আমারও মন সায় দিলে। নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম, 'এখন আমাদের কি করা উচিত ?'

বিমল বললে, 'সুড়ঙ্গের ভেতরে যাব, তারপর ধন খুঁজে বার করব।···কুমার, রামহরি, তোমরা প্রত্যেকে এক-একটা "ইলেকট্রিক টর্চ" নাও, কারণ সুড়ঙ্গের ভেতরটা নিশ্চয়ই অমাবস্যার রাতের মত অন্ধকার।' এই বলে সে প্রথমে বাঘাকে গর্তের মধ্যে নামিয়ে দিলে, তারপর নিজেও নেমে পড়ল। আমরাও দুজনে তার অনুসরণ করলুম।

উঃ, সুড়ঙ্গের ভিতরে সত্যিই কি বিষম অন্ধকার, দু-চার পা এগিয়ে আমরা ভুলে গেলুম যে, বাইরে এখন সূর্যদেবের রাজ্য। ভাগ্যে এই 'বিজলী-মশাল' বা ইলেকট্রিক টর্চগুলো আমাদের সঙ্গে ছিল, নইলে ভয়ে এক পাও অগ্রসর হতে পারতুম না।



বিমল পাগলের মতন গর্তের মুখে ঠেলা মারতে লাগল

আমরা হেঁট হয়ে ক্রমেই ভিতরে প্রবেশ করেছি, কারণ সুড়ঙ্গের ছাদ এত নীচু যে, মাথা তোলবার কোন উপায় নেই।

আচম্বিতে পিছনে কিসের একটা শব্দ হল—সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

পিছনে ফিরে দেখলুম, সুড়ঙ্গের মুখের গর্ত দিয়ে বাইরের যে আলোটুকু আসছিল, তা আর দেখা যাচ্ছে না।

আবার সেইরকম একটা শব্দ। তারপর আবার,—আবার।

আমি তাড়াতাড়ি ফের সুড়ঙ্গের মুখে ছুটে এলুম। যা দেখলুম, তাতে প্রাণ আমার উড়ে গেল!

সুড়ঙ্গের মুখ একেবারে বন্ধ!

বিমলও এসে ব্যাপারটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ, সকলের আগে কথা কইলে রামহরি। সে বললে, 'কে এ কাজ করলে?'

বিমল পাগলের মতন গর্তের মুখে ঠেলা মারতে লাগল, কিন্তু তার অসাধারণ শক্তিও আজ হার মানলে—গর্তের মুখ একটুও খুলল না।

আমি হতাশভাবে বললুম, 'বিমল, আর প্রাণের আশা ছেড়ে দাও, এইখানেই জ্যান্ত আমাদের কবর হবে।'

আমরা কথা শেষ হতে না হতেই কাঁশির মত খনখনে গলায় হঠাৎ খিল্‌খিল্‌ করে কে হেসে উঠল! সে কি ভীষণ বিশ্রী হাসি, আমার বুকের ভিতরটা যেন মড়ার মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

হাসির আওয়াজ এল সুড়ঙ্গের ভিতর থেকেই। তিনজনেই বিজলী-মশাল তুলে ধরলুম, কিন্তু কারুকেই দেখতে পেলুম না।

বিমল বললে, 'কে হাসলে কুমার?'

আমি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললুম, 'যক, যক!'

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই খিল্‌খিল্‌ করে খনখনে হাসি!

মানুষে কখনও তেমন হাসি হাসতে পারে না। বাঘা পর্যন্ত অবাক হয়ে কান খাড়া করে সুড়ঙ্গের ভিতরের দিকে চেয়ে রইল।

পাছে আবার সেই হাসি শুনতে হয়, তাই আমি দুই হাতে সজোরে দুই কান বন্ধ করে মাটির উপর বসে পড়লুম।

চব্বিশ ।। ধনাগার

জীবনে এমন বুক-দমানো হাসি শুনিনি,—সে হাসি শুনলে কবরের ভিতরে মড়াও যেন চম্‌কে জেগে শিউরে ওঠে।

হাসির তরঙ্গে সমস্ত সুড়ঙ্গ কাঁপতে লাগল।

আমার মনে হল বহুকাল পরে সুড়ঙ্গের মধ্যে মানুষের গন্ধ পেয়ে যক আজ প্রাণের আনন্দে হাসতে সুরু করেছে—কতকাল অনাহারের পর আজ তার হাতের কাছে খোরাক গিয়ে আপনি উপস্থিত!

উপরে গর্তের মুখ বন্ধ—ভিতরে এই কাণ্ড! এ জীবনে আর যে কখনো চন্দ্র-সুর্যের মুখ দেখতে পাব না, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই!

হাসর আওয়াজ ক্রমে দূরে গিয়ে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল—কেবল তার প্রতিধ্বনিটা সুড়ঙ্গের মধ্যে গম্ গম্ করতে লাগল।

আর কোন বাঙালীর ছেলে নিশ্চয়ই আমাদের মতন অবস্থায় কখনো পড়েনি! আমরা যে এখনো পাগল হয়ে যাইনি, এইটেই আশ্চর্য!

তিনজনে স্তম্ভিতের মত বসে বসে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম—কারুর মুখে আর বাক্য সরছে না।

বিমলের মুখে আজ প্রথম এই দুর্ভাবনার ছাপ দেখলুম। সে ভয় পেয়েছে কিনা বুঝতে পারলুম না, কিন্তু আমার মনে হল আজ সে বিলক্ষণ দমে গিয়েছে।...আর না দমে করে কি, এতেও যে দমবে না, নিশ্চয়ই সে মানুষ নয়!

প্রথম কথা কইলে রামহরি। আমাকে হাত ধরে টেনে তুলে বললে, 'বাবু, আর এ রকম করে বসে থাকলে কি হবে, একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো?'

আমি বললুম, 'ব্যবস্থা আর করব ছাই! যতক্ষণ প্রাণটা আছে, নাচার হয়ে নিঃশ্বাস ফেলি এস!'

বিমল বললে, 'কিন্তু গর্তের মুখ বন্ধ করলে কে?'

আমি বললুম, 'যক।'

বিমল মুখ ভেঙিয়ে বললে, 'যকের নিকুচি করেছে। আমি ওসব মানি না।'

—'না মেনে উপায় কি? ভেবে দেখ বিমল, যে গর্তের কথা কাক-পক্ষী জানে না, সেই গর্তেরই মুখ হঠাৎ এমন বন্ধ হয়ে গেল কি করে?'

বিমল চিন্তিতের মতন বললে, 'হ্যাঁ, সেও একটা কথা বটে।'

—'মনে আছে তো, কাল এই গর্তের ভিতর থেকে হু-হু করে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল?'

—'মনে আছে।'

—'আর এই বিশ্রী হাসি।'

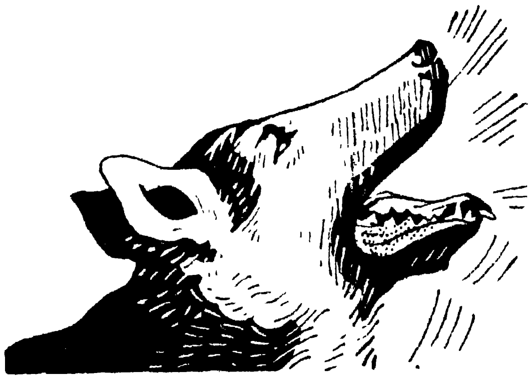
বিমল একেবারে চুপ।

হঠাৎ রামহরি চেঁচিয়ে উঠল—'খোকাবাবু, দেখ—দেখ!'

ও কী ব্যাপার! আমরা সকলেই স্পষ্ট দেখলুম, খানিক তফাতে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে সোঁ করে একটা আগুন চলে গেল।

আমি সরে এসে পাথর-চাপা গর্তের মুখে পাগলের মতন ধাক্কা মারতে লাগলুম—কিন্তু গর্তের মুখ একটুও খুলল না।

বিমল বললে, 'কুমার! বিজলী-মশালটা জ্বেলে আমার সঙ্গে এস। রামহরি, তুমি সকলের পিছনে থাক। আমি দেখতে চাই, ও আগুনটা কিসের!'





হাতকয়েক দূরে, মাটির উপরে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে মনে হল।

আগুনটা তখন আর দেখা যাচ্ছিল না। বিমল বন্দুক বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেল, আমরাও তার পিছনে পিছনে চললুম। ভয়ে আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

খানিক দূরে গিয়েই সুড়ঙ্গটা আর একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে গিয়ে পড়েছে—সেইখানেই আগুনটা জ্বলে উঠেছিল।

সেইখানে দাঁড়িয়ে আমরা সতর্কভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।

হাতকয়েক দূরে, মাটির উপরে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে বলে মনে হল—বাঘা ছুটে সেইখানে চলে গেল।

বিজলী-মশালের আলোটা ভালো করে তার উপরে গিয়ে পড়তেই, বিমল বলে উঠল, 'ও যে দেখছি একটা মানুষের দেহের মত!'

রামহরি বললে, 'কিন্তু একটুও নড়চে না কেন?'

হঠাৎ আবার কে হেসে উঠল—হি-হি-হি-হি! কোথা থেকে কে যে সেই ভয়ানক হাসি হাসলে, আমরা কেউ তা দেখতে পেলুম না। সকলেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—হাসির চোটে সমস্ত সুড়ঙ্গটা আবার থর থর করে কাঁপতে লাগল।

আমি আঁতকে চেঁচিয়ে বললুম, 'পালিয়ে এস বিমল, পালিয়ে এস—চল আমরা গর্তের মুখে ফিরে যাই।'

কিন্তু বিমল আমার কথায় কান পাতলে না—সে সামনের দিকে ছুটে এগিয়ে গেল।

সুড়ঙ্গ আবার স্তব্ধ।

বিমল একেবারে সেই মানুষের দেহটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর হেঁট হয়ে তার গায়ে হাত দিয়েই বলে উঠল, 'কুমার, এ যে একটা মড়া!'

সুড়ঙ্গের মধ্যে মানুষের মৃতদেহ! আশ্চর্য!

বিমল আবার বললে, 'কুমার, এদিকে এসে এর মুখের ওপরে ভালো করে আলোটা ধর তো!'

আর এগুতে আমার মন চাইছিল না, কিন্তু বাধ্য হয়ে বিমলের কাছে যেতে হল।

আলোটা ভালো করে ধরতেই বিমল উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল—'কুমার, কুমার, এ যে শম্ভু!'

তাইতো, শম্ভুই তো বটে! চিৎ হয়ে তার দেহটা পড়ে রয়েছে, চোখ দুটো ভিতর থেকে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, আর তার গলার কাছটায় প্রকাণ্ড একটা ক্ষত!

বিমল হেঁট হয়ে শম্ভুর গায়ে হাত দিয়ে বললে, 'না, কোন আশা

নেই—অনেকক্ষণ মরে গেছে।'

আমি সেই ভয়ানক দৃশ্যের উপর থেকে আলোটা সরিয়ে নিয়ে বললুম, 'কিন্তু—কিন্তু—শম্ভু এখানে এল কেমন করে?'

বিমল চম্‌কে উঠে বললে, 'তাইতো, ও কথাটা তো এতক্ষণ আমার মাথায় ঢোকেনি—শম্ভু এই সুড়ঙ্গের সন্ধান পেল কোত্থেকে?'

আমি বললুম, 'শম্ভু যখন এসেছে, তখন করালীও নিশ্চয় সুড়ঙ্গের কথা জানে।'

বিমল একলাফ মেরে বলে উঠল—'কুমার, কুমার! আলোটা ভালো করে ধর—যকের ধন! যকের ধন কোথায় আছে, আগে তাই খুঁজে বার করতে হবে।'

চারিদিকে আলোটা বারকতক ঘোরাতে-ফেরাতেই দেখা গেল, সুড়ঙ্গের এককোণে একটা দরজা রয়েছে।

বিমল ছুটে গিয়ে দরজাটা ঠেলে বললে, 'এই যে একটা ঘর! যকের ধন নিশ্চয়ই এর ভেতরে আছে।'

পঁচিশ ।। অদৃশ্য বিপদ

ঘরের ভিতর ঢুকে আমরা সাগ্রহে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।

ঘরটা ছোট—ধুলো আর দুর্গন্ধে ভরা।

আসবাবের মধ্যে রয়েছে খালি এককোণে একটা পাথরের সিন্দুক—এ রকম সিন্দুক কলকাতার যাদুঘরে আমি একবার দেখেছিলুম।

বিমল এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকের ডালাটা তখনই খুলে ফেললে, আমরা সকলেই একসঙ্গে তার ভিতরে তাড়াতাড়ি হুমড়ি খেয়ে উঁকি মেরে দেখলুম—কিন্তু হা ভগবান, সিন্দুক একেবারে খালি!

আমাদের এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত আয়োজন—সমস্তই ব্যর্থ হল!

কেউ আর কোন কথা কইতে পারলুম না, আমার তো ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল।

অনেকক্ষণ পরে বিমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আমাদের একূল-ওকূল দুকূল গেল! যকের ধনও পেলুম না, প্রাণেও বোধহয় বাঁচব না!'

আমি বললুম, 'বিমল, আগে যদি আমার মানা শুনতে! কতবার তোমাকে বলেছি ফিরে চল, যকের ধনে আর কাজ নেই।'

রামহরি বললে, 'আগে থাকতেই মুষড়ে পড়ছ কেন? খুঁজে দেখ, হয়তো আর কোথাও যকের ধন লুকানো আছে।'

বিমল বললে, 'আর খোঁজাখুঁজি মিছে। দেখছ না, আমাদের আগেই এখানে অন্য লোক এসেছে, সে কি আর শুধু-হাতে ফিরে গেছে?'

আমি বললুম, 'এ কাজ করালী ছাড়া আর কারুর নয়।'

—'হুঁ।'

—'কিন্তু সে কি করে খোঁজ পেলে?'

—'খুব সহজেই। কুমার, আমরা বোকা—গাধার চেয়েও বোকা। করালী পালিয়েছে ভেবে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে পথ চলছিলুম—সে কিন্তু নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের পিছু নিয়েছিল। তারপর কাল যখন আমরা সুড়ঙ্গের মুখ খুলেছিলুম, সে তখন কাছেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে বসেছিল। কাল রাতেই সে কাজ হাসিল করেছে, আমরা যে কোনরকমে পিছু নিয়ে তাকে আবার ধরব, সে উপায়ও আর রেখে যায়নি। বুঝেছ কুমার, করালী গর্তের মুখ বন্ধ করে দিয়ে গেছে!'

—'কিন্তু শম্ভুকে খুন করলে কে?'

—'করালী নিজেই।'

—'কেন সে তা করবে?'

—'পাছে যকের ধনে শম্ভু ভাগ বসাতে চায়।'

হঠাৎ আমাদের কানের উপরে আবার সেই ভীষণ অট্টহাসি বেজে

উঠল—'হা-হা-হা-হা-হা!'

আমি আর্তনাদ করে বলে উঠলুম, 'বিমল, শম্ভুকে খুন করেছে এই যক!'

আবার—আবার সেই হাসি!

আমার হাত থেকে বিজলী-মশালটা কেড়ে নিয়ে বিমল—যেদিক থেকে হাসি আসছিল, সেইদিকে ঝড়ের মতন ছুটে গেল—তার পিছনে ছুটল রামহরি।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে একলা বসে আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলুম—বিমল এত তাড়াতাড়ি চলে গেল যে, আমিও তার পিছু নিতে পারলুম না।



আমার বুকের উপর বসে সে হা-হা করে হাসতে লাগল!

উঃ, পৃথিবীর বুকের মধ্যেকার সে অন্ধকার যে কি জমাট, লেখায় তা প্রকাশ করা যায় না—অন্ধকারের চাপে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

হঠাৎ আমার পিঠের উপরে ফোঁস করে কে নিঃশ্বাস ফেললে

চেঁচিয়ে বিমলকে ডাকতে গেলুম, কিন্তু গলা দিয়ে আমার আওয়াজই বেরুল না। সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু ঘরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে মাটির উপরে পড়ে গেলুম।

উঠে বসতে না বসতেই আমার পিঠের উপরে কে লাফিয়ে পড়ল এবং লোহার মতন শক্ত দুখানা হাত আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলুম—সে কিন্তু অনায়াসে আমাকে শিশুর মত ধরে ঘরের মেঝের উপর চিৎ করে ফেললে—প্রাণপণে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—'বিমল, বিমল, বিমল, বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও!'

আমার বুকের উপরে বসে সে হা-হা করে হাসতে লাগল।—কিন্তু তার পরমুহূর্তেই সে হাসি আচম্বিতে বিকট এক আর্তনাদের মতন বেজে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের উপর থেকে সেই ভূত না মানুষটা—ভগবান জানেন কি—মাটির উপর ছিটকে পড়ল।

তাড়াতাড়ি আমি উঠে বসলুম—অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলুম না বটে, কিন্তু শব্দ শুনে যেন বুঝলুম, ঘরের ভিতরে বিষম এক ঝটাপটি চলেছে।

ছাব্বিশ ॥ ভূত, না জন্তু, না মানুষ?

কি যে করব, কিছুই বুঝতে না পেরে, দেওয়ালে পিঠ রেখে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম—ওদিকে ঘরের ভিতরে ঝাপটা-ঝাপটি সমানে চলতে লাগল।

তারপরেই সব চুপচাপ।

আলো নিয়ে বিমল তখনো ফিরল না, অন্ধকারে আমিও আর উঠতে ভরসা করলুম না। ঘরের ভিতরে যে খুব একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সে কাণ্ডটা যে কি, অনেক ভেবেও আমি তা ঠাউরে উঠতে পারলুম না।

হঠাৎ আমার গায়ের উপরে কে আবার ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে। আঁতকে উঠে একলাফে আমি পাঁচ হাত পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রাণপণে সামনের দিকে চেয়ে দেখলুম, অন্ধকারের মধ্যে দুটো জ্বলন্ত চোখ যেন আমার পানে তাকিয়ে আছে। খানিক পরেই চোখ দুটো ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল!

এবারে প্রাণের আশা একেবারেই ছেড়ে দিলুম। পায়ে পায়ে আমি পিছনে হটতে লাগলুম—সেই জ্বলন্ত চোখ দুটোর উপরে স্থির দৃষ্টি রেখে। হঠাৎ কি একটা জিনিসে পা লেগে আমি দড়াম্ করে পড়ে গেলুম এবং প্রাণের ভয়ে যত-জোরে-পারি চেঁচিয়ে উঠলুম··· তারপরেই কিন্তু বেশ বুঝতে পারলুম—আমি একটা মানুষের দেহের উপর কাৎ হয়ে পড়ে আছি!

সে দেহ কার, তা জীবিত না মৃত, এসব ভাববার কোন সময় নেই—কারণ গেলবারের মতন এবারেও হয়তো আবার কোন শয়তান আমার পিঠের উপরে লাফিয়ে পড়বে—সেই ভয়েই কাতর হয়ে তাড়াতাড়ি চোখ তুলতেই দেখি, সুড়ঙ্গের মধ্যে বিজলী-মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। আঃ, এতক্ষণ পরে!

আলো দেখে আমার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল, তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে উঠলুম—'বিমল, বিমল, শীগগির এস!'

—'কি হয়েছে কুমার—ব্যাপার কি?' বলতে বলতে বিমল ঝড়ের মতন ছুটে এল—তার পিছনে রামহরি।

বিজলী-মশালের আলো ঘরের ভিতরে পড়তেই দেখলুম, ঠিক আমার সামনে, মাটির উপরে দুই থাবা পেতে বসে বাঘা জিভ বার করে অত্যন্ত হাঁপাচ্ছে। তার মুখে ও সর্বাঙ্গে টাটকা রক্তের দাগ।

বুঝলুম, এই বাঘার চোখ দুটো দেখেই এবারে আমি মিছে ভয় পেয়েছি। কিন্তু তার মুখে আর গায়ে এত রক্ত কেন?

হঠাৎ বিমল বিস্ময়ের স্বরে বললে, 'কুমার, কুমার, তুমি কিসের উপরে বসে আছ?'

তখন আমার হুঁস হল—আমার তলায় যে একটা মানুষের দেহ!

একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে যা দেখলুম, তা আর জীবনে কখনো ভুলব না।

ঘরের মেঝের উপর মস্ত লম্বা একটা কালো কুচকুচে মানুষের প্রায় উলঙ্গ দেহ চিৎ হয়ে সটান পড়ে আছে। লম্বা লম্বা জটপাকানো চুল আর গোঁফদাড়িতে তার মুখখানা প্রায় ঢাকা পড়েছে—তার চোখ দুটো ড্যাব-ডেবে, দেখলেই বুক চমকে ওঠে, হাঁ-করা মুখের ভিতর থেকে বড় বড় হিংস্র দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে—কে এ?···সেই অদ্ভুত মূর্তি দেখে সহজে বোঝা শক্ত যে, সে ভূত, না জন্তু, না মানুষ।

বিমল হেঁট হয়ে দেখে বললে, 'এর গলা দিয়ে যে হু-হু করে রক্ত বেরুচ্ছে!'

আমি শুষ্কস্বরে বললুম, 'বিমল, একটু আগে এই লোকটা আমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল।'

—'বল কি, তারপর—তারপর?'

—'তারপর ঠিক কি যে হল অন্ধকারে আমি তা বুঝতে পারিনি বটে, কিন্তু বোধহয় বাঘার জন্যই এ-যাত্রা আমি বেঁচে গেছি।'

—'বাঘার জন্যে?'

—'হ্যাঁ, সে-ই টুঁটি কামড়ে ধরে একে আমার বুকের উপর থেকে টেনে নামায়, বাঘার কামড়েই যে ওর এই দশা হয়েছে, এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি। দেখ দেখি, ও বেঁচে আছে কিনা?'

বিমল পরীক্ষা করে দেখে বললে, 'না, একেবারে মরে গেছে।'

রামহরি বাঘার পিঠ চাপড়ে বললে, 'সাবাস বাঘা, সাবাস বাঘা, সাবাস!'

বাঘা আহ্লাদে ল্যাজ নাড়তে লাগল; আমি আদর করে তাকে বুকে টেনে নিলুম।

বিমল বললে, 'কিন্তু এ লোকটা কে?'

রামহরি বললে, 'উঃ, কি ভয়ানক চেহারা! দেখলেই ভয় হয়!'

আমি বললুম, 'আমার তো ওকে পাগল বলে মনে হচ্ছে।'

বিমল বললে, 'হতে পারে। নইলে অকারণে তোমাকে মারবার

চেষ্টা করবে কেন?'

আমি বললুম, 'এতক্ষণে আর একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি। শম্ভু বোধহয় এর হাতেই মারা পড়েছে।'

রামহরি বললে, 'কিন্তু এ সুড়ঙ্গের মধ্যে এল কি করে?'

বিমল চুপ করে ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সে বললে, 'দেখ কুমার, হাসি শুনে কে হাসছে খুঁজতে গিয়ে আমরা সুড়ঙ্গের এক জায়গায় কতকগুলো জ্বলন্ত কাঠ আর পোড়া মাংস দেখে এসেছি। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ লোকটাই এই সুড়ঙ্গের মধ্যে বাস করত। আমাদের দেখে এ-ই এতক্ষণ হাসছিল—এ যে পাগল তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।'

আমি বললুম, 'কিন্তু সুড়ঙ্গের চারিদিক যে বন্ধ!'

বিমল লাফ মেরে দাঁড়িয়ে আনন্দভরে বলে উঠল, 'কুমার, আমরা বেঁচে গেছি! এই অন্ধকূপের মধ্যে আমাদের আর অনাহারে মরতে হবে না!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'হঠাৎ তোমার এতটা আহ্লাদের কারণ কি?'

বিমল বললে, 'কুমার, তুমি একটি নিরেট বোকা। এও বুঝছ না যে, এই পাগলাটা যখন সুড়ঙ্গের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, তখন কোথাও বাইরে যাবার একটা পথও আছে। সুড়ঙ্গের যে মুখ দিয়ে ঢুকেছি, সে মুখ তো বরাবরই বন্ধ ছিল, সুতরাং সেখান দিয়ে নিশ্চয়ই পাগলাটা আনাগোনা করত না। যদি বল সে বাইরে যেত না, তাহলে সুড়ঙ্গের মধ্যে জ্বালানি কাঠ আর মাংস এলো কোত্থেকে?'

আমি বললুম, 'কিন্তু অন্য পথ থাকলেও আমরা তো তার সন্ধান জানি না।'

বিমল বললে, 'সেইটেই আমাদের খুঁজে দেখা দরকার। সুড়ঙ্গের সবটা তো আমরা দেখিনি।'

আমি বললুম, 'তবে চল, আগে পথ খুঁজে বার করতে হবে। যকের ধন তো পেলুম না, এখন কোনগতিকে বাইরে বেরুতে

পারলেই বাঁচি।'

বিমল বললে, 'যকের ধন এখনো আমাদের হাতছাড়া হয়নি। পথ যদি খুঁজে পাই, তাহলে এখনো করালীকে ধরতে পারব। এখানে আর দেরি করা নয়,—চলে এস।'

বিমল আরো এগিয়ে গেল, আমরা তার পিছনে পিছনে চললুম।

সুড়ঙ্গটা যে কত বড়, তার মধ্যে যে এত অলিগলি আছে, আগে আমরা সেটা বুঝতে পারিনি। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে আমরা চারিদিকে আতিপাতি করে খুঁজে বেড়ালুম, কিন্তু পথ তবু পাওয়া গেল না। সেই চির-অন্ধকারের রাজ্যে আলো আর বাতাসের অভাবে প্রাণ আমাদের থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠছিল, কিন্তু উপায় নেই, কোন উপায় নেই!

শেষটা হাল ছেড়ে দিয়ে আমি বললুম, 'বিমল, আর আমি ভাই পারছি না, পথ যখন পাওয়াই যাবে না, তখন এখানেই শুয়ে শুয়ে আমি শান্তিতে মরতে চাই।' এই বলে আমি বসে পড়লুম।

বিমল আমার হাত ধরে নরম গলায় বললে, 'ভাই কুমার, এত সহজে কাবু হয়ে পড়লে চলবে না। পথ আছেই, আমরা খুঁজে বার করবই।'

আমি সুড়ঙ্গের গায়ে হেলান দিয়ে বললুম, 'তোমার শক্তি থাকে তো পথ খুঁজে বার কর—আমার শরীর আর বইছে না।'

হঠাৎ বাঘা দাঁড়িয়ে উঠে কান খাড়া করে একদিকে চেয়ে রইল—বিমলও আলোটা তাড়াতাড়ি সেইদিকে ফেরালে। দেখলুম—খানিক তফাতে একটা শেয়াল থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে।

বাঘা তাকে রেগে ধমক দিয়ে তেড়ে গেল, শেয়ালটাও ভয় পেয়ে ছুট দিলে— ব্যাপারটা কি হয় দেখবার জন্যে বিমল বিজলী-মশালের আলোটা সেইদিকে ঘুরিয়ে ধরলে।

অল্পদূরে গিয়েই শেয়ালটা সুড়ঙ্গের উপরদিকে একটা লাফ মেরে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাঘা হতভম্বের মত সেইখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শেয়ালটা কি করে পালাল দেখবার জন্যে বিমল কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। তারপর আলোটা মাথার উপর তুলে ধরে সেখানটা দেখেই মহা আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠল, 'পথ পেয়েছি কুমার, পথ পেয়েছি!'

বিমলের কথায় আমার দেহে যেন নূতন জীবন ফিরে এল, তাড়াতাড়ি উঠে সেইখানে ছুটে গিয়ে বললুম 'কৈ, কৈ?'

—'এই যে!'

দেয়ালের একেবারে উপরদিকে ছোট একটা গর্তের মত, তার ভিতর দিয়ে বাইরের আলো রূপোর আভার মত দেখাচ্ছে। এতক্ষণ পরে পৃথিবীর আলো দেখে আমার চোখ আর মন যেন জুড়িয়ে গেল।

বিমল বললে, 'নিশ্চয় পাহাড় ধ্বসে এই পথের সৃষ্টি হয়েছে। কুমার, তুমি সকলের আগে বেরিয়ে যাও। রামহরি, তুমি আলোটা নাও, আমি কুমারকে গর্তের মুখে তুলে ধরি!'

বিমল আমাকে কোলে করে তুলে ধরলে, গর্ত দিয়ে মুখ বাড়াতেই নীলাকাশের সূর্য, স্নিগ্ধ-শীতল বাতাস আর ফলে-ফুলে ভরা সবুজ বন যেন আমাকে অভ্যর্থনা করলে চিরজন্মের মতন সাদরে!

সাতাশ ।। করালীর আর এক কীর্তি

বাইরের আলো-হাওয়া যে কত মিষ্টি, পাতালের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সেদিন তা ভালো করে প্রথম বুঝতে পারলুম। কারুর মুখে কোন কথা নেই—সকলে মিলে নীরবে বসে খানিকক্ষণ ধরে সেই আলো-হাওয়াকে প্রাণভরে ভোগ করে নিতে লাগলুম।

হঠাৎ বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আলো-হাওয়া আজও আছে, কালও থাকবে। কিন্তু করালীকে আজ না ধরতে পারলে এ-জীবনে আর কখনো ধরতে পারব না। ওঠ কুমার, ওঠ রামহরি।'

আমি কাতরভাবে বললুম, 'কোথায় যাব আবার?'

—'যে পথে এসেছি, সেই পথে। করালীকে ধরব—যকের ধন কেড়ে নেব।'

—'কিন্তু এখনো যে আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়নি!'

বিমল হাত ধরে একটানে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে, 'খাওয়া-দাওয়ার নিকুচি করেছে! আগে তো বেরিয়ে পড়ি, তারপর ব্যাগের ভেতরে বিস্কুটের টিন আছে, পথ চলতে চলতে তাই খেয়েই পেট ভরাতে পারব।—এস, এস, আর দেরি নয়।'

বন্দুকটা ঘাড়ে করে বিমল অগ্রসর হল, আমরাও তার পিছনে পিছনে চললুম।

বিমল বললে, 'সুড়ঙ্গের মুখে পাথর চাপা দিয়ে করালী নিশ্চয় ভাবছে, আর কেউ তার যকের ধনে ভাগ বসাতে আসবে না। সে নিশ্চিন্ত মনে দেশের দিকে ফিরে চলেছে, আমরা একটু তাড়াতাড়ি হাঁটলে আজকেই হয়তো আবার তাকে ধরতে পারব, এরি মধ্যে সে বেশীদূর এগুতে পারেনি।'

আমি বললুম, 'কিন্তু করালী তো সহজে যকের ধন ছেড়ে দেবে না!'

—'তা তো দেবেই না।'

—'তাহলে আবার একটা মারামারি হবে বল?'

—'হবে বৈকি! কিন্তু এবারে আমরাই তাকে আগে আক্রমণ করব।'

এমনি কথা কইতে কইতে, বৌদ্ধমঠ পিছনে ফেলে আমরা অনেকদূর এগিয়ে পড়লুম।

ক্রমে সূর্য ডুবে গেল, চারিধারে অন্ধকারের আবছায়া ঘনিয়ে এল, বাসামুখো পাখিরা কলরব করতে করতে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, পৃথিবীতে এবার ঘুমপাড়ানি মাসির রাজত্ব সুরু হবে।

আমরা পাহাড়ের সেই মস্ত ফাটলের কাছে এসে পড়লুম,—সরল গাছ কেটে সাঁকোর মতন করে যেখানটা আমাদের পার হতে হয়েছিল।

সাঁকোর কাছে এসে বিমল বললে, 'দেখ কুমার, আমি যদি করালী হতুম, তাহলে কি করতুম জানো ?'

—'কি করতে ?'

—'এই গাছটাকে যে-কোন রকমে ফাটলের মধ্যে ফেলে দিয়ে যেতুম। তাহলে আর কেউ আমার পিছু নিতে পারত না।'

—'কিন্তু করালী যে জানে তার শত্রুরা এখন কবরের অন্ধকারে হাঁপিয়ে মরছে, তারা আর কিছুই করতে পারবে না।'

—'এত বেশী নিশ্চিন্ত হওয়াই ভুল, সাবধানের মার নেই। দেখ না, এক এই ভুলেই করালীকে যকের ধন হারাতে হবে।...কিন্তু কে ও—কে ও ?'

আমরা সকলেই স্পষ্ট শুনলুম, স্তব্ধ সন্ধ্যার বুকের মধ্য থেকে এক ক্ষীণ আর্তনাদ জেগে উঠছে—'জল, একটু জল !'

—'কুমার, কুমার, ও কার আর্তনাদ ?'

—'একটু জল, একটু জল।'

সকলে মিলে এদিকে-ওদিকে খুঁজতে খুঁজতে শেষটা দেখলুম, পাহাড়ের একপাশে একটা খাদলের মধ্যে যেন মানুষের দেহের মত কি পড়ে রয়েছে। জঙ্গলে সেখানটা অন্ধকার দেখে আমি বললুম, 'রামহরি, শীগ্গির লণ্ঠনটা জ্বালো তো।'

রামহরি আলো জ্বেলে খাদলের উপরে ধরতেই লোকটা আবার কান্নার স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—'ওরে বাবা রে, প্রাণ যে যায়, একটু জল দাও—একটু জল দাও !'

বিমল তাকে টেনে উপরে তুলে, তার মুখ দেখেই বলে উঠল, 'একে যে আমি করালীর সঙ্গে দেখেছি !'

লোকটাও বিমলকে দেখে সভয়ে বললে, 'আমাকে আর মেরো না, আমি মরতেই বসেছি—আমাকে মেরে আর কোন লাভ নেই।'

এতক্ষণে দেখলুম, তার মুখে-বুকে-হাতে-পিঠে বড় বড় রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন—ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেউ তাকে বার বার আঘাত করেছে।

বিমল বললে, 'কে তোমার এ দশা করলে?'

—'করালী।'

—'করালী?'

—'হ্যাঁ মশাই, সেই শয়তান করালী।'

—'কেন সে তোমাকে মারলে?'

—'সব বলছি, কিন্তু বাবু, তোমার পায়ে পড়ি, আগে একটু জল দাও—তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।'



ওরে বাবা রে, প্রাণ যে যায়, একটু জল দাও।

রামহরি তাড়াতাড়ি তার মুখে জল ঢেলে দিলে। জলপান করে 'আঃ' বলে লোকটা চোখ মুদে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

বিমল বললে, 'এইবার বল, করালী কেন তোমাকে মারলে?'

—'বলছি বাবু, বলছি। আমি তো আর বাঁচব না, কিন্তু মরবার আগে সব কথাই তোমাদের কাছে বলে যাব।' আরো কতক্ষণ চুপ

করে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলতে লাগল, 'বাবু, তোমাদের পাথর চাপা দিয়ে, করালীবাবু আর আমি তো সেখান থেকে চলে এলুম। যকের ধনের বাক্স করালীবাবুর হাতেই। তারপর এখানে এসে করালীবাবু বললে, 'তুই কিছু খাবার রান্না কর, কাল সারারাত খাওয়া হয়নি, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।'—আমাদের সঙ্গে চাল-ডাল আর আলু ছিল, বন থেকে কাঠ-কুটো জোগাড় করে এনে আমি খিচুড়ী চড়িয়ে দিলুম।···করালীবাবু আগে খেয়ে নিলে, পরে আমি খেতে বসলুম। তারপর কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আমার পিঠের ওপরে ভয়ানক একটা চোট লাগল, তখনি আমি চোখে অন্ধকার দেখে চিৎ হয়ে পড়ে গেলুম। তারপর আমার বুকে আর মুখেও ছোরার মতন কি এসে বিঁধল—আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। কে যে মারলে তা আমি দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু করালীবাবু ছাড়া তো এখানে আর জনমুনিষ্যি ছিল না, সে ছাড়া আর কেউ আমাকে মারেনি। বোধহয়, পাছে আমি তার যকের ধনের ভাগীদার হতে চাই, তাই সে এ কাজ করেছে।' এই পর্যন্ত বলেই লোকটা বেজায় হাঁপাতে লাগল।

বিমল ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'এ ব্যাপারটা কতক্ষণ আগে হয়েছে?'

—'তখন বোধহয় বিকেলবেলা।'

—'করালীর সঙ্গে আর কে আছে?'

—'কেউ নেই। আমরা পাঁচজন লোক ছিলুম। আসবার মুখেই দুজন তো তোমাদের তাড়া খেয়ে অন্ধকার রাতে ঐ ফাটলে পড়ে পটল তুলেছে। শম্ভুকে সুড়ঙ্গের মধ্যে ভূত না দানো কার মুখে ফেলে ভয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি। এইবার আমার পালা, জল—আর একটু জল!'

রামহরি আবার তার মুখে জল দিলে, কিন্তু এবারে জল খেয়েই তার চোখ কপালে উঠে গেল।

বিমল তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে, 'যকের ধনের বাক্সে কি ছিল?'

কিন্তু লোকটা আর কোন কথার জবাব দিতে পারলে না, তার মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠতে লাগল ও জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল ; তারপরেই গোটাকতক হেঁচকি তুলে সে একেবারে স্থির হয়ে রইল।

বিমল বললে, 'যাক, এ আর জন্মের মত কথা কইবে না। এখন চল, করালীকে ধরে তবে অন্য কাজ।'

চোখের সামনে একটা লোককে এভাবে মরতে দেখে আমার মনটা অত্যন্ত দমে গেল, আমি আর কোন কথা না বলে বিমলের সঙ্গে সঙ্গে চললুম এই ভাবতে ভাবতে যে, পৃথিবীতে করালীর মতন মহাপাষণ্ড আর কেউ আছে কি ?

আঠাশ ॥ ভীষণ গহ্বর

অল্প-অল্প চাঁদের আলো ফুটেছে, সে আলোতে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না—অন্ধকার ছাড়া। প্রেতলোকের মতন নির্জন পথ। আমাদের পায়ের শব্দে যেন চারিদিকের স্তব্ধতা চম্‌কে চম্‌কে উঠছে। আশপাশের কালি-দিয়ে-আঁকা গাছপালাগুলো মাঝে মাঝে বাতাস লেগে দুলছে আর আমাদের মনে হচ্ছে, থেকে থেকে অন্ধকার যেন তার ডানা নাড়া দিচ্ছে।

আমি বললুম, 'দেখ বিমল, আমাদের আর এগুনো ঠিক নয়।'

—'কেন ?'

—'এই অন্ধকারে একলা পথ চলতে করালী নিশ্চয় ভয় পাবে। খুব সম্ভব, সে এখন কোন গুহায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে আর আমরা হয়তো তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাব। তার চেয়ে আপাততঃ আমরাও কোথাও মাথা গুঁজে কিছু বিশ্রাম করে নি এস, তারপর ভোর হলেই আবার চলতে সুরু করা যাবে।'

বিমল বললে, 'কুমার, তুমি ঠিক বলেছ। করালীকে ধরবার আগ্রহে এসব কথা আমার মনেই ছিল না।'

রক্তজবার রঙে-চোবানো উষার প্রথম আলো সবে যখন পূর্ব-আকাশের ধারে পাড় বুনে দিচ্ছে, আমরা তখন আবার উঠে পথ চলতে সুরু করলুম।

চারিদিকে নানা জাতের পাখিরা মিলে গানের আসর জমিয়ে তুলেছে, গাছের সবুজ পাতারাও যেন কাঁপতে কাঁপতে মর্মর-সুরে সেই গানে যোগ দিয়েছে, আর তার তালে তালে ঝরে পড়ে ঝরনার জল নাচতে নাচতে নীচে নেমে যাচ্ছে। আকাশে বাতাসে পৃথিবীতে কেমন একটি শান্তিভরা আনন্দের আভাস! এরি মধ্যে আমরা কিন্তু আজ হিংসাপূর্ণ আগ্রহে ছুটে চলেছি—এটা ভেবেও আমার মন বার বার কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে লাগল।...

পাহাড়ের পর পাহাড়ের মাথার উপরে সূর্যের মুখ যখন জ্বলন্ত মটুকের মতন জেগে উঠল, আমরা তখন পথের একটা বাঁকের মুখে এসে পড়েছি।

বাঘা এগিয়ে এগিয়ে চলছিল, বাঁকের মুখে গিয়েই হঠাৎ সে ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

আমরা সবাই সতর্ক ছিলুম, সে চ্যাঁচালে কেন, দেখবার জন্যে তখনি সকলে ছুটে বাঁকের মুখে গিয়ে দাঁড়ালুম।

দেখলুম, খানিক তফাতে একটা লোক দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে! দেখবামাত্র চিনলুম, সে করালী! তার হাতে একটা বড় বাক্স—যকের ধন!

আমাদের দেখেই করালী বেগে একদৌড় মারলে—সঙ্গে সঙ্গে বিমলও তীরের মতন তার দিকে ছুটে গেল। আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

ছুটতে ছুটতে বিমল একেবারে করালীর কাছে গিয়ে পড়ল। তারপর সে চেঁচিয়ে বললে, 'করালী, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে থামো। নইলে আমি গুলি করে তোমাকে কুকুরের মত মেরে ফেলব।'

কিন্তু করালী থামলে না, হঠাৎ পথের বাঁ-দিকে একটা উঁচু জায়গায় লাফিয়ে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল—বিমল সেখানে থমকে

দাঁড়াল,—এক মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই সেও লাফিয়ে উপরে উঠল, আমরা তাকেও আর দেখতে পেলুম না।

ততক্ষণে আমাদের হুঁস হল—'রামহরি, শীগ্‌গির এস' বলেই আমি প্রাণপণে দৌড়ে অগ্রসর হলুম।

সেই উঁচু জায়গাটার কাছে গিয়ে দেখলুম, সেখানে পাহাড়ের গায়ে রয়েছে একটা গুহার মুখ। আমি একলাফে উপরে উঠতেই একটা বিকট চীৎকার এসে আমার কানের ভিতরে ঢুকল—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বিমলের কণ্ঠস্বরে উচ্চ আর্তনাদ। তারপরই সব স্তব্ধ।

আমার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে উঠল—বেগে ছুটে গিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। ভিতরে গিয়ে দেখি কেউ তো সেখানে নেই! অত্যন্ত আশ্চর্য ও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

পরমুহূর্তে রামহরিও এসে গুহার মধ্যে ঢুকে বললে, 'কে অমন চেঁচিয়ে উঠল? কৈ, খোকাবাবু কোথায়?'

—'জানি না রামহরি, আমি শুনলুম গুহার ভেতর থেকে বিমল আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু ভেতরে এসে কারুকেই তো দেখতে পাচ্ছি না!'

গুহার একদিকটা আঁধারে ঝাপসা। সেইদিকে গিয়েই রামহরি বলে উঠল, 'এই যে, ভেতরে আর একটা পথ রয়েছে।'

দৌড়ে গিয়ে দেখি, সত্যিই তো! একটা গলির মত পথ ভিতর দিকে চলে গেছে—কিন্তু অন্ধকারে সেখানে একটুও নজর চলে না।

আমি বললুম, 'রামহরি, শীগ্‌গির বিজলী-মশাল বের কর, বন্দুকটা আমাকে দাও।'

বন্দুকটা আমার হাতে দিয়ে রামহরি বিজলী-মশাল বার করলে, তারপর সাবধানে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। আমিও বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে সতর্ক চোখে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে তার সঙ্গে সঙ্গে চললুম।

উপরে, নীচে, এপাশে, ওপাশে গুহার নিরেট পাথর, তারই ভিতর দিয়ে যেতে যেতে আবার আমার মনে পড়ল, সেই যকের ধনের সুড়ঙ্গের কথা।

আচম্বিতে রামহরি দাঁড়িয়ে পড়ে আঁতকে উঠে বললে, 'সর্বনাশ!'

আমি বললুম, 'ব্যাপার কি?'

রামহরি বললে, 'সামনেই প্রকাণ্ড একটা গর্ত!'

বিজলী-মশালের তীব্র আলোতে দেখলুম, ঠিক রামহরির পায়ের তলাতেই গুহার পথ শেষ হয়ে গেছে, তারপরেই মস্তবড় একটা অন্ধকার-ভরা ফাঁক যেন হাঁ করে আমাদের গিলতে আসছে। বিমল কি ওরই মধ্যে পড়ে গেছে?

যতটা পারি গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকলুম, 'বিমল, বিমল, বিমল!'

পৃথিবীর গর্ত থেকে করুণস্বরে কে যেন সাড়া দিলে—'কুমার, কুমার! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!'

গহ্বরের ধারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে রামহরির হাত থেকে বিজলী-মশালটা নিয়ে দেখলুম, গর্তের মুখটা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত চওড়া। তলার দিকে চেয়ে দেখলুম প্রায় ত্রিশ হাত নীচে কি যেন চক্ চক্ করছে! ভালো করে চেয়ে দেখি, জল।

আবার চেঁচিয়ে বললুম, 'বিমল, কোথায় তুমি?'

অনেক নীচে থেকে বিমল বললে, 'এই যে, জলের ভেতরে। শীগ্গির আমাকে তোলবার ব্যবস্থা কর ভাই, আমার হাত-পায়ে খিল ধরেছে, এখুনি ডুবে যাব।'

—'রামহরি, রামহরি! ব্যাগের ভেতর থেকে দড়ির বাণ্ডিল বের কর—জলদি!'

রামহরি তখনি পিঠ থেকে বড় ব্যাগটা নামিয়ে খুলতে বসে গেল। আমি বিজলী-মশালটা নীচু-মুখো করে দেখলুম, কালো জলের ভিতরে ঢেউ তুলে বিমল সাঁতার দিচ্ছে।

তাড়াতাড়ি দড়িটা নামিয়ে দিলুম, বিমল সাঁত্রে এসে দড়িটা দু-হাতে চেপে ধরলে।

আমি আবার চেঁচিয়ে বললুম, 'বিমল, দেওয়ালে পা দিয়ে দড়ি



বিমল সাঁতরে এসে দড়িটা দু-হাতে চেপে ধরলে।

রে তুমি উপরে উঠতে পারবে, না, আমরা তোমায় টেনে তুলব?'

বিমলও চেঁচিয়ে বললে, 'বোধহয় আমি নিজেই উঠতে পারব।'

আমি আর রামহরি সজোরে দড়ি ধরে রইলুম, খানিক পরে বিমল নিজেই উপরে এসে উঠল, তারপর আমার কোলের ভিতরে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অজ্ঞান হয়ে গেল।

আমরা দুজনে তাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এলুম।

উনত্রিশ ।। পরিণাম

বিমলের জ্ঞান হলে পর আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি করে তুমি গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়লে?'

বিমল বললে, 'করালীর পিছনে পিছনে যেই আমি গুহার মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম, সে অমনি ঐ অন্ধকার গলির মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ল। আমিও ছাড়লুম না, গলির ভিতরে ঢুকে সেই অন্ধকারেই আমি তাকে জড়িয়ে ধরলুম, তারপর দুজনের ধস্তাধস্তি সুরু হল। কিন্তু আমরা কেউ জানতুম না যে, ওখানে আবার একটা গহ্বর আছে, ঠেলাঠেলি জড়াজড়ি করতে করতে দুজনেই হঠাৎ তার ভেতরে পড়ে গেলুম।'

আমি শিউরে বলে উঠলুম, 'অ্যাঁঃ! করালী তাহলে এখনো গহ্বরের মধ্যে আছে?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু বেঁচে নেই।'

—'সে কি!'

—'যদিও অন্ধকারে সেখানে চোখ চলে না, তবু আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি, সে ডুবে মরেছে। কারণ, আমরা জলে পড়বার পর ঠিক আমার পাশেই দু-চারবার ঝপাঝপ্ শব্দ হয়েই সব চুপ হয়ে গেল। নিশ্চয়ই সে সাঁতার জানত না, জানলে জলের ভেতরে শব্দ হত।'

আমি রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আর যকের ধনের বাক্সটা?'

বিমল একটা বিষাদ-ভরা হাসি হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'আমি যখন করালীকে জড়িয়ে ধরি, তখনো সে বাক্সটা ছাড়েনি। আমার বিশ্বাস, বাক্সটা নিয়েই সে জলপথে পরলোকে যাত্রা করেছে।'

—'কিন্তু বাক্সটা যদি গলির ভেতরে পড়ে থাকে?' বলেই আমি বিজলী-মশালটা নিয়ে আবার গুহার ভিতরকার গলির মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম। কিন্তু মিছে আশা, সেখানে বাক্সের চিহ্নমাত্রও নেই! আর একবার সেই বিরাট গহ্বরের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলুম, অনেক নীচে অন্ধকার-মাখা-জলরাশি মৃতের মতন স্থির ও স্তব্ধ হয়ে আছে, এই একটু আগেই সে যে একটা মানুষের প্রাণ ও সাত-রাজার ধনকে নিষ্ঠুরভাবে গ্রাস করে ফেলেছে, তাকে দেখে এখন আর সে সন্দেহ করবারও উপায় নেই।

হতাশভাবে বাইরে এসে অবসন্নের মতন বসে পড়লুম।

বিমল শুধোলে, 'কেমন, পেলে না তো?'

মাথা নেড়ে নীরবে জানালুম—'না।'

—'তা আমি আগেই জানি। করালী প্রাণে মরেছে বটে, কিন্তু যকের ধন ছাড়েনি। শেষ জিৎ তারই।'

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। দুঃখে, ক্ষোভে, বিরক্তিতে মনটা আমার ভরে উঠল; এত বিপদ, এত কষ্টভোগের পর এতবড় নিরাশা! আমার ডাক-ছেড়ে কাঁদবার ইচ্ছা হতে লাগল।

বিমলও হতাশভাবে মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে রামহরি বললে, 'তোমরা দুজনে অমন মন-মরা হয়ে থাকলে তো চলবে না। যকের ধন ভাগ্যেই নেই তাতে হয়েছে কি?'

'প্রাণে বেঁচেছ এই ঢের। যা হাতে না আসতেই অত বিপদ, এত ঝঞ্ঝাট, যার জন্যে এতগুলো প্রাণ গেল, তা পেলে না জানি আরো কত মুস্কিলই হত! এখন ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে চল।'

বিমল মাথা তুলে হেসে বললে, 'ঠিক বলেছ রামহরি। আঙুর যখন নাগালের বাইরে, তখন তাকে তেতো বলেই মনকে প্রবোধ দেওয়া যাক। যকের ধন কি মানুষের ভোগে লাগে? করালী ভূত হয়ে চিরকাল তা ভোগ করুক—দরকার নেই আর তার জন্যে মাথা ঘামিয়ে। আপাততঃ বড়ই ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, কুমার! তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ, পাখিটাখি কিছু মারতে পারো কি না। ততক্ষণে রামহরি ভাত চড়িয়ে দিক, আর আমি ওষুধ মালিস করে গায়ের ব্যথা দূর করি।'

আমি বললুম, 'কাজেই!'

বিমল বললে, 'আহারের পর নিদ্রা, তারপর দুর্গা বলে স্বদেশের দিকে যাত্রা, কি বল?'

আমি বললুম, 'অগত্যা।'



কাম্‌রা আর আমরা

মা বললেন, 'ওরে আজ অগস্ত্য যাত্রা! আজকে বিদেশে যেতে নেই।'

সুট্‌কেশটা গোছাতে গোছাতে আমি বললুম, 'কেন বল দেখি? আজ বিদেশে গেলে কি হয়?'

মা বললেন, 'আজকে যাত্রা করে অগস্ত্যমুনি আর ফিরে আসেননি।'

আমি বললুম, 'অগস্ত্যমুনির বৌ ভারি কোঁদল করত। তার ভয়েই "এই আসি" বলে তিনি পিঠটান দিয়েছিলেন।'

মা প্রতিবাদ করে বললেন, 'কৈ, শাস্তরে তো সে কথা লেখে না!'

আমি বললুম, 'শাস্ত্রে সে কথা লিখলে অগস্ত্যমুনির বউ মানহানির মামলা এনে শাস্ত্রকারকে জব্দ করে দিতেন যে! কাজেই শাস্ত্রকাররা সে কথা চেপে গিয়েছেন।'

মা বললেন, 'না রে, না। বিন্ধ্য-পাহাড় —'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'থাক মা, ও-গল্প আমিও জানি। তোমার কোন ভয় নেই মা, মাসখানেক ভারতবর্ষের বুকে বেড়িয়ে আবার আমি ঠিক ফিরে আসবই। তোমার মত মাকে ছেড়ে

কোন ছেলে কি ঘর ভুলে থাকতে পারে? এই নাও, একটা প্রণাম নিয়ে হাসিমুখে আমাকে আশীর্বাদ কর।'

মা খুঁৎ খুঁৎ করতে করতে আমাকে আশীর্বাদ করলেন।

যতীন আর আমি, দুই বন্ধুতে দেশ বেড়াতে বেরিয়েছি। যতীন পড়ে ল-কলেজে, আর আমি মেডিকেল কলেজে।

হাওড়া ইষ্টিশানে গিয়ে একটা সেকেণ্ড কেলাস কামরায় ঢুকলুম। এ-সময়ে কেউ বেড়াতে যায় না বলেই আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি। গাড়ীতে ভিড় থাকবে না, দিব্যি ধীরে-সুস্থে শুয়ে-বসে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে যেতে পারব। পূজোর সময়ে আর বড়দিনে বেড়াতে যাওয়ার পায়ে নমস্কার! সে কি বেড়াতে যাওয়া, না নরক যন্ত্রণা ভোগ করা?

প্রথমেই আমাদের বেনারসে যাবার কথা,—সেখানে গিয়ে পৌঁছুব কাল প্রায় দুপুরে। সারা রাত ট্রেনেই কাটাতে হবে। কাজেই আমাদের কামরায় লোক নেই দেখে ভারি আনন্দ হল। বাইরের কোন লোক আসবার আগেই তাড়াতাড়ি দুখানা বেঞ্চে দুটো বিছানা বিছিয়ে আমরা দুজনেই শুয়ে পড়লুম।

শুয়ে শুয়ে দুই বন্ধুতে অনেক গল্প হল। তারপর ট্রেন যখন বর্ধমান পার হল, যতীন উঠে আলো নিবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ পরে অন্ধকারেই যতীনের নাক-ডাকার আওয়াজ শুনতে শুনতে আমারও চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, আচমকা আমার ঘুম ভেঙে গেল। কে আমার গা ধরে নাড়া দিচ্ছে। ধীরে ধীরে উঠে বসলুম—সঙ্গে সঙ্গে সামনের বেঞ্চ থেকে যতীনও ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে বসল।

আমি বললুম, 'যতীন, আমার ঘুম ভাঙালে কেন?'

যতীন বললে, 'আমিও তোমাকে ঠিক ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

—'তার মানে?'

—'তুমি তো আমার গা ধরে নাড়া দিচ্ছিলে ?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি হে, আমি তো দিব্যি আরামে ঘুমিয়েছিলুম, তুমিই তো আমার গা-নাড়া দিয়ে আমাকে তুলে দিলে !'

যতীন হেসে বললে, 'বাঃ, বেশ লোক যাহোক ! নিজে আমাকে ধাক্কা মেরে তুলে দিয়ে আবার আমার ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে ?'

আমি বললুম, 'না ভাই, সত্যি বলছি, আমি এখান থেকে এক পা নড়িনি। তোমাকে আমি ধাক্কা তো মারিইনি বরং আমাকেই তুমি ধাক্কা মেরেছ। আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি ?'

যতীন গম্ভীর স্বরে বললে, 'গাড়ীতে আর জনপ্রাণী নেই, আমাদের দুজনকে তবে ধাক্কা মারলে কে ? চোর-টোর আসেনি তো ?'

শুনেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আমি আবার আলো জ্বেলে দিলুম। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখলুম কামরায় আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই এবং আমাদের মোটমাটগুলোর একটাও অদৃশ্য হয়নি।

যতীন বললে, 'নিশ্চয়ই চোর এসেছিল। ভাগ্যে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল, তাই চুরি করবার আগেই তাকে সরে পড়তে হয়েছে। বড্ড বেঁচে যাওয়া গেছে হে !'

আমি বললুম, 'জানলাগুলো সব বন্ধ করে দাও, আর আলো নিবিয়েও কাজ নেই। আচ্ছা জ্বালাতন !'

আবার খানিকক্ষণ বসে বসে গল্প হল। তারপর আবার দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

কিন্তু আবার ঘুম গেল ভেঙে।

এবারে কেউ আর আমাকে ধাক্কা মারছিল না, এবারে কামরার ভিতর থেকে পরিত্রাহি স্বরে একটা কুকুর আর্তনাদ করছিল।

আলো জ্বালিয়ে শুয়েছিলুম, কিন্তু উঠে দেখি, কামরার ভিতরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

অন্ধকারে যতীনের গলা পেলুম, সে বললে, 'এ আবার কি ব্যাপার! আজ কি রাজ্যের আপদ এইখানেই এসে জুটেছে?'

কুকুরটা যেভাবে চ্যাঁচাচ্ছে তাতে মনে হল, সে যেন ভয়ানক জখম হয়েছে। কিন্তু কামরার জানলা-দরজা সব বন্ধ, সে ভিতরে এলই বা কেমন করে?

কুকুরটা হঠাৎ একবার খুব জোরে কেঁউ-কেঁউ করে চেঁচিয়েই একেবারে চুপ মেরে গেল।

আমি বললুম, 'যতীন, আলো নেবালে কে?'

যতীন বললে, 'জানি না তো! আমি ভাবছিলুম, তুমিই নিবিয়েছ।'

—'কুকুরটা ভিতরেই আছে। বেঞ্চি থেকে পা নামানো হবে না, ব্যাটা যদি খ্যাঁক্ করে কামড়ে দেয়! তোমার টর্চটা কোথায়?'

—'আমার পাশেই আছে।'

—'জ্বেলে দেখ তো, কুকুরটা কোথায় আছে?'

যতীন টর্চ জ্বেলে দেখতে লাগলো, আর আমি আমার মোটা লাঠিগাছটা মাথায় তুলে প্রস্তুত হয়ে রইলুম, কুকুরটা যদি তেড়ে আসে তাহলে তখনি তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেব।

কিন্তু কামরার কোথাও কুকুরটাকে আবিষ্কার করা গেল না! এখানে কুকুর-টুকুর কিছুই নেই।

'সুইচে'র কাছে গিয়ে দেখি, 'সুইচ্' টেপাই আছে।

আমি বললুম, 'সম্ভব। কিন্তু এই যে এখনি কুকুরটা চ্যাঁচাচ্ছিল সে এলই বা কেমন করে আর গেলই বা কেমন করে?'

যতীন বললে, 'কুকুরটা বোধহয় পাশের কামরা থেকে চ্যাঁচাচ্ছিল। আমরা ঘুমের ঘোরে ভুল শুনেছি।'

আমি বললুম, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু আজকে ঘুমের দফায় ইতি। এস, বসে বসে গল্প করা যাক।'—এই বলে আমি বসে পড়লুম—

এবং মনে হল, সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশেই ঠিক যেন আর একজন কে বসে পড়ল।

নিবিড় অন্ধকারে কামরার ভিতরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

বললুম, 'নিজের বিছানা ছেড়ে হঠাৎ উঠে এলে যে যতীন?'

ওপাশের বেঞ্চি থেকে যতীন বললে, 'কৈ, আমি তো এখান থেকে উঠিনি!'

আমার পাশে হাত বাড়িয়ে দেখলুম, কৈ, কেউ তো সেখানে নেই!

তারপরেই শুনতে পেলুম, আমার কানে কি ফিসফিস করে কথা কইছে। কি যে বলছে, তা বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু কথা যে কেউ কইছে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

হঠাৎ যতীন বললে, 'মোহন, তুমি কোথায়?'

আমি আড়ষ্টভাবে বললুম, 'আমার বিছানায়।'

যতীন সভয়ে বললে, 'তবে আমার কানে কানে কথা কইছে কে?'

জবাব না দিয়ে দু-পাশে দু-হাত বাড়িয়ে দিলুম, কিন্তু কারুর গায়ে হাত লাগল না। অথচ তখনো আমার কানের কাছে মুখ এনে কে ফিসফিস করছে।

ডাক্তারি পড়ি, রোজ দু-হাতে টাটকা বা পচা মড়ার দেহে হাসিমুখে ছুরি চালাই, গভীর রাত্রে একলা মড়ার পাশে অম্লানবদনে বসে থাকি, স্বপ্নেও-কখনো ভূত দেখিনি, তবু কেন জানি না, আজকে এই অন্ধকারে আমার সর্বাঙ্গ কি একটা অজানা ভয়ে পাথরের মূর্তির মত স্থির ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল,—একখানা হাত নাড়বার শক্তিও আর রইল না।

যতীনেরও বোধহয় সেই অবস্থা। সে প্রায় কান্নার স্বরে বললে, 'মোহন, মোহন, কামরার ভেতরে কারা সব এসেছে, কে আমার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা কইছে,—ঐ শোনো, কে আবার চলে বেড়াচ্ছে!'

সত্যি কথা! ঘরময় কে চলে বেড়াচ্ছে, খট্ খট্ খট্ খট্, খড়্মড়্ খড়্মড়্ খড়্মড়্! এ যেন কোন মাংসহীন হাড়ের আওয়াজ!

এ ভীষণ আওয়াজ আমি জানি, কঙ্কালকে নাড়লে ঠিক এমনি অস্থি-ঝঙ্কার জেগে ওঠে।

কিন্তু তখন আর আমার নড়বার শক্তি নেই, কে যেন কি যাদু মন্ত্র পড়ে আমার সমস্ত দেহকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছে! আচম্বিতে আর এক ব্যাপার! কামরার এক কোণ থেকে মেয়ে-গলায় কে উঁ-উঁ-উঁ-উঁ করে কাঁদতে লাগল!

কানের কাছে সেই ফিস্‌ফিস্ কথা, ঘরময় কঙ্কালের সেই চলা-



কী ও-দুটো? অন্ধকারের অগ্নিময় চক্ষু?

ফেরার খট্‌খটানি, এককোণ থেকে মেয়ে-গলায় সেই উঁ-উঁ-উঁ-উঁ করে কান্না—গাঢ় অন্ধকারে ডুবে, আড়ষ্টভাবে বসে বসে একসঙ্গে এইসব শুনতে লাগলুম। যতীনের কোন সাড়া নেই, সে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়নি তো?

ও আবার কি? মার্বেলের গুলির মত দুটো জ্বলন্ত রক্তের মত কি চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে! কী ও-দুটো? অন্ধকারের অগ্নিময় চক্ষু?

চোখ দুটো। ভাসতে ভাসতে আমার কাছ থেকে হাত তিনেক তফাতে এসে শূন্যে স্থির হয়ে রইল। যেন আমাকে খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করছে। দেখতে দেখতে সেই আগুন-চোখ দুটোর রং নীল হয়ে এল। রক্ত-রঙে যে চোখ দুটোকে দেখাচ্ছিল ক্রুদ্ধ, নীল-রঙে তাদের দেখাতে লাগল বিষাক্ত।

হঠাৎ কেমন-একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ এসে আমাকে চাঙ্গা করে দিলে। এক মুহূর্তে আমার সব মোহ কেটে গেল—আমি একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে, অন্ধকারের ভিতরেই দু-হাতে দুদ্দাড় ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলুম—'আমি তোদের ভয় করি না, আমি তোদের ভয় করি না, আমি তোদের কারুকে ভয় করি না, সরে যা, সরে যা সব—আমি তোদের কারুকে ভয় করি না।'

তৎক্ষণাৎ কামরার ইলেকট্রিক লাইট আবার দপ্‌ করে জ্বলে উঠল।

নিজের বিছানায় বসে যতীন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। তারও অবস্থা আমার চেয়ে ভালো নয়।

কামরার ভিতরে আর সেই আগুন-চোখ দেখা গেল না—কোন-রকম শব্দ বা কান্নার আওয়াজও কানে এল না। আমরা দুজন ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই।

হাঁপাতে হাঁপাতে যতীনের পাশে গিয়ে বসে পড়লুম।

যতীন অস্ফুট স্বরে বললে, 'আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলুম?'

আমি বললুম, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

একদিকে তাকিয়ে যতীন তীব্র স্বরে বলে উঠল, 'না, স্বপ্ন নয়,—ঐ দেখ!'

ঠিক যেন শূন্যকে বিদীর্ণ করে ফিন্‌কি দিয়ে কামরার মেঝের উপরে রক্ত ছিটকে পড়ছে! তাজা, রাঙা রক্ত! রক্তে রক্তে ঘর বুঝি ভেসে যায়! শূন্য যেন রক্ত প্রসব করছে!

আমি আর সইতে পারলুম না—'অ্যালার্ম-কর্ড' ধরে একেবারে ঝুলে পড়লুম।

পরমুহূর্তে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়ে চলন্ত ট্রেন থেমে গেল।

আমি আর যতীন এক এক লাফে ট্রেন ছেড়ে বাইরে গিয়ে পড়লুম।

গার্ড এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমরা ট্রেন থামিয়েছ?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

—'কেন?'

—'গাড়ীর ভেতরে আমাদের জীবন বিপন্ন হয়েছিল। আসল ব্যাপারটা কি, তা আমি বলতে চাই না। কিন্তু ও-কামরার ভেতরে আমরা যদি আর কিছুক্ষণ থাকতুম, তাহলে হয় পাগল হয়ে যেতুম, নয় মারা পড়তুম।'

গার্ড খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, 'বাবু, তোমার অসংলগ্ন কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলুম না। তুমি কি বলতে চাও, ভালো করে বুঝিয়ে বল।'

যতীন বললে, 'ও-কামরায় ভূত আছে!'

গার্ড হো হো করে হেসে বললে, 'কামরায় ভূত? এ একটা নতুন কথা বটে! বাঙালী-বাবুদের মাথা খুব সাফ্, ট্রেনের কামরাতেও তারা ভূত আবিষ্কার করে!'

আমি বললুম, 'ভূত কিনা জানি না, কিন্তু ও-কামরার ভেতরে আমরা এমন সব বিভীষিকা দেখেছি, যা স্বাভাবিক নয়।'

গার্ড বললে, 'অ্যালার্ম-কর্ড টেনে, বাজে কথা বলে তোমরা এখন আইনকে ফাঁকি দিতে চাও? ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না, তোমাদের জরিমানা দিতে হবে।'

আমি বললুম, 'সাহেব, আমরা জরিমানা দিতে রাজি আছি, তবু ও-কামরায় আর ঢুকতে রাজি নই।'

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল! কামরার ভিতর থেকে আমাদের জিনিসপত্তরগুলো সবেগে বাইরে নিক্ষিপ্ত হতে লাগল—ট্রাঙ্ক, সুট্‌কেশ, ব্যাগ ও পোঁট্‌লা-

পুঁট্‌লী প্রভৃতি। ঠিক যেন কে সেগুলোকে বাইরে ছুঁড়ে দিচ্ছে! গার্ড-সাহেব মাথা হেঁট করে তাড়াতাড়ি মাটির উপরে বসে পড়ল—নইলে যতীনের স্টীলট্রাঙ্কটা নিশ্চয়ই তার মাথা চূর্ণ করে দিত।

গার্ড চ্যাঁচাতে লাগল, 'এই, পাকৃড়ো—পাকৃড়ো!'

একদল রেল-পুলিশ ও কুলি হুড়মুড় করে কামরার ভিতরে গিয়ে ঢুকল এবং বলা বাহুল্য, সেখানে জনপ্রাণীর আধখানা টিকি পর্যন্ত দেখা গেল না।

গার্ড উত্তেজিত, ভীত কণ্ঠে আমাদের বললে, 'বাবু, ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না। ট্রেন লেট্ হয়ে যাচ্ছে, এখন আর বোঝবার সময়ও নেই—তবে তোমাদের কথাই সত্যি বলে মনে হচ্ছে। আপাততঃ তোমরা অন্য কোন কামরায় উঠে পড়, আমি ট্রেন চালাবার হুকুম দেব।'

পাশের যে 'ইন্টার-কেলাসে' গিয়ে আমরা উঠলুম, তার মধ্যে অনেক লোক,—সকলেই আমাদের কথা শোনবার জন্যে ব্যগ্র।

যতটা সংক্ষেপে পারা যায়, তাদের কাছে আমাদের বিপদের কাহিনী বর্ণনা করলুম।

একটি আধ-বুড়ো ভদ্রলোক, পোশাক দেখে তাঁকে রেলকর্মচারী বলে চেনা গেল, আমাদের কাছে এসে বললেন, 'মশাই, গেল বৎসরে এই ট্রেনের এক কামরায় একটা ভীষণ হত্যাকাণ্ড হয়েছিল।'

আমি বললুম, 'তার সঙ্গে এ-ব্যাপারের কি সম্পর্ক?'

—'সম্পর্ক? সম্পর্ক হয়তো কিছুই নেই, তবু শুনুন না। রাণীগঞ্জে গাড়ী থামলে পর দেখা গেল, একটা সেকেণ্ড কেলাস কামরার ভিতরে দুজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক, একটি শিশু আর একটা কুকুরের মৃতদেহ রক্তের মধ্যে প্রায় ডুবে আছে। কিন্তু কে বা কারা এতগুলো প্রাণীকে খুন করলে, তার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।'

আমি রুদ্ধশ্বাসে বললুম, 'একটা কুকুরও ছিল?...তারপর?'

—'তার কিছুদিন পরে ঐ কামরাতেই তিনজন সায়েব হাওড়া

থেকে আসছিল। কিন্তু রাণীগঞ্জেই তারা গাড়ী থেকে নেমে পড়ে স্টেশন-মাষ্টারের কাছে অভিযোগ করে যে, কামরার আলো নিবিয়ে দিয়ে কারা তাদের ভয়ানক ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু অনেক খোঁজা-খুঁজির পরেও যারা ভয় দেখিয়েছিল তাদের পাত্তা পাওয়া গেল না।'

যতীন বললে, 'ভূতকে কখনো খুঁজে পাওয়া যায়? মানুষকেই ভূতেরা খুঁজে বার করে।'

তিনি বললেন, 'তারপর প্রায়ই ঐরকম সব অভিযোগ হতে লাগল। আর লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অভিযোগ হয়েছে প্রত্যেকবারই রাণীগঞ্জ স্টেশনে,—কেবল আপনারাই রাণীগঞ্জ পার হতে পেরেছেন।'

যতীন বললে, 'হ্যাঁ, রাণীগঞ্জ কেন, আর-একটু হলেই আমাদের ভবনদীর পারে যেতে হত।'

আমি বললুম, 'যতীন, মায়ের কথা আর কখনো ঠেলব না। সত্যিসত্যিই আজকের যাত্রা অশুভ।'

মূর্তি

পাহাড়ের ছায়াকে আরো কালো করে রাত্রি ঘনিয়ে এল।

আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে একদল যাত্রী এগিয়ে চলেছে। গরম পোশাকে সকলের আপাদমস্তক মোড়া,—কারণ কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস হু-হু করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে।

একে ঘন কুয়াশা, তার উপরে আবার রাতের অন্ধকার। তবু তারই ভিতরে কোনরকমে চোখ চালিয়ে দূরের সরাইখানার মিট্‌মিটে আলো দেখে পথিকদের ক্লান্ত, শীতার্ত মন খুসি হয়ে উঠল।

খানিক পরেই সকলে সরাইখানার দরজার সামনে এসে হাজির হল।

যার সরাই সে বেরিয়ে এল। পথিকদের কথা শুনে বললে,

'বড়ই মুস্কিলের কথা। আমার সরাইয়ের সব ঘরই যে আজ ভরতি হয়ে গেছে।···তবে হ্যাঁ, আপনারা যদি আমার ঢেঁকিশালায় শুয়ে আজকের রাতটা কাটাতে রাজি হন, তাহলে আমি সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

পথিকরা পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখলে। হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কোনও উপায় তো নেই! এই রাতে এই শীতে এই আঁধারে, বাইরের জনমানবশূন্য মাঠ বা জঙ্গলের চেয়ে সরাইয়ের ঢেঁকিশালাও ঢের ভালো।

সরাইয়ের কর্তা তাদের সকলকে নিয়ে ঢেঁকিশালায় গিয়ে ঢুকল। মস্ত ঘর—একদিকে একখানা বড় পর্দা ঝুলছে।

সকলে মিলে খেয়ে-দেয়ে হাসি আমোদ করে যে যার লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

যাত্রীদের ভিতরে একজন ছিল, তার নাম ওয়াংফো।

সঙ্গীদের বিষম নাক-ডাকুনি ও ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুরের ছুটোপুটি ওয়াংফোর চোখ থেকে আজ ঘুম কেড়ে নিলে।

নাচার হয়ে শেষটা সে উঠে বসল। লণ্ঠন জ্বেলে একখানা বই বার করে পড়াশুনায় আজকের রাতটা সে কাটিয়ে দেবে বলে স্থির করলে।

কিন্তু পড়াতেও তার মন বসল না। নিশুত রাত, বাইরের গাছপালার ভিতরে বাতাসও যেন নিবিড় অন্ধকারে ভয় পেয়ে স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে আছে।

অত বড় ঘরে ওয়াংফোর ছোট্ট লণ্ঠনটা টিম্‌টিম্ করে জ্বলছে—সে যেন তার আলো দিয়ে অন্ধকারকেই আরো ভালো করে দেখাতে চায়!

ক্রমে ওয়াংফোর গা যেন ছম্‌ছম্ করতে লাগল। তার মনে হল, ঘরের ওদিককার অন্ধকার যেন কি একটা ভীষণ আকার ধারণ করবার চেষ্টা করছে! অন্ধকার যেন পাক খাচ্ছে! ধড়্‌ফড়্ করে নড়ছে!

হঠাৎ ওয়াংকোর আবার মনে হল, পর্দার পিছনে যেন কাঠের কি একটা মড়্‌মড়্‌ করে ভেঙে গেল। তারপরেই পর্দাখানা একটু দুলে উঠল! তারপরেই আবার সব নিসাড়।

এসব কী কাণ্ড! ওয়াংফো আর বই পড়বার চেষ্টা করলে না। আড়ষ্ট হয়ে পর্দার পানে চেয়ে রইল, খালি চেয়েই রইল—তার চোখে আর পলক পড়ল না।

পর্দাখানা আস্তে আস্তে একটু উপরে উঠল এবং তার পাশ থেকে বেরিয়ে এল একখানা রক্তহীন হলদে হাত! তারপর কি যেন ছায়ার মত একটা-কিছু বাইরে এসে দাঁড়াল—সে যেন বাতাস-দিয়ে-গড়া কোন মূর্তি!

ওয়াংফোর গায়ে তখন কাঁটা দিয়েছে, মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে! সে চ্যাঁচাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না—কিন্তু তার হয়ে বাইরে থেকে একটা প্যাঁচা চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে রাতের আঁধারকে চিরে যেন ফালাফালা করে দিলে।

ধীরে ধীরে সেই বাতাস-দিয়ে-গড়া মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠল! ওয়াংফো তখন দেখলে, পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্ত্রীলোকের মূর্তি!

মূর্তিটা ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

যাত্রীরা পাশাপাশি শুয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে, কে যে এখন তাদের ক্ষুধিত দৃষ্টি দিয়ে দেখছে, সেটা তারা টেরও পেলে না।

মূর্তি পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। তারপর একজন যাত্রীর মুখের কাছে হেঁট হয়ে পড়ে কি যে করলে, তা কিছুই বোঝা গেল না।

মূর্তি দ্বিতীয় যাত্রীর কাছে এসে দাঁড়াল। তার চোখ দুটো দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে এবং মুখখানা এক ভয়ানক হাসিতে ভরা!

মূর্তি আবার হেঁট হয়ে পড়ল এবং দ্বিতীয় যাত্রীর টুঁটি কামড়ে ধরল।

ওয়াংফো আর পারলে না, বিকট চীৎকার করে উঠে দাঁড়াল এবং তীরবেগে ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

পথ দিয়ে ওয়াংফো চীৎকারের পর চীৎকার করতে করতে ছুটতে লাগল—তার সেই কান-ফাটানো চ্যাঁচানির চোটে গাঁয়ের ঘরে ঘরে সকলকার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু এ রাতে বাইরে এসে কেউ যে তাকে সাহায্য করবে, গাঁয়ের ভিতরে এমন সাহসী লোক কেউ ছিল না।

ছুটতে ছুটতে এবং চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ওয়াংফো একেবারে গাঁয়ের শেষে গিয়ে পড়ল। তারপরেই মাঠ আর জঙ্গল।

দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে একবার পিছন ফিরে চাইলে। দূরের গাঢ় অন্ধকার ফুঁড়ে ছুটো জ্বল্‌-জ্বলে আগুনের ভাঁটা বেগে এগিয়ে আসছে, ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে আসছে!

ওয়াংফো আর একবার খুব জোরে আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

চীনদেশে নিয়ম আছে, কেউ মরলে পর ভালো দিন-ক্ষণ না দেখে তার দেহকে কবর দেওয়া হয় না।

গাঁয়ের মোড়লের এক মেয়ে মারা পড়েছিল। কিন্তু ভালো দিন-ক্ষণের অপেক্ষায় তার দেহকে কফিনে পুরে সরাইখানার ঢেঁকি-শালে রাখা হয়েছিল। আজ ছয়মাসের ভিতরে ভালো দিন পাওয়া যায়নি।

সরাইখানার কর্তা সকালে উঠে যাত্রীদের খোঁজে ঢেঁকিশালায় গিয়ে দেখে, তুজন যাত্রী মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। তাদের গলায় এক-একটা গর্ত, তাদের দেহে এক ফোঁটা রক্ত নেই!

পর্দা তুলে সভয়ে সে দেখলে, যে-কফিনে গাঁয়ের মোড়লের মেয়ের মড়া ছিল, তার তালা খোলা, তার ভিতরে মড়া নেই!

তারপর গোলমাল শুনে গাঁয়ের প্রান্তে গিয়ে সে দেখলে, ওয়াংফোর মৃতদেহের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে—মোড়লের মেয়ের মড়া! ওয়াংফোর গলায় একটা গর্ত আর মড়ার মুখে লেগে আছে চাপ চাপ রক্ত!

কী?

লোকে বলত, আটাশ নম্বর হরি বোস স্ট্রীটে যারা বাস করে, তাদের সবাই মানুষ নয়।

আমি কিন্তু মানুষ। এবং ঐ মেস-বাড়ীতে আর যাদের সঙ্গে বাস করছি, তারাও আমারই মতন মানুষ।

এর ওর তার কাছে জিজ্ঞাসা করেও সন্দেহজনক বেশীকিছু জানতে পারিনি। রাত্রে মাঝে মাঝে নাকি কোন কোন ঘরের দরজা অকারণে খুলে যায়। সিঁড়ির উপরে কাদের পায়ের শব্দ হয়। অন্ধকারে কারা যেন ফিস্‌ফিস্ করে কথা কয়।

এসব যে ভূতের কীর্তি, মেসের অন্যান্য লোকরাও জোর করে তা বলতে পারলে না। বাজে ভ্রম হতেও পারে, কারণ কেউ চোখে কিছু দেখেনি।

সেদিনটা ছিল মেঘলা। পূর্ণিমাতেও চাঁদ পেয়েছিল ছুটি। বৃষ্টিজল বারবার আকাশের অন্ধকারকে ধুয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু মুছে দিতে পারছিল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর বসে বসে ভূতের গল্পই হচ্ছিল।

কাহিনীটা রোমাঞ্চকর হলেও নাকি সত্য—কিন্তু গল্প যিনি বলছিলেন, গল্পের ভূতটাকে তিনি স্বচক্ষে দেখেননি—সচরাচর যা হয়ে থাকে। সত্য ভূতের গল্পই শোনা যায়, কিন্তু সত্য ভূত চোখে কেউ দেখে না।

ভূত সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, কিন্তু ভূতের গল্প শুনলে মনটা কেমন ভারি হয়ে ওঠে। আমি ভূত মানি না। ভূত কখনো দেখিনি, দেখবার আশাও রাখি না। তবু সেদিন রাতে ঘরের আলো নিবিয়ে যখন বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম, তখন বুকের কাছটা কেমন ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করতে লাগল। মনে হল, ঘরের থমথমে

অন্ধকার যেন কেমন একটা অস্বাভাবিক ভয়ে ছমছমে হয়ে আছে।

খাটের উপরে অনেকক্ষণ ধরে এপাশ-ওপাশ করলুম, তবু চোখে ঘুম নেই। এমন সময়ে একটা ভয়ানক কাণ্ড হল। ঠিক যেন কড়িকাঠ থেকে আমার বুকের উপরে কি একটা খসে পড়ল··· একটা হাত-পা-ওয়ালা জীব! দুহাতে সে আমার গলা চেপে ধরলে!···কুকুর নয়, বিড়াল নয়,—কী এটা? মানুষ? কড়িকাঠ থেকে পড়ল মানুষ!

কাপুরুষ নই। কিন্তু তবু আমি আতঙ্কে আঁৎকে উঠলুম। দুখানা হাড়-কঠিন হাত আমার গলা টিপে ধরেছে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমিও প্রাণপণে তাকে চেপে ধরলুম। সে আমার গলা ছেড়ে দিলে বটে, কিন্তু ভীষণ বিক্রমে আমার সঙ্গে লড়তে লাগল। কখনো আঁচড়ায়, কখনো কামড়ায়, কখনো আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনুভবে বুঝলুম, জীবটা একেবারে উলঙ্গ!

সবাই জানে, আমি খুব বলবান ব্যক্তি। কিন্তু সেই অজানা জীবটাকে কায়দায় আনতে গিয়ে আমার প্রাণ যেন বেরিয়ে যাবার মত হল। অনেকক্ষণ যোঝাযুঝির পর আমি যখন প্রায় কাবু হয়ে পড়েছি, তখন টের পেলুম যে, সেও ফোঁস্ ফোঁস্ করে বেজায় হাঁপাচ্ছে। তখন উৎসাহিত হয়ে আমি দ্বিগুণ বিক্রমে তার বুকের উপরে দুই হাঁটু দিয়ে চেপে বসলুম।

তারপর এক হাতে তার গলা টিপে ধরে আর এক হাতে 'বেড্ সুইচ্'টা টিপে দিলুম।

কিন্তু আলো-জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে যা দেখলুম, শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না!

এখনো সে-মুহূর্তের কথা ভাবলে প্রাণ আমার শিউরে ওঠে!

আলো জ্বেলে বিছানার উপরে আমি কিছুই দেখতে পেলুম না!

কিছুই নেই—কিছুই নেই, তবে আমি কাকে চেপে ধরে আছি? কে আমার সর্বাঙ্গ আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত করে

দিচ্ছে, আমার দু-হাতের ভিতরে এমন ছট্‌ফট্‌ করছে? এর দেহ তপ্ত, মাংসল, এর হৃৎপিণ্ড ধুক্‌পুক্‌ করছে, এর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে—অথচ আমার চোখের সামনে কিছুই নেই,—কোন অস্পষ্ট ছায়া বা ধোঁয়াটে রেখা পর্যন্ত নয়।

এতক্ষণ পরে মহা ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠলুম। একবার নয়, দু-বার নয়,—বার বার! এ ব্যাপারের পর চীৎকার না করে থাকা যায় না।

পাশের ঘরে থাকত আমার বন্ধু মহিম। সে তাড়াতাড়ি ছুটে এল।

আমার মুখ নিশ্চয়ই ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল, কারণ ঘরে ঢুকেই সে বলে উঠল, 'নবীন, নবীন! ব্যাপার কি? তুমি ও-রকম হয়ে গেছ কেন?'

—'মহিম! কে আমাকে আক্রমণ করেছে—আমি একে চেপে ধরে আছি, কিন্তু আমি একে দেখতে পাচ্ছি না।'

হো-হো করে কারা হেসে উঠল! ফিরে দেখি, আমার চীৎকারে মেসের সবাই ঘরের ভিতরে ছুটে এসেছে। আমার কথা শুনে তারাই হাসছে। তারা ঠাউরেছে, আমার মাথা হঠাৎ বিগড়ে গেছে।

মহিম বললে, 'নবীন, আজ কি তুমি সিদ্ধি-টিদ্ধি কিছু খেয়েছ?'

আমি সকাতরে বললুম, 'দোহাই তোমার, আমার কথায় বিশ্বাস কর! দেখছ না, আমার গা দিয়ে রক্ত ঝরছে? দেখছ না, এর ধাক্কায়, আমার দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে?…আচ্ছা, এতেও যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে তুমি নিজেই এদিকে এস। এর গায়ে হাত দিয়ে দেখ!'

মহিম এগিয়ে এল। তারপর আমার নির্দেশ অনুসারে এক জায়গায় হাত দিয়েই তীব্র চীৎকার করে উঠল। মহিম একে ছুঁয়েছে!

আমি যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে বললুম, 'মহিম, আমি আর একে ধরে রাখতে পারছি না। এর জোর যেন ক্রমেই বেড়ে উঠছে। ঘরের ঐ কোণে একগাছা দড়ি পড়ে আছে। শীগ্‌গির দড়িগাছা নিয়ে

এস,—আমাকে সাহায্য কর!'

মহিম আর আমি দড়ি দিয়ে সেই অদৃশ্য জীবটাকে বাঁধতে লাগলুম। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য—শূন্যতার চারিদিকে দড়ি জড়ানো!

ঘরের ভিতরে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারা ভাবলে আমরা কোন কৌতুক-অভিনয় করছি।

বাড়ীওয়ালা বললে, 'এই পাগলামি দেখাবার জন্যে কি তোমরা রাত দুটোর সময়ে আমাদের ঘুম ভাঙালে?'

আমি রেগে বললুম, 'পাগলামি? যার খুসি হয় এসে এর গায়ে হাত দিয়ে দেখুক না!'

কিন্তু সে পরীক্ষাতেও কেউ রাজি হল না। তবু তারা আমাদের কথায় বিশ্বাস করলে না। বাড়ীওয়ালা বললে, 'জ্যান্ত জীব, অথচ দেখা যায় না, এ কেমন গাঁজাখুরি কথা!'

আমি আর মহিম তখন একসঙ্গে দড়ি ধরে সেই অদৃশ্য জীবটাকে টেনে তুললুম। তারপর দু-একবার তাকে শূন্যে দুলিয়ে দড়িগাছা ছেড়ে দিলুম, একটা ভারি জিনিস পড়লে যেমন হয়,—ধপাস্ করে একটা শব্দ হল, বালিস ও বিছানার মাঝখানটা নেমে গেল এবং খাটের কাঠ মচ্‌মচ্ করে আর্তনাদ করে উঠল!

পর-মুহূর্তে ঘরের ভিতরে আর জনপ্রাণী রইল না—বিষম ভয়ে সকলেই হুড়্‌মুড়্ করে বেগে পলায়ন করল!

বিছানার উপরে পড়ে সে ছট্‌ফট্ করছে আর তার ছট্‌ফটানির চোটে বিছানার চাদরখানা কুঁচকে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে!

মহিম বললে, 'নবীন, এ দৃশ্য চোখে দেখতেও আমার ভয় হচ্ছে!'

—'আমারও।'

—'কিন্তু ব্যাপারটা যে একেবারেই ধারণাতীত, তাও বলতে পারি না।'

—'তুমি কী বলছ হে? এর চেয়ে ধারণাতীত ব্যাপার আর কি

হতে পারে? পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর কখনো ঘটেছে?'

—'আচ্ছা, ভালো করে ভেবে দেখ। আমাদের সামনে একটা বস্তু রয়েছে, অথচ আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। বাতাসকেও আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তাকে আমরা ছুঁতে পারি। বাতাসের অস্তিত্ব কি আমরা অস্বীকার করি?'

—'কিন্তু এ যে জীবন্ত! এর বুকে হাত দিলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করবে!'

—'নবীন, তুমি প্রেত-চক্রের কথা শুনেছ তো? সেখানে এমন সব প্রেতের আবির্ভাব হয়, যাদের দেখা যায় না, কিন্তু ছোঁয়া যায়!'

—'মহিম, মহিম! তুমি কি তবে বলতে চাও, আমরা একটা প্রেতকে গ্রেপ্তার করেছি?'

—'আমি এখন কিছুই বলতে চাই না। তবে ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত না দেখে আমি ছাড়ব না। দেখ, বিছানা আর তোলপাড় হচ্ছে না। নিঃশ্বাসের শব্দও হচ্ছে, আস্তে আস্তে। বন্দী বোধহয় ঘুমোচ্ছে!'

সে রাত্রে কিন্তু আর আমাদের ঘুম হল না—এর পরেও কি কারুর চোখে আর ঘুম আসে?

...পরদিন সকালবেলায় আমাদের মেস-বাড়ীর সামনে শহর যেন ভেঙে পড়ল। সকলেরই মুখে এক জিজ্ঞাসা—যাকে আমরা পাকড়াও করেছি, সেটা কী? কিন্তু যা-কিছু প্রশ্ন হচ্ছে, সবই ঘরের বাইরে থেকে, ঘরের ভিতরে ভরসা করে কেউ পা বাড়াচ্ছে না!

তার আকার কি-রকম সেটা জানবার জন্যে মন ব্যস্ত হয়ে উঠল। সাবধানে (পাছে কামড়ে দেয়) তার গায়ে হাত বুলিয়ে যা বুঝেছি—মানুষের মত; নাক, চোখ, মুখ; মাথায় চুল নেই; হাত আর পাও মানুষের মত; লম্বায় তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালকের মত।

পরের দিন সন্ধ্যার আগেই মেসের সমস্ত ভাড়াটে তল্পীতল্পা গুটিয়ে সরে পড়ল।

বাড়ীওয়ালা এসে বললে, 'ও-আপদকে আমার বাড়ীতে আমি

রাখব না। তোমরা যদি রাখতে চাও তো আমি তোমাদের নামে নালিশ করব।'

আমি বললুম, 'ইচ্ছে করলেই তুমি একে বিদায় করতে পারো। আমাদের কোন আপত্তি নেই।'

কিন্তু তাকে বিদায় করতে রাজি আছে টাকার লোভ দেখিয়েও এমন লোক খুঁজে পাওয়া গেল না।

সেইখানে বন্দী হয়ে সে দিনের পর দিন ধড়্‌ফড়্‌ করতে লাগল।

হপ্তাখানেক পরে মহিম একদিন হঠাৎ বললে, 'আমাদের বন্দীর চেহারা কি-রকম তা জানবার এক উপায় আমি আবিষ্কার করেছি।'

—'কি, কী উপায়?'

—'ওর দেহ যখন স্পর্শ করা যায়, তখন "প্যারিস-প্ল্যাষ্টার" দিয়ে অনায়াসেই ওর ছাঁচ্‌ তোলা চলবে।'

—'ঠিক বলেছ? কিন্তু সে-সময়ে ও যদি ছট্‌ফট্‌ করে, তাহলে তো ছাঁচ্‌ উঠবে না।'

—'নবীন, তুমি তো ডাক্তারি শিখছ। ওকে "ক্লোরোফর্ম" দিয়ে তুমি তো খুব সহজেই অজ্ঞান করে ফেলতে পারো। তাহলে ছাঁচ্‌ তুলতে আর কিছুই বাধা হবে না।'

মহিমের বুদ্ধি খুব সাফ্‌। তারই কথামত কাজ করা গেল। ছাঁচ্‌ও উঠল।

উঃ, সে কী বিদ্‌কুটে চেহারা! মানুষের মতন গড়ন বটে, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর মূর্তি! চোখ দুটো গোল ভাঁটার মত, নাকটা ছুঁচোলো ও বাঁকা, ঠোঁট পুরু পুরু ও উল্টানো, দাঁতগুলো বড় বড়, হিংস্র জানোয়ারের মত—ঠিক যেন পিশাচের মুখ, যেন মানুষের রক্ত-মাংস খাওয়াই তার অভ্যাস!

…এখন এই ভয়াবহ জীবকে নিয়ে কি করা যায়? একে বাড়ীর ভিতরে রাখাও চলবে না, ছেড়ে দেওয়াও অসম্ভব। ছাড়া পেলে এ পৃথিবীর কত মানুষের ঘাড় মটকাবে, তা কে বলতে পারে?

তবে কি করব আমরা? একে হত্যা করে সকল আপদ চুকিয়ে দেব? না, তাও সম্ভব নয়। এর গড়ন যে মানুষের মত!

প্রতিদিনই এইসব কথা আমাদের মনে হয়।

সেই অদ্ভুত অদৃশ্য জীবের খাদ্য যে কি, তাও বোঝা গেল না। সকলরকম খাবারই তার সামনে রেখে দি, কিন্তু সে কিছুই ছোঁয় না।

পনেরো দিন কেটে গেল, তবু অনাহারে সে মরল না। তখনো ছাড়ান্ পাবার জন্যে সে গড়াগড়ি দিয়ে ও ছট্‌ফট্ করে সারা বিছানা তোলপাড় করে তুলছে!

কিন্তু তারপরে ধীরে ধীরে তার ছট্‌ফটানি কমে এল।

বিশদিন পরে দেখা গেল, তার হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হয়ে গেছে। হাত দিয়ে বুঝলুম, তার দেহ কঠিন, আড়ষ্ট ও ঠাণ্ডা। সে মরেছে। কিন্তু কি সে? একি সেই অদৃশ্য জগতের কেউ, যে-জগতের বাসিন্দারা মানুষকে রাত্রে এসে ভয় দেখায় এবং আমরা যাদের প্রেত বলে মনে করি?

ওলাইতলার বাগানবাড়ী

স্টেশন-মাষ্টার তাঁর লণ্ঠনটা আমার মুখের সামনে তুলে ধরলেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, 'ওলাইতলার বাগানবাড়ী!...আপনিও ওলাইতলার বাগানবাড়ীতে যাচ্ছেন?...কিন্তু, কেন?'

—'মামুদপুরের জমিদার কৃতান্ত চৌধুরী বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাঁর একজন ম্যানেজার দরকার।'

—'তিনশো টাকা মাহিনা। কেমন, তাই নয় কি?'

—'হুঁ।'

—'তারাও এই কথা বলেছিল।'

—'কারা!'

—'আপনার আগে যারা ম্যানেজারি করতে এসেছিল। গেল আট হপ্তায় আটজন লোক এই ইষ্টিশানে নেমে ওলাইতলার

বাগানবাড়ীতে গেছে। কিন্তু তারা কেউ আর এ পথ দিয়ে ফেরেনি।
…বুঝলেন মশাই? তারা কেউ আর ফেরেনি।'

—'তার মানে?'

—'মানেটানে জানি নে। প্রত্যেকেই এসেছে আপনার মত ঠিক শনিবারেই। আর ঠিক সন্ধ্যা ছয়টার গাড়ীতে।…আশ্চর্য কথা। আট হপ্তায় আট জন। জমিদার কৃতান্ত চৌধুরীর কত ম্যানেজারের দরকার?'

আমার মনটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। শুধালুম, 'আচ্ছা, এই জমিদারবাবুকে আপনি চেনেন?'

—'উঁহু। তবে তাঁর নাম শুনেছি। অল্পদিন হল এখানে এসে ঐ পোড়ো বাগানবাড়ীখানা কিনে তিনি বাস করছেন। তাঁর সম্বন্ধে নানান কানাঘুষো শুনছি। আজ পর্যন্ত গাঁয়ের কেউ তাঁকে দেখেনি। দিনের বেলায় ঐ বাগানবাড়ীখানা পোড়ো বাড়ীর মত পড়ে থাকে। কেবল রাত্রেই তার ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। লোকজনকেও দেখা যায় না। ও-বাড়ীর সবই অদ্ভুত।'

আজ অমাবস্যা। আকাশে চাঁদ উঠবে না, তার উপরে মেঘের পর মেঘ জমে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে বুঝলুম, বৃষ্টি আসতে আর দেরি নেই। সঙ্গে আমার সখের বুলডগ্ রোভার ছিল। ওলাইতলার বাগানবাড়ীর দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করলুম। স্টেশন-মাষ্টারের কথায় কান পাতবার দরকার নেই—লোকটার মাথায় বোধহয় ছিট্ আছে, নইলে এমন সব আজগুবি কথা বলে?

স্টেশন-মাষ্টার ডেকে বললেন, 'মশাই, তাহলে নিতান্তই যাবেন?'

—'এই রকম তো মনে করছি।'

—'তাহলে পথ-ঘাট একটু দেখে-শুনে যাবেন। ওলাইতলার বাগানবাড়ীর ঠিক আগেই একটা গোরস্থান আছে, আগে সেখানে ক্রীশ্চানদের গোর দেওয়া হত। গোরস্থানের নাম ভারি খারাপ, সন্ধ্যার পর সেদিকে কেউ যেতে চায় না।'

আমি আর থাকতে পারলুম না, বললুম, 'মশাই, মিথ্যে আমায়

ভয় দেখাচ্ছেন, আমি কাপুরুষ নই। দরকার হলে ঐ গোরস্থানে শুয়েই রাত কাটাতে পারি।'

অত্যন্ত দয়ার পাত্রের দিকে লোকে যেমনভাবে তাকায়, সেইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে স্টেশন-মাষ্টার একটুখানি ম্লান হাসি হাসলেন, কিন্তু মুখে আর কিছু বললেন না।

দামোদর নদীর ধারে ওলাইতলার সেই প্রকাণ্ড বাগান ও প্রকাণ্ড বাড়ী।

মাইলখানেক পথ চলার পর যখন তার ফটকের সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। দেউড়ীতে দ্বারবানের কোন সাড়া না পেয়ে, ফটক ঠেলে ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম।

আমার হাতে ছিল একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন, তারই আলোতে যতটা-পারা-যায় দেখতে দেখতে এগুতে লাগলুম। অনেককালের পুরানো বাগান, এবং তার অবস্থা এমন যে তাকে বাগান না বলে জঙ্গল বলাই উচিত।

পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলুম, পানায় তার জল নজরে পড়ে না, ঘাটগুলোও ভেঙে গিয়েছে। বাড়ীখানার অবস্থাও তথৈবচ। ভাঙা জানলা, ভাঙা থাম, চুন-বালি সব খসে পড়েছে।

যে-জমিদার তিনশো টাকা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার রাখবেন, এইখানে তাঁর বাস! মনে খট্‌কা লাগল।

অসংখ্য ঝিঁঝি পোকার আর্তনাদ ছাড়া কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই—অথচ বাড়ীর ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। একটু ইতস্তত করে চেঁচিয়ে ডাকলুম, 'বাড়ীতে কে আছেন?'

সামনের ঘর থেকে মোটা গলায় সাড়া এল, 'ভেতরে আসুন।'

ঘরের ভিতরে ঢুকলুম। মস্ত-বড় ঘর, কিন্তু কোণে কোণে মাকড়সার জাল, দেয়ালে দেয়ালে কালি-ঝুল, মেঝের এক ইঞ্চি পুরু ধুলো। একটা ময়লা রং-ওঠা টেবিল, তিনখানা ভাঙা চেয়ার ও একটা খুব বড় ল্যাম্প ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাব নেই।

অতিশয় শীর্ণ কুচ্‌কুচে কালো এক জরাজীর্ণ বুড়ো লোক আদুড় গায়ে একখানা চেয়ারের উপরে বসে আছে। তার বুকের সব কখানা হাড় গোনা যায়।

বুড়ো কথা কইলে, ঠিক যেন হাঁড়ীর ভিতর থেকে তার গলার আওয়াজ বেরুল। সে বললে, 'আপনি কাকে চান?'

—'জমিদার কৃতান্তবাবুকে।'

—'ও নাম আমারই। আপনার কি দরকার?'

—'আপনি একজন ম্যানেজার খুঁজছেন, তাই—'

—'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। বসুন।'

কৃতান্তবাবুর কাছে গিয়েই রোভার হঠাৎ গরর্‌-গরর্‌ করে গর্জে উঠল।

কৃতান্তবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'ও কী! সঙ্গে কুকুর এনেছেন কেন? কামড়াবে নাকি!'

রোভারকে এক ধমক দিলুম। সে গর্জন বন্ধ করলে বটে, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অনেক তফাতে সরে গিয়ে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চোখে কৃতান্তবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

বিরক্তভাবে কৃতান্তবাবু বললেন, 'ও কুকুর-টুকুর এখানে থাকলে চলবে না। ওকে এখনি তাড়িয়ে দিন।'

আমি বললুম, 'তাড়ালেও ও যাবে না। রোভার আমাকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকে না, রাত্রেও আমার সঙ্গে ঘুমোয়।'

—'রাত্রেও ও-বেটা আপনার সঙ্গে ঘুমোয়? কি বিপদ, কি বিপদ!' বলে তিনি চিন্তিত মুখে ভাবতে লাগলেন।

রোভার রাত্রে আমার সঙ্গে ঘুমোবে শুনে কৃতান্তবাবুর এতটা দুশ্চিন্তার কারণ বুঝতে পারলুম না।

খানিকক্ষণ পরে কৃতান্তবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'একটু বসুন। আপনার খাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থা করে আসি।'

—'সে জন্যে আপনার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আগে যে-জন্যে এসেছি সেই কথাই হোক।'

—'আজ আমার শরীরটা ভালো নেই। কথাবার্তা সব কাল সকালেই হবে।' এই বলে কৃতান্তবাবু বেরিয়ে গেলেন।

খানিক পরেই তিনি আবার ফিরে এসে বললেন, 'আসুন, সব প্রস্তুত।'

তাঁর পিছনে পিছনে অগ্রসর হলুম। মস্ত উঠান ও অনেকগুলো সারবন্দী ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় গিয়ে উঠলুম। বাড়ীর সর্বত্রই সমান ভগ্নদশা, ধূলো আর জঞ্জালের স্তূপ, চাম্‌চিকে আর বাদুড়ের আনাগোনা। একটা চাকর-বাকর পর্যন্ত দেখা গেল না। নির্জন বাড়ী যেন খাঁ-খাঁ করছে।

একটা ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। সে ঘরখানা খুব বেশী নোংরা নয়। একপাশে ছোট একখানা চৌকী, তার উপরে বিছানা পাতা। আর একপাশে থালায় খাবার সাজানো রয়েছে।

কৃতান্তবাবু বললেন, 'এখনি খেয়ে নিন, নইলে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

···নানান্ কথা ভাবতে ভাবতে মাথা হেঁট্ করে খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, কৃতান্তবাবু একদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে আছেন আর তাঁর কোটরগত দুই চক্ষুর ভিতর থেকে যেন দু-দুটো অগ্নিশিখা জ্বলছে! আমি মুখ তুলে তাকাতে-না-তাকাতেই সে আগুন নিবে গেল। মানুষের চোখ যে তেমন জ্বলতে পারে, আমি তা জানতুম না। ভয়ানক!

কৃতান্তবাবু বললেন, 'আজ তাহলে আমি আসি। খেয়ে-দেয়ে আপনি শুয়ে পড়ুন।' বলে যেতে যেতে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'আর দেখুন, রাত্রে এ ঘরের জানলাগুলো যেন খুলবেন না। একে তো বৃষ্টি হচ্ছে, তার উপরে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন।

—'থামলেন কেন, কি বলছিলেন বলুন না।'

—'ওধারের জানলা খুললে গোরস্থান দেখা যায়।'

—'তা দেখা গেলেই বা!'

—'সেখানে হয় তো এমন কিছু দেখতে বা এমন সব গোলমাল

শুনতে পাবেন, রাত্রে মানুষ যা দেখতে কি শুনতে চায় না।'

আমি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলুম।

কৃতান্তবাবু বললেন,—'হ্যাঁ, আর-এক কথা। আপনার ঐ বিশ্রী বুল্‌ডগটাকে বেঁধে রাখবেন। কুকুর অপবিত্র জীব, রাত্রে ও যে বিছানায় গিয়ে উঠবে এটা আমি পছন্দ করি না। বুঝলেন?'

'আচ্ছা।'

কৃতান্তবাবু বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর শেষ ইচ্ছা আমি পূর্ণ করিনি। রাত্রে রোভার বিছানার উপরে আমার সঙ্গেই শুয়েছিল।

অনেক রাতে দারুণ যাতনায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। কে আমার গলা টিপে ধরেছে! দুখানা লোহার মতন শক্ত হাত আমার গলার উপরে ক্রমেই বেশী জোর করে চেপে বসতে লাগল!

প্রাণ যখন যায়-যায়, আচম্বিতে আমার গলার উপর থেকে সেই মারাত্মক হাতের বাঁধন আল্‌গা হয়ে খুলে গেল! তারপরেই ঘরময় খুব একটা ঝটাপটি ও হুড়োহুড়ির শব্দ! কিন্তু তখন সেদিকে মন দেবার সময় আমার ছিল না, গলা টিপুনির ব্যথায় তখন আমি ছট্‌ফট্‌ করছি।

ব্যথা যখন একটু কমল, ঘর তখন স্তব্ধ। তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম, আলোটা নিবে গিয়েছিল, আবার জ্বাললুম। কিন্তু যে আমার গলা টিপে ধরেছিল ঘরের ভিতরে সেও নেই, বিছানার উপরে রোভারও নেই!

'রোভার' 'রোভার' বলে অনেকবার ডাকলুম, কিন্তু তার কোন সাড়া পেলুম না।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, রাত একটা বেজে গেছে।

দরজা দিয়ে বাড়ীর ভিতর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। সে অন্ধকার দেখলেই প্রাণ কেমন করে ওঠে। সে অন্ধকার যেন জ্যান্ত কোন হিংস্র জন্তুর মতন আমার ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। চট করে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলুম।

ঘরের এ দরজাটা আগেই বন্ধ করে শুয়েছিলুম। কিন্তু যে আমাকে আক্রমণ করেছিল, সে তাহলে কোন্ পথ দিয়ে এ ঘরে ঢুকেছিল ?

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে, ঘরের ভিতরে আর একটা দরজা আবিষ্কার করলুম,—ঠেলতেই সেটা খুলে গেল এবং ভক্ করে বিষম একটা দুর্গন্ধ এসে আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে দিলে।

আলোটা তুলে ভালো করে দেখলুম। সে কী ভীষণ দৃশ্য! ঘরের মেঝেতে রাশি রাশি হাড়, মড়ার মাথার খুলি ও রক্তমাখা কাঁচা নাড়ি-ভুড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে! একদিকে একটা কাঁচা মড়ার মুণ্ড মাটির উপরে হাঁ করে রয়েছে!

দুম করে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলুম। এ আমি কোন্ পিশাচের খপ্পরে এসে পড়েছি ? আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল—তাড়াতাড়ি ঘরের জানলাগুলো খুলে দিলুম।

বাইরে আকাশ-ভরা অন্ধকারকে ভিজিয়ে হুড়হুড় করে বৃষ্টি পড়ছে আর চক্‌চক্ করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর বোঁ বোঁ করে ঝোড়ো হাওয়া ছুটছে।

আর, ও কী! বিদ্যুতের আলোতে বেশ দেখা গেল, সামনের তালগাছটার তলায় কে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচছে! ঠিক যেন একটা ছোট ল্যাংটো ছেলে! সে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে আর গান গাইছে—

ধিন্‌তাধিনা পচা নোনা,
হাড়-ভাতে-ভাত চড়িয়ে দে না!
চোষ না হাড়ের চুষিকাঠি,
রক্ত চেঁচেপুছে নে না!
মাম্‌দো মিয়া সেঁওড়া-গাছে
মড়ার মাথার উকুন বাছে,
পেত্নী-দিদি একলা নাচে,
তানানানা, দিম্‌-দেরেনা!

গুব্‌রে-পোকার চাটনি খেয়ে,
শাঁকচুর্ণী আসছে ধেয়ে,
কন্ধকাটার পানে চেয়ে
মুখখানা তার যায় না চেনা !
হাড় খাব আর মাংস খাব,
চাম্‌ড়া নিয়ে ঢোল বাজাব,
দাঁতের মালায় বৌ সাজাব
নইলে যে ভাই, মন মানে না !
ঠ্যাং তুলে ঐ গো-ভূত ছোটে,
গোর থেকে বাপ, হুম্‌ড়ো ওঠে,
চোখ দিয়ে তার আগুন ফোটে,
এই বেলা চল, লম্বা দে না !

গান হঠাৎ থেমে গেল। আবার বিদ্যুৎ চমকালো, কিন্তু ছোঁড়াটাকে আর তালতলায় দেখতে পেলুম না। কে এ ? গাঁয়ের কোন ঘর-হারা পাগলা ছেলে নয় তো ? তাই হবে! কিন্তু সে বেয়াড়া গান থামলে কি হয়, চারিদিককার সেই আঁধার-সমুদ্র মথিত করে আরো কত রকমের আওয়াজই যে ঝোড়ো হাওয়ার প্রলাপের সঙ্গে ভেসে আসছে !

কখনো মনে হয়, একদল আঁতুড়ের শিশু ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে ! কখনো শুনি, আড়াল থেকে কে খিল্‌খিল্ খিল্‌খিল্ করে হাসছে ! মাঝে মাঝে কে যেন ঝমঝম করে মল বাজিয়ে যাচ্ছে আর আসছে, যাচ্ছে আর আসছে ! থেকে থেকে এক-একটা আলেয়া আনাগোনা করছে, তাদের আশেপাশে কারা যেন ছায়ার মত সরে সরে যাচ্ছে এবং বাগানের কোথা থেকে একটা হুলো বেড়াল একবারও না থেমে কেবল চ্যাঁচাচ্ছে ম্যাও ম্যাও।···আজ কি এখানে রাজ্যের ভূতপ্রেত, দৈত্য-দানা এসে জড়ো হয়েছে, না, ভয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে,—যা দেখছি, যা শুনছি সমস্তই অলীক কল্পনা !

অ্যাঁ! ও আবার কে? ঘরের দরজা কে ঠেলছে?

আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠলো—জানি না, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে কোন্ বিকট বীভৎস মূর্তি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে!

আবার কে দরজা ঠেললে। আমার সমস্ত দেহ যেন পাথর হয়ে গেল!

তারপরে আবার দরজার উপরে ঘন ঘন ঠেলা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে কুকুরের ডাক। আঃ, রক্ষে পাই! এ যে আমার রোভারের ডাক!

ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই রোভার এসে একলাফে আমার বুকের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই নির্বান্ধব ভুতুড়ে পুরীতে রোভারকে পেয়ে মনে হল, তার চেয়ে বড় আত্মীয় এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই।

হঠাৎ রোভারের মুখের দিকে আমার চোখ পড়ল। তার মুখময় রক্ত লেগে রয়েছে! অবাক হয়ে ভাবছি, এমন সময়ে বাইরের বাগান থেকে অনেক লোকের গলা পেলুম।

জানলার ধারে গিয়ে দেখি ছয়-সাতটা লণ্ঠন নিয়ে চৌদ্দ-পনেরো জন লোক বাড়ীর দিকেই আসছে। তাদের পোশাক দেখেই বুঝলুম, তারা পুলিশের লোক। এবং তাদের ভিতরে সেই স্টেশন-মাষ্টারকেও যখন দেখলুম, তখন আর বুঝতে বিলম্ব হল না যে, থানায় খবর দিয়েছেন তিনিই। মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে লণ্ঠনটা নিয়ে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

পুলিশের লোকেরা সিঁড়ির তলাতেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে গোলমাল করছিল।

ব্যাপার কি? ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলুম, জমিদার কৃতান্ত চৌধুরীর কুচ্‌কুচে কালো ও লিক্‌লিকে রোগা হাড়-বের-করা দেহটা সিঁড়ির তলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে! তাঁর চোখ

ছুটো কপালে উঠেছে এবং সে চোখ দেখলেই বোঝা যায়, কৃতান্তবাবু আর ইহলোকে বর্তমান নেই। এবং কৃতান্তবাবুর গলদেশে মস্ত একটা গর্ত, তার ভিতর থেকে তখনো রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে।

এতক্ষণে বুঝলুম, রোভারের মুখে রক্ত লেগেছে কেন?...তাহলে এই কৃতান্ত চৌধুরীই আমাকে আক্রমণ করতে গিয়েছিল, তারপর রোভার তার টুঁটি কামড়ে ধরে এ যাত্রার মত তার সব লীলাখেলা শেষ করে দিয়েছে!...

...স্টেশন-মাষ্টার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'কিন্তু এ কি অসম্ভব কাণ্ড!'

ইন্‌স্পেক্টর বললেন, 'আপনি কি বলছেন?'

স্টেশন-মাষ্টার কৃতান্ত চৌধুরীর মৃতদেহের উপরে ঝুঁকে পড়ে ভালো করে তার মুখখানা দেখে বললেন, 'না, কোনই সন্দেহ নেই। এ হচ্ছে এই গাঁয়ের ভুবন বসুর লাশ। ঠিক আড়াই মাস আগে ভুবন বসু কলেরায় মারা পড়েছে। কিন্তু তার দেহ দাহ করা হয়নি, কারণ তার লাশ চুরি গিয়েছিল।'

বাঁদরের পা

অবনীবাবু বলেছিলেন, 'আগ্রা থেকে আমি যখন ফতেপুর সিক্রিতে বেড়াতে গিয়েছি, সেই সময়ে এক ফকির এটা আমাকে দেয়। জিনিসটা আর কিছুই নয়—বাঁদরের একখানা পা।'

সুরেনবাবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাঁদরের পা! সে আবার কি?'

অবনীবাবু বললেন. 'বিশেষ কিছু নয়, বাঁদরের একখানা শুকনো পা। মিশরের লোকেরা যে-উপায়ে মানুষের মরা দেহকে শুকিয়ে রাখে, সেইরকম কোন উপায়েই এই বাঁদরের পা-খানাকে শুকিয়ে

রাখা হয়েছে,—এই দেখুন,' বলে তিনি পকেটের ভেতর থেকে একটা জিনিস বার করে দেখালেন।

সুরেনবাবুর স্ত্রী সুরমা কার্পেট বুনতে বুনতে মুখ তুলে শিউরে উঠে বললেন, 'মাগো, ওটাকে আপনি আবার পকেটে পুরে রেখেছেন? আপনার ঘেন্না করে না?'

সুরেনবাবু সুধোলেন, 'এর গুণ কি?'

অবনীবাবু বললেন, 'এর মহিমায় তিনজন লোকের তিনটি করে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে।'

—'বলেন কি? এও কি সম্ভব?'

—'হ্যাঁ। প্রথম এক ব্যক্তি এই জিনিসটির গুণ পরীক্ষা করেছিল। তার প্রথম দুটি ইচ্ছার কথা জানি না, কিন্তু তৃতীয় বারে সে মরতে চেয়েছিল। তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।'

—'কি ভয়ানক! আর কেউ এর গুণ পরীক্ষা করেছে?'

সুরেনবাবু একটা দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি করেছি! কিন্তু পরীক্ষা করে এইটুকুই বুঝেছি যে, অদৃষ্টে যা আছে তা ঘটবেই। নিয়তির বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে না। তাই এই জিনিসটাকে আজ আমি গঙ্গায় ফেলে দিতে যাচ্ছি।'

সুরেনবাবু বললেন, 'সে কি কথা? আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো বলতে হবে যে, এর শক্তি এখনো ফুরোয়নি! এখনো আর একজন লোক এর কাছে তিনটি ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে!'

—'তা পারে।'

—'তাহলে ওটা আমাকে দিন না কেন?'

সুরেনবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, 'বলেন কি অবনীবাবু? আমি আপনার বন্ধু হয়ে এমন শত্রুর কাজ করতে পারব না!'

—'কেন?'

—'আপনি জানেন না, এ হচ্ছে কি সাংঘাতিক জিনিস! একে পরীক্ষা করা মানে হচ্ছে, অমঙ্গলকে ডেকে আনা।'

সুরেনবাবু সকৌতুকে হেসে বললেন, 'আমি এসব গাঁজাখুরি কথা বিশ্বাসই করি না। তবু দেখাই যাক না, আপনার রূপকথার ভিতরে কতটুকু সত্য আছে। ওটাকে গঙ্গায় ফেলে না দিয়ে আমার হাতেই দিয়ে যান।'

অবনীবাবু বললেন, 'বেশ, আপনার কথাই থাকুক। কিন্তু যদি হিতে বিপরীত হয়, তাহলে শেষটা আমাকে যেন দুষবেন না। এই নিন—'

সুরমা বললেন, 'হ্যাঁগো, এ যেন আরব্য উপন্যাসের আলাদীনের প্রদীপের গল্প! তোমার বন্ধুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

সুরেনবাবু বললেন, 'আমারও তাই বিশ্বাস। তবু মজাটা একবার দেখাই যাক না কেন। প্রথমে কি ইচ্ছা প্রকাশ করি, বল তো?'

সুরমা বললেন, 'আমাদের তো কোনই অভাব নেই। ছেলের ভালো চাকরি হয়েছে, তুমি পেন্সন পাচ্ছ, আমরা তো সুখেই আছি। তবে হ্যাঁ, আমার একটি ইচ্ছা আছে বটে। আমাদের বাড়ীখানা অনেকদিন মেরামত হয়নি, আর বাগানের দিকে খান-তিনেক ঘর তৈরি করলে ভালো হয়। এজন্যে হাজার পাঁচেক টাকার দরকার।'

সুরেনবাবু হো হো করে হেসে বললেন, 'হাজার পাঁচেক টাকা দরকার? তা আবার ভাবনা কি, এখনি তোমাকে দিচ্ছি।'—বলেই তিনি বাঁদরের সেই শুকনো পা-খানাকে হাতের উপরে রেখে বললেন, 'আমাদের হাজার পাঁচেক টাকা দরকার,—বুঝেছ, পাঁচ হাজার টাকা।' তারপরেই তিনি আর্তনাদ করে বাঁদরের পা-খানাকে টেবিলের উপরে ফেলে দিলেন।

সুরমা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওকি! অমন করে উঠলে কেন?'

সুরেনবাবু সভয়ে বললেন, 'আমার ঠিক মনে হল, বাঁদরের ঐ পা-খানা আমার হাতের ভিতরে নড়ে উঠল।'

সুরমা বললেন, 'ও তোমার মনের ভুল। চল, রাত হল,—এখানে বসে আর পাগলামি করে না, খাবে চল।'

…সেই রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুরেনবাবু স্বপ্নে দেখলেন, একটা বাঁদর যেন তাঁর পাশে শুয়ে আছে। তিনি তাড়া দিতেই সে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেল। সুরেনবাবু দেখলেন, তার একখানা পা নেই!

পরদিন সকালবেলায় চা পান করতে বসে সুরেনবাবু সুরমার কাছে কালকের রাতের স্বপ্নের কথা বলছিলেন।

সুরমা হেসে বললেন, 'কিন্তু আজ ঘুম থেকে উঠে তুমি বিছানাটা ভালো করে খুঁজে দেখেছ তো? বাঁদরটা হয়তো আমাদের টাকা দিতে—' বলতে বলতে থেমে পড়ে সুরমা চমকে উঠে সন্ত্রস্ত স্বরে বললেন—'দেখ, দেখ!'

বাগানের একটা বটগাছের ঘন পাতার ভিতর থেকে একটা বানর মুখ বাড়িয়ে বসে আছে।

সুরেনবাবু সহজভাবেই বললেন, 'পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীতে দুটো বাঁদর আছে জানো না? একটা কোনগতিকে পালিয়ে এসেছে আর কি!'

বানরের মুখখানা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুরমা বললেন, 'আমার যেন কেমন ভয়-ভয় করছে!'

সুরেনবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ডাকপিয়নের গলা পাওয়া গেল—'রেজিষ্টারি চিঠি আছে বাবু।'

সুরেনবাবু নীচে গিয়ে সই করে চিঠি নিয়ে এলেন। খামের উপরটা দেখেই তিনি বুঝলেন, চিঠিখানা এসেছে রেল-আপিস থেকে। তাঁর পুত্র অমিয়কুমার রেল-অফিসের একজন বড় অফিসার।

চিঠির বক্তব্য এই:

প্রিয় মহাশয়,

আপনার পুত্র অমিয়কুমার সেন রেলের কোন কাজে হাজারিবাগে

গিয়েছিলেন। সেখানে জঙ্গলে পাখি শিকার করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এক ব্যাঘ্রের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হয়েছেন। অনেক অন্বেষণ করেও তাঁর দেহ পাওয়া যায়নি।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্যে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

রেলের 'প্রভিডেণ্ট-ফণ্ডে' আপনার পুত্রের পাঁচ হাজার টাকা জমা হয়েছে। এই টাকা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

সুরেনবাবু পাগলের মতন চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'পাঁচ হাজার টাকা! পাঁচ হাজার টাকা!'—বলতে বলতে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

একমাস কেটে গেছে।

গভীর রাত্রি। সুরেনবাবু আর সুরমা পাথরের মূর্তির মতন বসে আছেন, তাঁদের চোখে ঘুম নেই।

অমাবস্যার রাত,—আকাশ অন্ধকার। বাগানের বড় বড় গাছগুলো দমকা হাওয়ায় যেন কেঁদে কেঁদে উঠছিল।

হঠাৎ সুরমা বলে উঠলেন, 'ওগো! সেই বাঁদরের পা-টা কোথায় গেল?'

বাঁদরের পায়ের কথা সুরেনবাবু একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সেইখানেই সেটা পড়ে রয়েছে। তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'ঐ যে! কিন্তু ওর কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

সুরমা বললেন, 'ওর কাছে এখনো তুমি দুটো ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারো।'

সুরেনবাবু বললেন, 'না, না। আর কোন ইচ্ছা প্রকাশ করবার দরকার নেই। ওসব বাজে আজগুবি ব্যাপার।'

সুরমা বললেন, 'না, না—আমি আমার ছেলেকে দেখতে চাই!'

সুরেনবাবু বললেন, 'কি তুমি আবোল-তাবোল বকছ? কোথায় আমাদের অমিয়? বেঁচে থাকলে সে আপনিই আসত!'

সুরমা মাথা নেড়ে বললেন, 'না, না, না। আমি তাকে দেখবই,—

তুমি ইচ্ছা করলে সে এখনি আসবে।'

সুরেনবাবু বললেন, 'শোকে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার প্রথম ইচ্ছাটা ফলেছে দৈবগতিকে, বাঁদরের পায়ের জন্য নয়। ওর কোন গুণ নেই, অসম্ভব কখনো সম্ভব হয় না।'

সুরমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তাহলে তুমি আমার কথা রাখবে না? আমার অমিয়কে দেখাবে না?'

সুরেনবাবু নাচার হয়ে বললেন, 'বেশ, তুমি যখন কিছুতেই বুঝবে না, তখন কি আর করি বল।'—এই বলে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে বাঁদরের পা-টা তুলে নিয়ে বললেন, 'আমি আমার ছেলে অমিয়কে দেখতে চাই।'

—বাইরে একটা প্যাঁচার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া গোঁ গোঁ করে উঠল।

একটা টিকটিকি দেয়ালের উপরে টিক টিক করে ডাকলে।

তারপর সব স্তব্ধ।

সুরেনবাবু বললেন, 'দেখলে তো, ও বাঁদরের পায়ের কোন গুণই নেই? আমি এখন শুতে যাই, তুমিও এস।'

সুরেনবাবু দুই পা অগ্রসর হলেন—সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজাটা দুম করে খুলে যাবার শব্দ হল।

সুরমা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। ব্যগ্র স্বরে বললেন, 'ও কে দরজা খুললে?'

সুরেনবাবু বিবর্ণ মুখে বললেন, 'ও কেউ নয়। ঝোড়ো হাওয়ায় দরজাটা খুলে গেছে।'

সুরমা বললেন, 'না গো, না—আমার অমিয় আসছে, আমার অমিয় আসছে! আমি তার পায়ের আওয়াজ চিনি, সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনছ না?'—বলতে বলতে তিনি ছুটে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সুরেনবাবু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাঠের সিঁড়ির উপরে কার পায়ের শব্দ হচ্ছে বটে। হয় তো, ও-শব্দটা করছে তাঁর

প্রকাণ্ড কুকুরটা।…কিন্তু যদি তা না নয়? যদি সত্যই অমিয় আসে? তাহলে সে কী মূর্তিতে আসবে? বাঘের আক্রমণে সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, মুণ্ডহীন, রক্তাক্ত দেহ—

সুরেনবাবু আর ভাবতে পারলেন না। শিউরে উঠে টেবিলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁদরের পা-টা আবার তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর তৃতীয় বা শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, 'আমার ছেলে অমিয়কে আর আমি দেখতে চাই না!'

সিঁড়ির উপরে আর শব্দ শোনা গেল না।

খানিক পরে সুরমা নিরাশ মুখে ঘরে ফিরে এলেন।

সুরেনবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কি দেখলে?'

শ্রান্তভাবে চেয়ারের উপরে বসে পড়ে সুরমা বললেন, 'বাইরে কেউ নেই। কিন্তু সদর দরজাটা খোলা!'

বাদ্‌লার গল্প

ঝম-ঝম্ ঝম-ঝম্! বৃষ্টি থামবার আর নাম নেই।

সন্ধ্যা হয়-হয়। আমার বাড়ীর বারান্দায় আমরা পাঁচজনে বসে আছি।

বেয়ারা এসে আচার-তেল-মাখা, গোটার মসলা ছড়ানো, নারিকেলকুরি আর পেঁয়াজের কুচি মেশানো মুড়ি এবং তার সঙ্গে বেগুনী, পট্‌লী ও শশা দিয়ে গেল।

সামনেই গঙ্গা। বৃষ্টির ধারা ঠিক কুয়াশার মতই গঙ্গার বুকের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে। ওপারে কোথায় আকাশ আর জলের সীমা, কিছুই বোঝার যো নেই,—এমন কি ওপারের বনের সবুজ রেখা পর্যন্ত আর দেখা যায় না।

গঙ্গাজলের উপরে বৃষ্টিধারার চিকের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, এক-একখানা পান্‌সী ঠিক অস্পষ্ট স্বপ্নের মত জেগে

উঠেই আবার অদৃশ্য হয়ে পড়ছে। নৌকোগুলোর দেহ যেন ছায়ার মায়া দিয়ে গড়া—তাদের যেন দেখা যায়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না।

শ্যামচন্দ্র একমুঠো মুড়ি মুখে পুরে গঙ্গার দিকে ফিরে চর্বণ করতে করতে অস্পষ্ট স্বরে বললে, 'আজ চারিদিক রহস্যের ঘেরাটোপে ঢাকা। ঐ দেখ না, নৌকোগুলো ভেসে যাচ্ছে, ঠিক যেন ভুতুড়ে নৌকোর মতই।'

রামচন্দ্র চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, মুখগহ্বরে টপ করে একখানা বেগুনী নিক্ষেপ করে বললে, 'হুম্। আজকে চারিদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, হ্যাম্‌লেটের বুড়ো বাবার প্রেতাত্মা যেন দেখা দিলেও দিতে পারে।'

মাণিকলাল বললে, 'এমন বাদলায় দল বেঁধে ইলেকট্রিক লাইটের তলায় সোফা-কৌচে বসে ভূতের গল্প শুনতে ভারি ভালো লাগে।...তোমরা কেউ কখনো ভূত দেখেছ?'

রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র একসঙ্গে বললে, 'না। ভূত আমি বিশ্বাস করি না।'

অপূর্ব এতক্ষণ একমনে মুড়ি-ফুলুরি খেতেই ব্যস্ত ছিল। এখন সে মুখ খুলে বললে, 'হ্যাঁ, কোন ভদ্রলোকেরই ভূত বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমি ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু ভূতের গল্প শুনতে ভালো-বাসি।'

আমি বললুম, 'আমিও ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু ভূতের গল্প বলতে ভালোবাসি।'

রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র একসঙ্গে বললে, 'বাদলার গল্পই হচ্ছে ভূতের গল্প। কিন্তু সে গল্প সত্যি হওয়া চাই।'

আমি বললুম, 'আমার এ গল্প একেবারে সত্য ঘটনা।'

মাণিকলাল বললে, 'তবে যে বললে, তুমি ভূত বিশ্বাস কর না?'

—'না, আমি ভূত বিশ্বাস করি না। কিন্তু সত্য ঘটনা না হলে ভূতের গল্পের জোর হয় না। তাই প্রত্যেক ভূতের গল্পই সত্য বলে মনে করা উচিত।'

অপূর্ব বললে, 'যে-গল্পটা তুমি বলবে, সেটা কার মুখে শুনেছ ?'

—'কারুর মুখে শুনিনি। এ গল্প আমার নিজের গল্প।'

মাণিকলাল বললে, 'মুড়ি-ফুলুরি ফুরুলো। বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে আসছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে গেছে। আকাশের চাঁদ-তারা মেঘের চাদর মুড়ি দিয়েছে। হু-হু করে ঝোড়ো হাওয়া বইছে, ঝুপ্-ঝুপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, গঙ্গা কাতর আর্তনাদ করছে,— আর নদীর তীরে জনপ্রাণী নেই। এই তো ভূতের গল্প শোনবার সময়। কিন্তু এমন গল্প শুনতে চাই, যাতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গায়ে কাঁটা না দিলে, বুকটা ভয়ে ছাঁৎ-ছাঁৎ না করলে ভূতের গল্প শুনে আরাম হয় না। ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু এই ভয়-পাওয়ার আরামটুকু ভারি মিষ্টি লাগে।'

চায়ের পেয়ালায় তাড়াতাড়ি গোটাকয়েক চুমুক দিয়ে আমি আরম্ভ করলুম :

'কালীপুরে আমার দেশ। আমি কলকাতায় জন্মেছি, ছেলেবেলা থেকে এইখানেই মানুষ হয়েছি, দেশে ভারি ম্যালেরিয়া বলে বাবা আমাকে কখনো দেশের মাটি মাড়াতে দিতেন না।

কিন্তু দেশকে আমি বরাবরই ভালোবাসি। কলেজে যখনি কেউ "আমার দেশ" কি "ও আমার দেশের মাটি" প্রভৃতি গান গাইত, তখনি দেশের জন্যে আমার প্রাণ কেঁদে উঠত।

তাই গেল-বছরে একদিন আমার দেশকে দেখতে গেলুম। শুনেছি, দেশে আমাদের ভিটে এখনো আছে। বাপ-পিতামহের ভিটের উপরে দুফোঁটা চোখের জল ফেলে আসব, এই ছিল আমার মনের ইচ্ছা।

কালীপুরের স্টেশনে গিয়ে যখন নামলুম, তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে। তবে আকাশে দশমীর চাঁদ ছিল বলে পথ চলতে বিশেষ কষ্ট হল না। গ্রামের কেউ-না-কেউ আমাকে আশ্রয় দেবে, এই ভেবে মনের আনন্দে গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে অগ্রসর হলুম।

তখন বৃষ্টি ছিল না বটে, কিন্তু বর্ষাকাল। কাদায় হাঁটু পর্যন্ত পা বসে যাচ্ছে দেখে, তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া খুলে পবিত্র পুঁথির মতন বগলদাবা করলুম। মাথার উপরে ম্যালেরিয়ার মশার মেঘ কনসার্ট বাজাতে বাজাতে আমার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। কালো কালো বাহুড় উড়ছে, ঝিঁঝি পোকা ডাকছে, প্যাঁচারা চ্যাঁ চ্যাঁ করে চ্যাঁচাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাপের ভিতর থেকে সাপের মতন কি যেন বেরিয়ে আসছে। কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের আর ইলেকট্রিকের আলোতে পথ চলা অভ্যাস, দশমীর চাঁদের আলোও অমাবস্যার অন্ধকারের চেয়ে উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে না। এক জায়গায় পথের মাঝখানেই একটা প্রায় তিন-ফুট গভীর ডোবা ছিল, হঠাৎ ঝপাং করে তার মধ্যে না-জেনে ঝাঁপ খেতে হল। তবু আমি দমলুম না,—ডোবা থেকে উঠেই মনের সুখে আবার গান সুরু করলুম। এসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে আছে ? কবি গেয়েছেন—

"ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরেই ছোঁয়াই মাথা।"

গাইতে গাইতে গায়ের কাদা ঝেড়ে-পুঁছে মুখ তুলেই দেখি, সামনেই একটা ঝোঁপের আবছায়ায় কালো গা মিশিয়ে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে দেখে কেমন সন্দেহ হল। চশমাখানা খুলে পরিষ্কার করে ভালো করে আবার চোখ লাগিয়ে দেখলুম। দেখে সন্দেহ আরো বাড়ল। দিব্যি নাহুস-মুহুস চেহারার একটা লোক।'

রামকান্ত ও শ্যামকান্ত রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, 'অ্যাঁ, বল কি ! ভূত নাকি ?'

আমি বললুম, 'বোধ হয়। কিন্তু লোকটার মাথাটা কাঁধের উপরে ছিল না,—ছিল তার হাতে। দুই হাতে মুণ্ডটা সে পেটের কাছে ধরে ছিল, আর সেই মুণ্ডের ভাঁটার মতন চোখ দুটো আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে ছিল।'

মাণিকলাল বললে, 'গল্পটি এইবারে জমেছে—সত্য গল্প কিনা !

আমার গায়ে কাঁটা দিতে সুরু করেছে। তুমি নিশ্চয়ই কন্দকাটা ভূত দেখেছিলে ?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

অপূর্ব বললে, 'তারপরেই তুমি বোধহয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লে ?'

আমি বললুম, 'না। আমি তার আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম।'

কন্দকাটার হাতে ধরা মুণ্ডটা বলে উঠল, 'হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ, মাঁনুঁষেঁর গঁন্ধঁ পাঁউঁ !'

আমি তুড়ি দিয়ে গাইলুম—

'ও আমার দেশের মাটি !'

কন্দকাটার হাতে-ধরা মুণ্ড এবার আরো জোরে বললে, 'হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ !'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'দুত্তোর, হাঁউ-মাঁউ-খাঁউয়ের নিকুচি করেছে। ব্যাপার কি ? বেসুরে অমন বাজে চ্যাঁচাচ্ছ কেন ?'

কন্দকটা খানিকক্ষণ হতভম্বের মত চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'আমি ভয় দেখাচ্ছি।'

আমি বললুম, 'কাকে ?'

সে বললে; 'তোমাকে।'

—'আমাকে! কেন ?'

—'ভয় দেখাতে আমরা ভালোবাসি।'

—'কিন্তু আমি ভয় পাইনি।'

—'ভয় পাওনি ? আচ্ছা, এইবারে তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাবে।' —এই বলে সে মস্ত হা করে ভয়ানক জোরে আবার হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ বলে চ্যাঁচাবার উপক্রম করলে।

কিন্তু তার আগেই আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কন্দকাটার মুণ্ডের গালে ঠাস্ করে এক চপেটাঘাত করলুম।

কন্দকাটার হাতে-ধরা মুণ্ডটা ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলে বললে,

'বিনা দোষে তুমি আমাকে চড় মারলে কেন ?'

আমি বললুম, 'মুণ্ড থাকা উচিত কাঁধের উপরে। মুণ্ডটাকে তুমি কাঁধ থেকে খুলে নামিয়ে রেখেছ কেন ?'

কাঁদতে কাঁদতে কন্দকাটা বললে, 'নইলে যে তোমরা ভয় পাও না।'

আমি বললুম, 'কাঁধের মুণ্ড হাতে দেখলে আমার মাথা ঘোরে। যদি ভালো চাও তো যেখানকার মুণ্ড সেইখানেই রেখে দাও। নইলে আবার আমি চড় মারব।'

কন্দকাটা তাড়াতাড়ি মুণ্ডটাকে আবার কাঁধের উপরে বসিয়ে, ম্রিয়মাণভাবে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তার অবস্থা দেখে আমার মনে অত্যন্ত দয়া হল। আস্তে আস্তে তার পিঠ চাপড়ে আদর করে বললুম, 'না, না তুমি কিছু মনে কোরো না, আর আমি তোমাকে চড় মারব না।'

কন্দকাটা ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'তুমি আমাকে দেখে ভয় পেলে না,—উল্টে আমাকে চড় মারলে! এখন ভূতের সমাজে আমি এ পোড়া মুখ দেখাব কেমন করে ? ওগো, এ আমার কি দুর্দশা হল গো! ওগো, আমি যে ভূত-পেত্নীর নাম ডোবালুম গো! ওগো, বেলগাছের ডালে বসে বেহ্মদত্যিঠাকুর যে সব দেখছেন গো! ওগো, তিনি যে আমার কথা সবাইকে বলে দেবেন গো!'

আমি বললুম, 'থামো, থামো,—অত চেঁচিয়ো না। কোথায় তোমার বেহ্মদত্যিঠাকুর ?'

চোখের জল মুছতে মুছতে কন্দকাটা বললে, 'ঐ বেলগাছটার ডালে।'

পাশেই একটা বেলগাছ। তারই একটা মোটা ডালে উবু হয়ে বসে, সাদা ধবধবে পৈতে পরে একজন মিশকালো লোক গড় গড় করে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে।

আমি বললুম, 'প্রণাম হই বেহ্মদত্যিঠাকুর। সব শুভ তো ?'

হুঁকোর আওয়াজ থেমে গেল। উপর থেকে হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন হল, 'তুমি কে হে? নিবাস কোথায়?'

—'আজ্ঞে, আমি চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। নিবাস কলকাতায়।'

—'এখানে মরতে এসেছ কেন বাপু?'

বেহ্মদত্যির কথায় আমার ভারি রাগ হল। আমি বললুম, 'কি-রকম লোক মশাই আপনি? ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জানেন না?'

—'আমি কথা কইতে জানি কি না-জানি, তা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। জ্যাঠা ছেলে কোথাকার!'

—'আপনি "বক্সিং" লড়তে জানেন?'

বেহ্মদত্যি চমকে উঠে বললেন, 'সে আবার কি?'

—'গাছের ডাল থেকে নেমে এসে দেখুন না, তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

—'না, আমি নীচে নামতে পারব না। আমার পায়ে গেঁটে-বাত হয়েছে। আমি এখন এইখানে বসেই তামাক খাব।'

—'তাহলে আমি নীচে থেকেই আপনাকে থান ইট ছুঁড়ে মারব।'

বেহ্মদত্যি এইবারে হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'বেশ, বেশ! ছোকরা, তোমার মিষ্টি কথা শুনে ভারি খুসি হলুম। তোমার বাবার নাম কি?'

—'আজ্ঞে, ৺সূর্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জন্ম এই কালীপুরেই। আবার পিতামহের নাম ৺ভাস্করনাথ চট্টোপাধ্যায়।'

বেহ্মদত্যি বললেন, 'অ্যাঁঃ, বল কি? তুমি ভাস্করের নাতি? আরে, আরে, এতক্ষণ এ কথা বলতে হয়,—তুমি তো আমাদেরই ঘরের ছেলে হে! ভাস্করের বাপ শশীনাথ যে আমার প্রাণের বন্ধু ছিল। তা, খবর সব ভালো তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার আশীর্বাদে আপাতত সব মঙ্গল।'

—'তা কন্দকাটাকে তুমি কি বলেছ? ও কাঁদছিল কেন?'

—'আজ্ঞে, কন্দকাটা আমাকে ভয় দেখাতে এসেছিল বলে আমি ওকে একটা চড় মেরেছি।'

—'অন্যায় করেছ। দেখ, তোমরা পৃথিবীতে এখন সশরীরে বর্তমান আছ—কত দিকে কত আনন্দ নিয়ে মেতে থাকতে পারো। কিন্তু ভূত-বেচারাদের ভাগ্যে সেসব কিছুই নেই, তাদের আনন্দ-লাভের একটিমাত্র উপায় আছে, আর তা হচ্ছে, তোমাদের ভয় দেখানো। তোমাদের ভয় দেখিয়েই তাদের সময় মনের সুখে কোন-রকমে কেটে যায়। কিন্তু তোমরা আজকালকার কলেজের ছোকরারা, দু-পাতা ইংরিজি পড়েই ভূত-প্রেতদের "ডোণ্ট্-কেয়ার" করে দাও। এই সেদিন মাম্‌দো-ভূত এসে আমাকে তার দুর্দশার কাহিনী বলে গেল। সে কাহিনী শুনলে চোখে আর জল রাখা যায় না। কে এক ছোকরা নাকি ডাক্তারি পড়ে, মড়া কেটে কেটে তার বুক বলে গিয়েছে। এক রাতে সে ঘুমোচ্ছিল, এমন সময়ে মাম্‌দো তার ঘরে গিয়ে হাজির। মাম্‌দো যেই তার খাটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ছোকরার ঘুম অমনি গেল ভেঙে। মাম্‌দোর প্রথমটা মনে হল, ছোকরা ভয়ানক ভয় পেয়েছে। কারণ সে মাম্‌দোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মাম্‌দোও তার দিকে চোখ দুটো যতটা পারে পাকিয়ে কট্‌মট্‌ করে তাকালে। ছোকরা তখন ডানপাশ ফিরলে। মাম্‌দোও সেই পাশে গিয়ে হাজির। ছোকরা তখন সুধোলে, "তুমি কি চাও?" মাম্‌দো কোন জবাব না দিয়ে আরো বিশ্রীভাবে তাকালে। তারপর যা হল তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না। ছোকরা মাম্‌দোর দিকে আবার খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, "দেখ, তোমার যদি আর কোন কাজ না থাকে, তবে তুমি ঐখানে চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকো। আমার অন্য কাজ আছে—অর্থাৎ এখন আমি ঘুমবো।" বলেই সেই পাজী ছোকরা আবার বাঁ-পাশ ফিরে অম্লানবদনে ঘুমিয়ে পড়ল। বল তো, এর পরে আমাদের ভয় দেখানোর সুখটুকুই বা কোথায় থাকে, আর আমাদের মুখরক্ষাই বা হয় কেমন করে? তুমিও দেখছি ঐ দলেরই লোক। তোমার এই

অন্যায় ব্যবহারে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ভবিষ্যতে আমাদের দেখে তোমরা ভয় পেয়ো। তাহলেই আমাদের আনন্দ। কিন্তু এইটুকু আনন্দ থেকেও তোমরা যদি আমাদের বঞ্চিত কর, তাহলে—'

বেহ্মদত্যির কথা শেষ হবার আগেই কন্দকাটা বলে উঠল, 'সরে দাঁড়াও, সরে দাঁড়াও,—পথ থেকে সরে দাঁড়াও।'

ফিরে দেখি, একটি স্ত্রীলোক পথ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ আমাকে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে, লজ্জায় আধ হাত জিভ্‌ কেটে মুখে সাতহাত ঘোমটা টেনে দিলে।

কন্দকাটা বললে, 'এখনো সরে দাঁড়ালে না! কেমন লোক হে তুমি? মহিলার সম্মান জানো না?'

তাড়াতাড়ি আমি সরে দাঁড়ালুম। মহিলাটি ঘোমটার ফাঁক দিয়ে একবার আমাকে দেখে, ফিক্‌ করে একটুখানি কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে হেলে-দুলে চলে গেলেন।

আমি বললুম, 'উনি কে?'

কন্দকাটা খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে বললে, 'উনি হচ্ছেন শ্রীমতী পেত্নীবালা দত্ত।'

বেহ্মদত্যি মুখ থেকে হুঁকোটি নামিয়ে বললেন, 'পেত্নীবালার ডাক নাম কুণি। ও হচ্ছে বুনির বোন।'

আমি বললুম, 'বুনি কে?'

বেহ্মদত্যি বললেন, 'তুমি কি কখনো কুণি-বুনির গল্প শোনোনি?'

—'না।'

—'তবে শোনো। কুণি আর বুনি হচ্ছে দুই বোন। মরবার পর দুই বোনই পেত্নী হয়েছে। কুণি থাকে দত্তদের বাড়ীর রান্নাঘরের এক কোণে, আর বুনি থাকে বাঁশবনে। এক রাত্রে দত্তদের বাড়ীর বামুনঠাকুর বাঁশবনের পাশ দিয়ে আসছে, এমন সময়ে বুনি বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তার পথ জুড়ে দাঁড়াল। পেত্নী দেখেই তো বামুনঠাকুর একেবারে ভয়ে আড়ষ্ট। কিন্তু বুনি সেদিন বামুনকে ভয় দেখাতে আসেনি, সে খালি বললে,—

"কুণিকে বোলো বুনির বেটা হয়েছে।
সুমুখদিকে গুড়্‌মুড়ো তার পিছন দিকে পা,
একবার বলে দিও তো গা।"

এই বলেই বুনি অদৃশ্য হল। বামুনঠাকুরও উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে দত্তবাড়ীর রান্নাঘরের সামনে এসে পড়ে দাঁতকপাটি লেগে অজ্ঞান হয়ে গেল। সকলে তার চোখে-মুখে জল দিয়ে তাকে আবার চাঙ্গা করে তুললে। তারপর বামুনঠাকুর যখন একটু ধাতস্থ হয়ে সকলের কাছে বুনির বেটা হওয়ার বিবরণ বলছে, তখন হঠাৎ রান্নাঘরের কোণ থেকে কুণি নাচতে নাচতে বেরিয়ে এসে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললে—"ও ঠাকুর! কয় দিবসের? ও ঠাকুর! কয় দিবসের?"—অর্থাৎ খোকার বয়স কদিন হল?—এবারে দত্তবাড়ীর সবাই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। আজ যাকে দেখলে, ও হচ্ছে সেই কুণি। বুনির সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। কুণি ভারি লজ্জাবতী। অচেনা লোক দেখলেই ঘোমটা দেয় আর ঘোমটার ভিতর থেকে ফিক্ ফিক্ করে হাসে।'

কথায় কথায় রাত বেড়ে যাচ্ছে দেখে আমি বললুম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় আনন্দিত হলুম। তাহলে আজ আমি আসি?'

বেহ্মদত্যি বললেন, 'সেকি, এই রাত্রে কোথায় যাবে? তার চেয়ে বেলগাছের ডালে এসে বসে দুদণ্ড বিশ্রাম কর।'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে, আমি এখনো জ্যান্ত আছি,—বেলগাছের কাঁটা আমার সহ্য হয় না। আমি আমার পৈতৃক ভিটেবাড়ী দেখতে এসেছি, আরো কতদূর যেতে হবে বলতে পারেন?'

বেহ্মদত্যি বললেন, 'তোমাদের ভিটে? হা হা হা হা! ঐ যে! হাত-পনের তফাতে চেয়ে দেখ। ঐ যে উঁচু ঢিপিটা দেখছ, ঐখানেই আগে তোমাদের বাড়ী ছিল। এখন ওখানে গো-ভূতেরা থাকে। মানুষ দেখলে তারা ভয় দেখায় না—একেবারে গুঁতিয়ে দেয়।'

আমি বললুম, 'তাহলে আজ রাতটা আমি স্টেশনেই কাটিয়ে

দেব—গোভূতদের আমি পছন্দ করি না। প্রণাম হই বেহ্মদত্যি-ঠাকুর।'

এই বলে আমি চলে আসতে যাব, এমন সময় কন্দকাটাটা আবার আমার সামনে এসে কাকুতি-মিনতি করে বললে, 'দোহাই তোমার। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, অন্ততঃ যাবার সময়েও আমাকে দেখে দয়া করে একবার ভয় পেয়ে যাও, নইলে ভূতেরা কেউ আমাকে মানবে না।'

—'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি খুব ভয় পেয়েছি'—এই বলে আমি সেখান থেকে হাসতে হাসতে চলে এলুম। আমার কথাটি ফুরুলো।'

রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র একবাক্যে মতপ্রকাশ করলে, 'ধেৎ! ডাহা গাঁজাখুরি গল্প!'

অপূর্ব বললে, 'সব ভূতের গল্পই গাঁজাখুরি। তবে কোনটাতে গাঁজার মাত্রা কম থাকে, আর কোনটাতে থাকে খুব বেশী—এই যা তফাৎ।'

মাণিকলাল বললে, 'আমার গায়ের কাঁটা গায়েই মিলিয়ে গেল। এখন আর এক কাপ চা খেয়ে গা তাতিয়ে না নিলেই নয়।'

আমি বললুম, 'বেয়ারা! চা লে আও।'

বাড়ী

পাঁচ বছর আগে আমার ভারি অসুখ হয়েছিল। সেই সময়ে রোজই রাত্রে আমি ঠিক একই স্বপ্ন দেখতুম।

স্বপ্নে দেখতুম, আমি যেন শহরের বাইরে এক পাড়াগাঁয়ে গিয়েছি।

আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে রোজই এগিয়ে যাই। পথের দুধারে কোথাও কলাগাছের ঝাড়,—বাতাসে সবুজ নিশান উড়িয়ে দিয়েছে; কোথাও মেদিগাছের বেড়া দেওয়া নানান ফুলের বাগান,—মৌমাছি আর প্রজাপতিরা সেখানে মধু চয়নের খেলা খেলছে; কোথাও তালকুঞ্জের ছায়া-দোলানো এবং কাঁচা রোদের সোনা ছড়ানো ঝরঝরে

সরোবর,—ঘাটে ঘাটে নববধূরা ঘোম্‌টায় মুখ ঢেকে কলসীতে জল ভরে নিচ্ছে।

পথ যেখানে ফুরিয়ে গেছে, সেইখানে একখানি মস্ত বাড়ী—দূর থেকে ছবির মতন দেখতে।

সামনেই ফটক, কিন্তু সেখানে কোন দারোয়ান নেই। বাড়ীর চারিদিকে জমিতে কত-রকমের গাছ—গন্ধরাজ, বকুল, রঙন, শিউলি, —আরো কত কি! মাঝে মাঝে কেনার ঝোপে রং-বেরঙের মেলা।

রোজই বেড়াতে বেড়াতে বাড়ীখানির সামনে গিয়ে দাঁড়াই,—অপলক চোখে তার পানে তাকিয়ে থাকি, ভিতরে যাবার জন্যে প্রাণে সাধ জাগে।

কিন্তু জনপ্রাণীকে দেখতে পাই না। ফটকের কাছ থেকে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করলেও কেউ সাড়া দেয় না। পরের বাড়ী, না জানিয়ে ভিতরে ঢুকতেও ভরসা হয় না। ফিরে আসি।

রাতের পর রাত যায়,—আমি খালি ঐ একই স্বপ্ন দেখি। বার বার অনেকবার ঐ একই স্বপ্ন দেখে দেখে আমার মনে দৃঢ় ধারণা হল যে, অজ্ঞাত শৈশবে নিশ্চয়ই কারুর সঙ্গে আমি ঐ বাড়ীতে গিয়েছিলুম।

আমার অসুখ সেরে গেল। কিন্তু তবু সেই স্বপ্নে-দেখা বাড়ীকে ভুলতে পারলুম না। মাঝে মাঝে এদেশ-ওদেশ বেড়াতে যেতুম। পথে বেরুলেই চারিদিক লক্ষ্য করে দেখতুম, স্বপ্নের বাড়ী খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

একবার এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে কুসুমপুর গ্রামে যাই।

বৈকালে বেড়াতে বেরিয়ে একটা গেঁয়োপথ পেলুম। দেখেই চিনলুম, এ আমার সেই স্বপ্নে-দেখা পথ। পথের দুধারে সেই কলাগাছের ঝাড়, মেদিগাছের বেড়া দেওয়া বাগান, আলো-ছায়া-ভরা পুকুরঘাট। অনেকদিন অদর্শনের পর পুরানো বন্ধুকে দেখলে মনে যে আনন্দের ভাব জাগে, আমারও মনে তেমনি ভাবের ছোঁয়া লাগলো।

আঁকাবাঁকা পথের শেষে ছবির মতন সেই বাড়ীখানি।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ডাকাডাকি করতে লাগলুম।

ভেবেছিলুম, কারুর সাড়া পাব না। কিন্তু আমার ডাক শুনেই একজন বুড়ো দারোয়ান ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

—'কাকে চান?'

—'কারুকে নয়। এই বাড়ীখানা আমার বড় ভালো লেগেছে। ভিতরে ঢুকে একবার দেখতে পারি কি?'

—'আসুন না! এ বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে।'

—'বাড়ীওয়ালা কোথায় থাকেন?'

—'এইখানেই থাকতেন। কিন্তু কিছুদিন হল, এ বাড়ী ছেড়ে দিয়েছেন।'

—'বল কি! এমন চমৎকার বাড়ী কেউ ছেড়ে দেয়?'

—'ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।'

—'কেন?'

—'ভূতের উপদ্রবে।'

—'ভূত! একালেও লোকে ভূত বিশ্বাস করে নাকি?'

দারোয়ান গম্ভীর মুখে বললে, 'আমিও বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু এখন বিশ্বাস না করে উপায় নেই। যে ভূতটার ভয়ে আমার মনিব এ বাড়ী ছেড়েছেন, রাত্রে আমিও তাকে স্বচক্ষে অনেকবার দেখেছি। তার মুখ আমি ভুলিনি।'

অবহেলার হাসি হেসে আমি বললুম, 'ডাহা গাঁজাখুরি গল্প।'

দারোয়ান বিরক্তভাবে আমার মুখের দিকে তাকালে। বললে, 'গাঁজাখুরি গল্প? অন্ততঃ আপনার মুখে এ কথা শোভা পায় না। অনেকবার যে ভূতকে আমি দেখেছি, যার মুখ আমি এ জীবনে ভুলব না,—সে হচ্ছেন আপনি নিজে! আমি আপনাকেই দেখেছি!'

(ফরাসী লেখক Andre Mauroisএর একটি বিখ্যাত গল্প অবলম্বনে।)

মাথা-ভাঙার মাঠে

মোহনপুরের পিরু-দরজীর ছেলে দিলু বা দিলদারের বয়স হল প্রায় ষোলো, কিন্তু আজও সে বাপের কোন উপকারেই লাগল না। পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে দিন-রাত সে খেলা-ধূলো করে বেড়ায়, পরের বাগানের ফল চুরি করে এবং ইস্কুলে যাবার নামও মুখে আনে না।

দিলুকে পিরু বাপু-বাছা বলে মিষ্টি কথায় অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু দিলু সেসব কানেও তোলেনি। দিলুর পিঠে পিরু অনেক লাঠিই ভেঙেছে, তবু দিলু সায়েস্তা হয়নি। দেখে-শুনে পিরু হাল ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু সেদিন পিরুর পকেট থেকে যখন কুড়িটা টাকা চুরি গেল এবং তার সন্দেহ হল ছেলের উপরেই, তখন আর সে সহ্য করতে পারলে না,—দিলে দিলুকে দূর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে।

দিলু হচ্ছে মহা ডানপিটে ছোকরা, বাড়ী থেকে গলাধাক্কা খেয়েও সে কিছুমাত্র দমল না। সারাদিন পথে-বিপথে হৈ-চৈ করে বেড়াল এবং সন্ধ্যের পরে 'মাথা-ভাঙার মাঠে' গিয়ে একটা তালগাছের তলায় বসে চীৎকার করে গান গাইতে লাগল।

এখন, এই 'মাথা-ভাঙার মাঠে'র একটুখানি ইতিহাস আছে। আগে এ-মাঠে সন্ধ্যের পরে ভয়ে কেউ হাঁটত না; কারণ ডাকাতেরা লাঠি মেরে পথিকদের মাথা ভেঙে সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিত। এখন আর ডাকাতের ভয় নেই বটে, তবু সন্ধ্যের পরে ভয়ে কেউ এ-মাঠ মাড়ায় না; কারণ এখানে নাকি ভয়ানক ভূত-প্রেতের ভয়।

কিন্তু ডানপিটে দিলুর এতবড় বুকের পাটা যে, এমন জায়গায় এসেই সে গান জুড়ে দিয়েছে।

রাত বারোটা পর্যন্ত গান গাইবার পর ক্ষিধের চোটে দিলুর

পেটের নাড়ি টনটন করতে লাগল। তখন সে আস্তে আস্তে উঠে গাঁয়ের দিকে ফেরার চেষ্টা করলে।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই খানিক তফাতে কাদের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কারা কথা কইতে কইতে এই দিকেই আসছে।

'মাথা-ভাঙার মাঠে' রাত দুপুরে মানুষের সাড়া পাওয়া যায়, এমন অসম্ভব কথা দিলু কোনদিন শোনেনি। তবে কি সত্যি সত্যিই—

ভয়ে দিলুর মাথার চুলগুলো সটান খাড়া হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি কোন্‌দিকে চম্পট দেবে তাই ভাবছে, এমন সময়ে চাঁদের আলোয় দেখতে পেলে, কারা সব দল বেঁধে একেবারে তার সুমুখে এসে পড়েছে।

গুন্‌তিতে তারা বিশজন। মানুষের মত দেহ, অথচ প্রত্যেকেই উঁচুতে মোটে এক হাত। তাদের অনেকেরই মাথার চুল আর গোঁফ-দাড়ি পেকে গেছে বটে, কিন্তু তবু তারা ছোট ছোট খোকার চেয়ে বেশী ঢ্যাঙা হতে পারেনি।

দিলু চোখ কপালে তুলে অবাক হয়ে ভাবছে—এ আবার কোন্ মুল্লুকের মানুষ রে বাবা,—এমন সময়ে দলের ভিতর থেকে একটা লোক তার কাছে এগিয়ে এল। সে লোকটা বেজায় বুড়ো, বেজায় বেঁটে, আর তার শণের মত পাকা দাড়ি পা পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে।

বুড়ো বললে, 'এই যে বাপের অবাধ্য ছেলে দিলু! আমরা তোমাকেই এতক্ষণ খুঁজছিলুম।'

দিলু জবাব দেবে কি, তার দাঁতে দাঁত লেগে গেল।

বুড়ো আবার বললে, 'বুঝেছ দিলু? আমরা তোমাকেই খুঁজছিলুম।'

দিলু তেমনি চুপচাপ।

বুড়ো আবার বললে, 'আমরা তোমাকেই খুঁজছিলুম। বার বার তিনবার আমি কথা কইলুম। তুমি যে জবাব দিচ্ছ না?'

তবু দিলু জবাব দিলে না।

বুড়ো তখন সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললে, 'দিলু জবাব দেবে না। তোমাদের কাজ তোমরা কর।'

দলের অন্য লোকগুলো কি-একটা লম্বা মোট বয়ে আনছিল, হঠাৎ তারা সেই মোটটাকে ধুপ. করে দিলুর পায়ের তলায় ফেলে দিলে।

সেটা একটা মড়া।

বুড়ো বললে, 'দিলু, ঐ মড়াটাকে কাঁধে তুলে নাও।'

দিলু আঁৎকে উঠে বললে, 'ওরে বাপরে! সে আমি পারব না'—বলেই সে দৌড়ে পালাতে গেল।

কিন্তু সেই ক্ষুদে ক্ষুদে লোকগুলো চারিদিক থেকে ছুটে এসে তাকে একেবারে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে। তারপর তারা মড়াটাকে তুলে এনে দিলুর পিঠের উপরে চাপিয়ে দিলে। ভীষণ আতঙ্কে ও বিস্ময়ে দিলু বুঝতে পারলে যে, মড়ার হাত দুটো তার গলা আর পা দুটো তার কোমর বিষম জোরে চেপে ধরলে! ভূতের পাল্লায় পড়ে দিলুর প্রাণ বুঝি আজ যায়! মড়াটাকে পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল, 'বাবার অবাধ্য হয়ে পাপ করেছি বলেই এই ভূতগুলো আজ আমার উপরে এতটা তম্বি করতে পারছে। এই নাক-কান মলছি, আর কখনো বাপ-মায়ের অবাধ্য হব না।'

বুড়ো বললে, 'দিলু, যখন আমি তোমাকে মড়াটা তুলতে বললুম, তখন তুমি আমার কথা শুনলে না। এখন যদি আমি তোমাকে বলি যে—"মড়াটাকে গোর দিয়ে এস," তাহলেও তুমি বোধহয় আমার কথা শুনবে না?'

দিলু কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'শুনব হুজুর, শুনব! পিঠের আতঙ্ক এখন পিঠ থেকে নামাতে পারলেই বাঁচি।'

বুড়ো খল খল করে হেসে বললে, 'বেশ বেশ! এরি মধ্যে তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে খুসি হলুম। এখন যা বলি, শোনো। আজ রাত্রের মধ্যেই তুমি যদি ঐ মড়াটাকে গোর না দাও, তাহলে তোমার ভয়ানক বিপদ হবে। এ গাঁয়ের গোরস্থানে আগে যাও। সেখানে

যদি সুবিধে না হয়, তবে অন্য গাঁয়ের গোরস্থানে যেতে হবে। সেখানেও অসুবিধে হলে আবার অন্য কোন গাঁয়ের গোরস্থানে যাবে। মোদ্দা কথা, আজ রাত পোয়াবার আগেই ঐ মড়াটাকে গোর দেওয়া চাইই চাই। নইলে মজাটা টের পাবে। এখন বিদেয় হও—খবর্দার, আর পিছন ফিরে তাকিও না।'

পিঠে মড়া নিয়ে, তার ভারে হুমড়ে পড়ে দিলু এগুতে লাগল। আকাশে চাঁদের মুখও তখন মড়ার মুখের মতই হলদে দেখাচ্ছে, পৃথিবীর কোনদিক থেকেই জনপ্রাণীর সাড়া আসছে না, গাছগুলো পর্যন্ত যেন দিলুর পিঠের ভয়ঙ্কর বোঝা দেখে স্তম্ভিত ও আড়ষ্ট হয়ে আছে,—কোন শব্দ করছে না। ভালো ছেলেরা এখন পেট ভরে খেয়ে-দেয়ে নরম বিছানায় শুয়ে আরাম করে ঘুমোচ্ছে—আর এই নিশুত রাতে কেবল দিলুকেই কিনা একটা ভুতুড়ে, পচা মড়া পিঠে নিয়ে একলাটি গোরস্থানের দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। নিজের অবাধ্যতার ফল হাতে-হাতে পেয়ে তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

ঐ তো গাঁয়ের গোরস্থান। দলে দলে বড় বড় কালো কালো গাছ গোরস্থানের চারিদিক ঢেকে দাঁড়িয়ে থেকে চাঁদের আলোকে তার কাছে আসতে দিচ্ছে না।

অমন যে ডানপিটে ছেলে দিলু, তারও বুক এখন আতঙ্কে ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। একবার ভাবলে, এক ছুটে পালিয়ে যাই। তারপরেই লম্বা-দাড়ি, এক-হাত উঁচু বুড়ো আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথা দিলুর মনে পড়ল। নিশ্চয়ই তারা কোথাও লুকিয়ে লুকিয়ে সবই লক্ষ্য করছে। না বাবা, আর তাদের পাল্লায় পড়া নয়! যেমন করে হোক, মড়াটাকে গোর না দিয়ে আজ আর কোন কথা নয়!

গোরস্থানের এক জায়গায় একটা মস্ত গাছ ডাল-পালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু তার কোথাও একটা পাতা পর্যন্ত নেই। শুকনো ডালপালাওয়ালা মরা গাছটাকে দেখলেই মনে হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড কঙ্কাল অনেকগুলো হাত বাড়িয়ে সবাইকে শাসাচ্ছে।

দিলু তার তলায় গিয়ে ভাবতে লাগল, 'তাইতো, গোরস্থানে তো এলুম, কিন্তু কোদালও নেই কুড়ুলও নেই, এখন মাটি খুঁড়ব কেমন করে? হে লম্বা-দাড়ি বুড়ো হুজুর! আপনি কোথায় আছেন জানিনা, কিন্তু—'

দিলুর কানে কানে কে বললে, 'ঐ শুকনো গাছের তলায় চেয়ে দেখ।'

দিলু ভড়কে ও চমকে চারিদিকে তাকিয়েও কারুকে দেখতে পেলে না। তবে কে তার কানের কাছে কথা কইলে?

আবার কে বললে, 'ঐ শুকনো গাছের তলায় চেয়ে দেখ।'

দিলুর গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কিছুই না বুঝে সে বললে, 'তুমি আবার কে বাবা? দেখা দাও না, অথচ কথা কও?'

—'আমি হচ্ছি তোমার পিঠের মড়া।'

—'কি বিপদ! তুমিও আবার কথা কইতে পারো নাকি?'

—'হুঁ, মাঝে মাঝে পারি।'

—'তাহলে দয়া করে আমার পিঠ থেকে নামো না বাবা! আমি একটু জিরিয়ে নি।'

—'আগে আমাকে গোর দেবার ব্যবস্থা কর। ঐ শুকনো গাছের তলায় চেয়ে দেখ।'

দিলু গাছের তলায় চেয়ে দেখলে সেখানে একখানা কুড়ুল আর একখানা কোদাল পড়ে রয়েছে।

তার কানে কানে মড়াটা ফিস্ ফিস্ করে ক্রমাগত বলতে লাগল, 'আমাকে গোর দাও—আমাকে গোর দাও।'

দিলু তাড়াতাড়ি কুড়ুল ও কোদাল তুলে নিয়ে এসে মাটি খুঁড়তে লেগে গেল। খানিকক্ষণ খোঁড়বার পরেই তার কুড়ুলটা কোন একটা জিনিসের উপরে গিয়ে পড়ল। দিলু হেঁট হয়ে তাকিয়ে দেখলে, একটা কফিন গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে! কফিনের ডালা খুলে দেখা গেল, তার ভিতরেও রয়েছে আর একটা মড়া!

দিলু বললে, 'একই গোরে দুটো লাশ রাখা তো চলবে না। ওহে

আমার পিঠে-মড়া মড়া মনিব। তোমাকে এখানে গোর দিলে তুমি আপত্তি করবে না তো?'

মড়া জবাব দিলে না।

দিলু মনে মনে বললে, 'বাঁচা গেছে, মড়াটা এইবারে বোধহয় আবার বোবা হল, কথা কয়ে আর আমাকে ভয় দেখাবে না'—এই বলে সে হাতের কুড়ুলটা অন্যমনস্ক হয়ে ফেলে দিলে। কিন্তু কুড়ুলটা গিয়ে পড়ল গোরের ভিতরকার মড়াটার গায়ের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে গোরের ভিতরেই মড়াটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে যাতনায় চেঁচিয়ে উঠল, 'উঃ! হুঃ!! হুঃ!!!—যা! যা!! যা!!! নইলে এখনি মরবি, মরবি, মরবি!' বলেই আবার সে কবরের ভিতরে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে পড়ল।

দিলুতে তখন আর দিলু ছিল না। তার মাথার চুলগুলো যেন সজারুর কাঁটার মতন সিধে হয়ে উঠেছে আর সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর করে ঘাম ছুটছে। অন্ধের মত চোখ বুঁজে চট্‌পট্‌ কোদাল দিয়ে মাটি তুলে সে কবরটা আবার বুঁজিয়ে দিলে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'বাপ! আর বোধহয় ওটা মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।'

খানিক হাঁপ ছেড়ে দিলু আরো কয় পা এগিয়ে আবার মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করলে। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, সে কবরটার ভিতরে রয়েছে একটা শুঁট্‌কী বুড়ীর মড়া। এ মড়াটা বোধহয় আগের মড়াটার চেয়েও বেশী জ্যান্ত! কারণ, ভালো করে মাটি খুঁড়তে না খুঁড়তেই সে চট্‌ করে উঠে বসে চ্যাঁচাতে সুরু করলে—'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ! কে রে ছোঁড়া তুই? কে রে ছোঁড়া তুই?'

দিলু ভয়ে পেছিয়ে এল।

কোন জবাব না পেয়ে শুঁট্‌কী বুড়ীর মড়াটা ধীরে ধীরে দুই চোখ মুদে ফেললে, তারপর ধীরে ধীরে আবার কবরের ভিতরে শুয়ে পড়ল। দিলুও যে তখনি তাকে মাটি চাপা দিতে দেরি করলে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সে আবার আর একটা জায়গা খুঁড়তে সুরু করলে। কিন্তু এবারে যেই মাটির ভিতর থেকে আর একটা মড়ার একখানা হাত দেখা গেল, অমনি সে তার উপরে মাটি চাপা দিয়ে বললে, 'নাঃ, এ গোরস্থানে দেখছি সব কবরই আজ ভর্তি !···এখন আমার উপায় কি হবে? আমার পিঠের মড়া পিঠ থেকে নামাই কেমন করে? এ গাঁয়ে তো আর কোন গোরস্থান নেই।'

যাঁহাতক্ এই কথা বলা, পিঠের মড়া অমনি দিলুর কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'মামুদপুরের গোরস্থানে। ঐদিকে।'—বলেই মড়া তার বাঁ হাতখানা এগিয়ে দিয়ে অঙ্গুলীনির্দেশ করলে।

প্রাণের দায়ে দিলু সেইদিকেই অগ্রসর হল। দু-চারবার এবড়ো-খেবড়ো আঁকাবাঁকা পথে সে হোঁচট খেয়ে 'পপাত ধরণীতলে' হল, কিন্তু তার গলা ও কোমর থেকে মড়ার হাত-পায়ের বজ্র-আঁটুনি তবু আল্‌গা হল না। তার পিঠের উপরে এই বিভীষণ মোট দেখে প্যাঁচারা চেঁচিয়ে বাদুড়দের শুনিয়ে কি যেন বলতে লাগল,—আশ-পাশের জলাভূমির মধ্যে আলেয়ার আলোগুলো যেন আরো বেশী জ্বল্‌জ্বলে ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। দিলু বারংবার নিজের মনেই প্রার্থনা করতে লাগল—আল্লা, আমাকে দয়া কর! আল্লা, আমাকে দয়া কর। মামুদপুরকে তাড়াতাড়ি কাছে এনে দাও!

শেষটা সে মামুদপুরে এসে হাজির হল।

মড়া বললে, 'ঐ গোরস্থান। আমাকে গোর দাও—শীগ্‌গির আমাকে গোর দাও!'

এইবারে এই ছিনে-জোঁক দুর্দান্ত মড়ার কবল থেকে নিস্তার পাবে বলে দিলু হন্‌হন্ করে পা-দুটো গোরস্থানের দিকে চালিয়ে দিলে।

কিন্তু বেশী এগুতে হল না,—হঠাৎ দিলু মুখ তুলেই চক্ষু স্থির করে রইল! ওরে বাবা!

মামুদপুরের গোরস্থানের পাঁচিলের উপরে পালে পালে ভূত আর পেত্নী বসে আছে। কেউ খুব-বুড়ো, কেউ আধা-বুড়ো, কেউ যুবো,

আর কেউ-বা শিশু। তাদের প্রত্যেকের চোখ উনুনের জ্বলন্ত কয়লার মত দপ্ দপ্ করছে।

একটা বেজায় রোগা আর ঢ্যাঙা ভূত হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মাথার উপরে দুটো হাত নেড়ে ক্রমাগত বলতে লাগল—'এখানে হবে না—এখানে ঠাঁই নেই—এখানে হবে না—এখানে ঠাঁই নেই—এখানে হবে না'—প্রভৃতি।

আর একটা বেজায় মোটা ভূত হঠাৎ পাঁচিল থেকে মাটির উপরে থপাস্ করে লাফিয়ে পড়ে খোনা সুরে বলতে লাগল—

'শোন্ তবে কান পেতে ওরে দুরাচার।
তোকে মোরা খাব করে চাট্নি-আচার।
চোখদুটো ছিঁড়ে নিয়ে খেলা যাবে ভাঁটা,
আঙুল ভাজিয়া হবে চচ্চড়ীর ডাঁটা।
লোমে তোর বানাইব শীতের কম্বল।
মেটুলিতে হবে খাসা রসালো অম্বল,
ঠ্যাঙের রাঙেরে খাব করিয়া ডান্‌লা।
নাড়ী-ভুঁড়ি শুষ্ক করি টাঙাব আন্‌লা,
হৃৎপিণ্ড কাটিয়া হবে দেয়ালের ঘড়ি,
হাড়ের গুঁড়োতে হবে দাঁত-মাজা খড়ি।
শোন্ ছুঁচো, কাণামাছি, শোন্ রে মশক।
চুল-দাড়ি ছেঁটে নিয়ে করিব তোষক।
চেঁচে নিলে ছালখানা গায়ে হবে জামা,
নাদা পেটে তৈরি হবে তোফা এক ধামা।'

এ-রকম সব ভয়ানক কথা শুনলে কোন ভদ্রলোকেরই আর এগুবার ভরসা হয় না—দিলুরও হল না। কিন্তু দিলুর পিঠের মড়া তার কানে কানে বললে, 'গোর দাও, গোর দাও, আমাকে গোর দাও!' বলতে বলতে সে তার হাতের বাঁধন এমন শক্ত করে তুললে যে, দম বন্ধ হয়ে দিলুর প্রাণ যায় আর কি।

কি আর করে,—মরেছি, না মরতে আছি, যা হবার তাই হোক্,

—এই ভেবে দিলু পায়ে-পায়ে আবার এগুতে সুরু করল।

আর যায় কোথা? মামুদপুরের গোরস্থানের ভূত-পেত্নীরা পাঁচিলের উপরে দাঁড়িয়ে উঠে খন্‌খনে আওয়াজে সমবেত সঙ্গীত আরম্ভ করলে—

'ধর্ ধর্! মার্ মার্! হুম্ হুম্ হুম্ হুম্।
ঠাস্ করে মার্ চড়, আর কিল গুম্-গুম্।
গো-ভূতকে ডেকে আন্—শিঙে তার খুব ধার।
মামদোরা তেড়ে যাক্—হুঁসিয়ার! মার্ মার্!'

আচম্বিতে কোথা থেকে দুখানা অদৃশ্য হাত এসে দিলুর চুলের মুঠি ধরে বারকয়েক ঝাঁকানি মেরে, তাকে শূন্যে তুলে বলের মত চার-পাঁচবার লোফালুফি করলে এবং তারপরে তার দেহটাকে পাশের এক খানায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

সেই বিশ্রী একগুঁয়ে মড়াটা তবু দিলুর পিঠ ছেড়ে একটুও নড়ল না। কোনরকমে আধ-মরা হয়ে দিলু হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলে, পাঁচিলের উপরে তাল ঠুকতে ঠুকতে ভূত-পেত্নীরা তখন গাইছে—

'আয় দিকি, আয় দিকি! ফের হেথা আয় দিকি।
এবারেতে করে দেব ঢিকি-ঢিকি হিকি-হিকি!'

'ঢিকি-ঢিকি হিকি-হিকি' যে কাকে বলে, দিলু তা জানত না—জানবার সাধও তার আর ছিল না। সে খালি কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে, 'ওগো পিঠে-চড়া মড়া মশাই! মরেও যখন আপনি মরেননি, তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন? আর কি ওখানে আমাদের যাওয়া উচিত? তাহলে আমি তো মরবই, আপনারও হাড় কখানা আর আস্ত থাকবে না।'

মড়া হঠাৎ তার একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে একদিকে অঙ্গুলী-নির্দেশ করে বললে, 'হোসেন-ডাঙার গোরস্থান! ঐদিকে!'

দিলু বললে, 'আবার! আপনি তো মরেছেনই, এবারে আমাকেও মারলেন দেখছি!'

একটা খোঁড়া ভূত তখন নেংচে নেংচে নাচতে নাচতে গান ধরেছে—

'দেব তেড়ে শিং নেড়ে তোর পেটে ঢুঁ,
হুস করে যাবি উড়ে ঝাড়ি যদি ফুঁ!
ভারি আমি কড়া লোক, ভয়ানক গোঁ।
ঠাস্ করে খাবি চড়্ কান হবে ভোঁ।
সুড় সুড় সরে পড়, কোরোনাকো টুঁ!'

দিলুর আর টুঁ শব্দ করবার সাধও ছিল না। সে কাঁপতে কাঁপতে ও মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে কোনক্রমে আবার এগিয়ে চলল। সে বেশ বুঝলে, আজ আর তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। পাগলের মত কতক্ষণ সে যে পথ চলল, কিছুই জানতে পারলে না, কিন্তু মড়াটা যখন আচম্বিতে তার কানে কানে বললে, 'ঐ হোসেন-ডাঙার গোরস্থান',—তখন সে চমকে চেয়ে দেখলে, পূর্ব-আকাশের অন্ধকার বুকের ভিতর থেকে একটু একটু করে রূপোলী আলোর আভা ফুটে উঠছে।

মড়া বললে, 'আর সময় নেই—আর সময় নেই! গোর দাও, আমাকে গোর দাও।'

কিন্তু আগেকার গোরস্থানে যে-কাণ্ডটা হয়েছিল, সেটা মনে করে দিলু আর অন্ধের মত এগিয়ে গেল না। ভালো করে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে যখন সে দেখলে, ভূত-পেত্নীরা এখানেও সমবেত-সঙ্গীত গাইবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেই, তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে খুব সাবধানে হোসেন-ডাঙার গোরস্থানে প্রবেশ করলে।

মড়া আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ঐখানে। ঐখানে!'

দিলু আরো কয়েক পদ অগ্রসর হয়েই দেখলে, একটা কবরের পাশেই একটা কফিন পড়ে রয়েছে। কবরটা নতুন খোঁড়া হয়েছে এবং কফিনের ভিতরে মড়া-টড়া কিছু নেই।

দিলু বললে, 'বুঝেছি মড়া মশাই, বুঝেছি। আপনি আমার

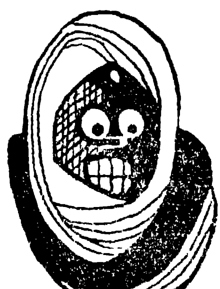
পিঠে চড়ে আজ আরাম করবার জন্যে এই কফিন থেকেই পালিয়ে এসেছেন। কিন্তু আগেই এ-কথাটা জানিয়ে দিলে আমাকে তো আর এমন সাত ঘাটের জল খেয়ে মরতে হত না।'

মড়া ঠিক মড়ার মতই বোবা হয়ে রইল।

দিলু তখন কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অমনি রাত বারোটা থেকে যে ভয়ানক মড়াটা তার পিঠ ছেড়ে একবারও নামবার নাম করেনি, হঠাৎ সে তার হাত আর পা দুটো দিলুর গলা আর কোমর থেকে খুলে নিয়ে ধপাস্ করে সেই কবরের কফিনের ভিতরে গিয়ে পড়ে একেবারে স্থির হয়ে রইল। পাছে আবার তার জ্যান্ত মানুষের পিঠে চড়বার সখ হয়, সেই ভয়ে দিলু খুব তাড়াতাড়ি তার উপরে মাটি চাপা দিয়ে ফেললে।

বাড়ীতে ফিরে এসে দিলু তার বাবার দুই পা ধরে বললে, 'বাবা, আজ থেকে তুমি যা বল তাই শুনব।'

দিলু নিজের কথা রেখেছিল। সে আর কখনো বাবার অবাধ্য হয়নি।





এক ॥ পথের নেশা

একদিন এক খোকাবাবু তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ বাবা, এ কে?'

খোকার বাবা বললেন, 'ভাল্লুক'।

খোকার মুখ দিয়ে বোধহয় 'ক' বেরুল না। সে নিজের ভাষায় সংশোধন করে নিয়ে বললে 'ভাল্লু!'

সেইদিন থেকে সবাই তাকে 'ভাল্লু' বলে ডাকতে আরম্ভ করলে।

ভাল্লু জন্মেছিল হিমালয়ের জঙ্গলে, সুতরাং বুঝতেই পারছ, সে হচ্ছে রীতিমত বড়-ঘরের ছেলে। ভল্লুক-বংশে যারা কুলীন বলে মর্যাদা পায়, তাদের সকলেরই জন্ম গিরিরাজ হিমালয়ের কোলে।

ভাল্লু যখন মায়ের দুধ ছাড়েনি, সেই সময়ে হঠাৎ সে এক

শিকারীর হাতে ধরা পড়ে। তারপর শিকারী তাকে যার কাছে বেচে ফেলে, তার ব্যবসা ছিল ভাল্লুক আর বাঁদরের খেলা দেখানো। তার কাছ থেকে ভাল্লুও নানানরকম খেলা শিখলে—এমন কি 'ওরিয়েণ্টাল ডান্স' পর্যন্ত। লোকে তার বুদ্ধি আর খেলার কায়দা দেখে বাহবা দিত ঘন ঘন।

তা ভাল্লু যে বিশেষ বুদ্ধিমান হবে, এটা খুব আশ্চর্য কথা নয়। তার অমর ও ভারতবিখ্যাত পূর্বপুরুষ ভল্লুকরাজ জাম্ববানের নাম কে না জানে? জাম্ববান ছিলেন বানররাজ সুগ্রীবের প্রধানমন্ত্রী এবং অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ-সভার একজন প্রধান সভ্য। জাম্ববানের বীরত্ব, সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং কুস্তি লড়বার ও চপেটাঘাত করবার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত তাঁর জামাই না হয়ে পারেননি।

যে লোকটা ভাল্লুক নিয়ে দেশে দেশে খেলা দেখিয়ে বেড়াত হঠাৎ সে মারা পড়ল। চার বছর বয়সে ভাল্লু বেচারি হল আবার অনাথ। সেই সময়ে কে তাকে নিয়ে গিয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় ভর্তি করে দেয়। আজ এক বছর সে চিড়িয়াখানায় বাস করছে।

কিন্তু চিড়িয়াখানা তার মোটেই পছন্দ হত না। বরাবর দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়ানো তার অভ্যাস, এইটুকু একটা লোহার রেলিং-ঘেরা কুঠুরির ভিতরে দিন-রাত অলসের মতন বসে থাকতে তার ভালো লাগবে কেন? বিশেষ, ভাল্লু হচ্ছে একটি বড় দরের আর্টিস্ট। কত কষ্ট করে সে দুর্লভ নৃত্যবিদ্যা শিখেছে—অথচ এখানে কেউ তাকে ডুগডুগি বাজিয়ে নাচ দেখাতে বলে না। মাঝে মাঝে নাচবার জন্যে তার পা দুটো নিসপিস করে উঠত, কিন্তু সঙ্গতের অভাবে তার ইচ্ছা হত না পূর্ণ।

রোজই খোকা-খুকির দল তার ঘরের সামনে এসে কৌতূহলে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকত। ভাল্লু রেলিংয়ের কাছে গিয়ে নিজের ভাষায় বলত, 'ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ!' অর্থাৎ—'হে খোকা-খুকিগণ, তোমরা কেউ একটা ডুগডুগি নিয়ে আসতে পার?'

কিন্তু মানুষের ছেলে-মেয়েরা ভল্লুক-ভাষা বুঝতে পারত না, তারা ভাবত সে বোধহয় খাবার-টাবার কিছু চাইছে। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে খাঁচার ভিতরে এসে পড়ত কলা বা ছোলা বা অন্য কোন-রকম শস্তা দামের ফলমূল।

ভাল্লু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবত, মানুষদের ছেলে-পুলেরা আর্ট বোঝে না, ললিতকলার চেয়ে চাঁপাকলার দিকেই তাদের বেশী টান।

মাঝে মাঝে তার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ত। সেই বিরাট হিমালয়! তুষার-মুকুট উঠেছে তার নীলাকাশের অসীমতায়, শিখরের পর শিখরের আশপাশ দিয়ে সাদা সাদা মেঘেরা ভেসে যাচ্ছে তাকে প্রণাম করে। নীচের দিকে তুলছে তার গভীর অরণ্যের সবুজ অঞ্চল—সেখানে মিষ্টি গান গাইছে কত পাখি, আতরের ভুরভুরে গন্ধ বিলিয়ে দিচ্ছে কত ফুল, রংচঙে টুকরো উড়ন্ত ছবির মতন ঘোরাফেরা করছে কত প্রজাপতি। জঙ্গলের বুকের ভিতরে আলো-আঁধার-মাখা রহস্যময় স্বপ্নপুর, তারই মধ্যে ছিল তার সুখের বাসা।

ভাল্লু একদিন খাঁচার এক কোণে উপুড় হয়ে শুয়ে এইসব কথা ভাবছে, এমন সময় তার রক্ষক এসে খাঁচার দরজা খুললে।

ভাল্লু মানুষদের অত্যন্ত পোষ মেনেছিল। তার চেহারা ছিল প্রকাণ্ড এবং তার লম্বা লম্বা দাঁত-নখ দেখলে সকলেই ভয় পেত বটে, কিন্তু যারা তাকে চিনত তারা বলত, ভাল্লুর মেজাজ খরগোসের চেয়েও ঠাণ্ডা। সে কোনদিন পালাবার চেষ্টা করেনি, কারুকে তেড়ে যায়নি, বা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ধমক দেয়নি। কাজেই রক্ষক প্রায়ই খাঁচার দরজা বন্ধ না করেই নিজের কাজকর্ম সারত।

ভাল্লুর বাসা ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে উপরে ছাদ ছিল না—তিন পাশে ছিল কেবল লোহার রেলিং। যেদিকে রেলিং ছিল না সেইদিকে ছিল একটি ছোট ঘর। রাতের বেলায় ভাল্লু এই ঘরে ঢুকে শুয়ে শুয়ে দেখত হরেকরকম স্বপ্ন।

ভাল্লু যে রেলিংয়ের পাশে উপুড় হয়ে ছেলেবেলার স্বাধীনতার

কথা ভাবছে, রক্ষক সেটা আন্দাজ করতে পারলে না। সে ভিতরের ঘরটা ঝাঁট দিতে গেল।

খানিক পরে ঘর ঝাঁট দিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে দেখে, খাঁচার ভিতরে ভাল্লু নেই। তাড়াতাড়ি খাঁচার খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়েও সে ভাল্লুকে দেখতে পেলে না।

খিদিরপুরের দিকে চিড়িয়াখানায় ঢোকবার যে ছোট দরজা আছে, ভাল্লু ততক্ষণে সেইখানে গিয়ে হাজির হয়েছে।

চিড়িয়াখানার তুইজন কর্মচারী দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ তাঁরা দেখলেন একটা মস্ত বড় ভীষণ ভাল্লুক ছুটতে ছুটতে তাঁদের দিকেই আসছে।

সে-অবস্থায় প্রত্যেক ভদ্রলোকের যা করা উচিত, তাঁরা তাই-ই করলেন—অর্থাৎ বিনা বাক্যবয়ে এক এক লাফ মেরে দরজার বাইরে গিয়ে প'ড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পথ খোলা পেয়ে ভাল্লু একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। আজ এক বছর রাস্তায় বেরিয়ে ভাল্লুর মনে আনন্দ আর ধরে না। এমনি কত রাস্তায় সে কত না খেলা দেখিয়েছে—আহা, রাস্তা চমৎকার জায়গা! সে আবার ধুলোয় শুয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

একটি ফিটফাট মেম নাক শিকেয় তুলে চিড়িয়াখানার দিকে আসছিল। হঠাৎ মেমের সন্দেহ হল, তার নাকের ডগায় ধুলো লেগেছে। সে তখনই দাঁড়িয়ে পড়ে ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর থেকে বার করলে পুঁচকে আরসি ও পাউডারের তুলি। তারপর একহাতে আরসি ও আর একহাতে তুলি ধরে নাকের ডগায় পাউডার মেখে সে চোখ নামিয়ে দেখলে এক অসম্ভব তুঃস্বপ্ন।

ভাল্লু আজ পর্যন্ত কোন মানুষকে নাকের ডগায় পাউডার ঘষতে দেখেনি। সে মেমের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে ছিল।

ঠিকরে পড়ল মেমের হাত থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ, পাউডারের

তুলি ও সৌখীন আয়না। বিকট এক আর্তনাদ, এবং মূর্ছিত মেমসায়েব পপাত ধরণীতলে।

এদিকে এক মিনিটের মধ্যে রাস্তা জনশূন্য। একদল পথের কুকুর ঘেউ ঘেউ করে এগিয়ে এল। কিন্তু ভাল্লু একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই তারা ল্যাজ গুটিয়ে চম্পট দিলে।

আগেই বলেছি, ভাল্লু হচ্ছে বুদ্ধিমান জাম্ববানের বংশধর। হনুমানের বংশধর হয় হনুমান, জাম্ববানের বংশধরই বা জাম্ববান হবে না কেন? কাজেই তার বুঝতে বিলম্ব হল না যে, চিড়িয়াখানার লোকেরা এখনি তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে ছুটে আসবে।

কিন্তু সে আর চিড়িয়াখানায় ফিরে যেতে রাজি নয়। আজ সে হিমালয়ের স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। আজ পেয়ে বসেছে তাকে পথের নেশা—পথের পর পথ, তারপর আবার পথ, নূতন নূতন দেশ আর পথ, পথ আর দেশ। তারপর সে হয়ত আবার খুঁজে পাবে তার সেই দূর-দুরান্তরে হারিয়ে-যাওয়া কত সাধের হিমালয়কে।

এখন, কেমন করে মানুষদের চোখে ধুলো দেওয়া যায়?

ভাল্লু এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখলে, কেউ কোথাও নেই। মেমসায়েব শুয়ে শুয়ে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে তাকে দেখেই আবার প্রাণপণে চোখে মুদে ফেললে।

সামনেই ছিল একটা মস্তবড় ঝুপসি গাছ। ভাল্লু চট্‌পট্ গাছে চড়ে ঘন পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুই॥ সাহসিনী মিসেস্ দস্তিদার

দিব্য ব্ল্যাক-আউটের রাত। আকাশে একফালি চাঁদ আছে বটে, কিন্তু নামে মাত্র। চারিদিকের গাছপালা ও ঘরবাড়ী প্রভৃতিকে দেখাচ্ছে কালো পটে আরো কালো কালি দিয়ে আঁকা ঝাপসা ছবির রেখার মত।

কনস্টেবল হনুমানপ্রসাদ পাঁড়ে রাস্তার ধারে একটি ভালো রোয়াক পেয়ে শুয়ে পড়ে মস্ত মস্ত মর্তমান কদলী কিংবা ছাতু নুন ও কাঁচালঙ্কার স্বপ্ন দেখছিল নির্বিঘ্নে।

হঠাৎ তার মুখের উপরে লাগল যেন একটা ঝড়ের ঝাপটা। স্বপ্ন হল অদৃশ্য, নাসাগর্জন হল বন্ধ এবং তার বদলে দেখা গেল অন্ধকারেরও চেয়ে অন্ধকার ও প্রকাণ্ড কি যেন একটা বিদঘুটে ব্যাপার। তারই মধ্যে জ্বলছে আবার দু-দুটো আগুনের গুলি।

এও স্বপ্ন নাকি? কিন্তু এ-রকম স্বপ্ন হনুমানপ্রসাদ পছন্দ করত না। সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে চোখ পাকিয়ে দেখলে, একটা রীতিমত সচল অন্ধকার তার সামনে দাঁড়িয়ে হেলছে এবং দুলছে। আর সে অন্ধকারটা যেন কেমন একরকম বোট্‌কা গন্ধের এসেন্স মেখে এসেছে।

ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছ কি? চতুর্দিক নিঃসাড় ও নিরাপদ দেখে আমাদের ভাল্লু বৃক্ষের আশ্রয় ছেড়ে মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং হনুমানের নাসিকার হুঙ্কার শুনে সাগ্রহে ঘ্রাণ নিয়ে জানতে এসেছে, এ আবার কোন্ দুষ্ট জানোয়ার তাকে দেখে কি টিটকারি দিচ্ছে!

ম্লান আলোয় হনুমান সঠিক রহস্য উপলব্ধি করতে পারলে না বটে, কিন্তু আন্দাজে এটুকু বেশ বুঝতে পারলে যে, তার সামনে যে আবির্ভূত হয়েছে সে একটা মূর্তিমান বিভীষিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হনুমান যখন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে আরম্ভ করলে তখন তাকে আশ্বাস দেবার জন্যে ভাল্লু একবার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল।

পর-মুহূর্তে হনুমান পাঁড়ে রোয়াকের উপর থেকে এমন এক সুদীর্ঘ লম্ফ ত্যাগ করলে যে আসল হনুমানরা পর্যন্ত তা দেখলে দস্তুরমত অবাক হয়ে যেত। তারপরই এক-মাইলব্যাপী বিকট চীৎকার—'বাপ্ রে বাপ্, জান্ গিয়া রে জান্ গিয়া!'

ভাল্লু মাথা খাটিয়ে বুঝলে, এই চীৎকারের ফল ভালো হবে না।

এখনি এ মুল্লুকের যত মানুষ ঘটনাস্থলে তদারক করতে আসবে এবং তারপর আবার গলায় পড়বে দড়ি। ভাল্লু তার চারখানা পা যতটা পারে তাড়াতাড়ি চালিয়ে একদিকে ছুটতে সুরু করলে।

দৌড়, দৌড়, দৌড়! উত্তরদিকে দৌড়তে দৌড়তে হনুমান পাঁড়ে বারংবার পিছনপানে তাকিয়ে দেখছে সেই অগ্নিচক্ষু অন্ধকারটা তাকে গ্রাস করবার জন্যে এখনো পিছনে পিছনে আসছে কি না এবং দক্ষিণ দিকে দৌড়তে দৌড়তে ভাল্লু বারংবার পিছনপানে তাকিয়ে দেখছে, তার হিমালয়ের স্বপ্নে বাদ সাধবার জন্যে মানুষেরা দড়ি নিয়ে বোঁ-বোঁ করে ছুটে আসছে কি না। তাদের দু-জনেরই দৌড় দেখে বোঝা শক্ত, কে বেশি ভয় পেয়েছে।

পাহারাওয়ালা কত দূরে গিয়ে দৌড় থামালে জানি না, কিন্তু ভাল্লু আধঘণ্টার পর একটি নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপ ছাড়তে লাগল।

তখন রাত এসেছে ফুরিয়ে। পূর্ব-আকাশে কে যেন কালোর সঙ্গে গুলে দিচ্ছে আলোর রং। ভোর হতে আর দেরি নেই দেখে ভাল্লু আবার একটা খুব উঁচু ও ঝাঁকড়া গাছ বেছে নিয়ে তড়্‌বড়্‌ করে তার উপরে উঠে ঘন পাতার আড়ালে মিলিয়ে গেল। একদল কাক আর শালিক পাখি তখন সবে জেগে উঠে প্রভাতী রাগিণী ভাঁজবার আয়োজন করছিল, আচমকা দুঃস্বপ্নের মতন তাদের মধ্যিখানে ভাল্লুর আবির্ভাব দেখেই তারা বেসুরো চীৎকার করে যে যেদিকে পারলে উড়ে পালাল।

ভাল্লু মনে মনে বললে, পাখিগুলো কেন যে আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ওরে কাক, ওরে শালিকের দল, তোরা আবার বাসায় ফিরে আয়। আমি যে পরম বৈষ্ণব, মাছ-মাংস স্পর্শ করি না। তার উপরে আমি দেখেছি হিমাচলের সুন্দর স্বপন—আমার মন ছুটছে এখন অনন্ত হিমারণ্যের শীতল স্তব্ধতার দিকে, সেই যেখানে ঝরে তুষারের ঝরনা, বুনো বাতাস আনে অজানা ফুলের গন্ধ, গাছে গাছে ফলে থাকে পাকা পাকা মিষ্টি ফল। আজ

আমি স্বাধীন, আজ আমি দেশে চলেছি, আজ কি আমি জীব-হিংসা করতে পারি?...ভাল্লু ঠিক এই কথাগুলোই ভাবছিল কিনা হলপ করে আমি বলতে পারি না, এসব আন্দাজ মাত্র। তবে সে কিছু-না-কিছু ভাবছিল নিশ্চয়ই, এবং চার পা দিয়ে গাছের একটা মোটা ডাল জড়িয়ে ভাবতে ভাবতে ভোরের ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল।...

বেশ খানিকক্ষণ পরে তার ঘুম গেল ভেঙে। পিট্‌পিট্‌ করে চোখ মেলে নীচের দিকে তাকিয়ে সে দেখলে একটা দৃশ্য।

একটি বাগান। ভাল্লুর গাছটা বাগানের পাঁচিলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তার আধাআধি ডালপালা শূন্যে বাগানের ভিতর-দিকেও ছড়িয়ে পড়েছে। ভাল্লু যে মোটা ডালটাকে অবলম্বন করেছে সেটা আবার বেঁকে নেমে গিয়েছে বাগানের জমির কাছাকাছি।

সেদিন রবিবার। কলকাতার কোন মেয়ে-ইস্কুলের একদল ছাত্রী সেই বাগানে এসেছে বনভোজনে।

দশটি মেয়ে—বয়স তাদের বারো-তেরো থেকে পনেরো-ষোলোর মধ্যে। সঙ্গে চারজন শিক্ষয়িত্রীও আছেন।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হচ্ছেন মিসেস্ দস্তিদার। শুকনো ও লিক্‌লিকে সরল কাঠের মতন তাঁর দেহ—মাথায় উঁচু সাড়ে-পাঁচ ফুটেরও বেশী। পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক, এ-রকম রোগা চেহারায় যা সুলভ নয়, মিসেস্ দস্তিদার ছিলেন সেই বেজায় ভারিক্কে ভাবের অধিকারিণী। চশমা-পরা চোখে কড়া চাহনি, এবং একজোড়া পুরু ঠোঁটের উপরে উল্লেখযোগ্য একটি গোঁফের রেখা। মেয়েদের ভিতরে একবার প্রশ্ন উঠেছিল, জীবনে হাসেনি এমন কোন মানুষের অস্তিত্ব আছে কি না? উত্তরে একটি মেয়ে বলেছিল, 'আছে। তাঁর নাম মিসেস্ দস্তিদার।'

তা মিসেস্ দস্তিদারের মুখে হাসির অভাব হলেও বাক্যের অভাব হয়নি কোনদিন। তাঁর মুখে সর্ব্বদাই ফোটে কথার তুবড়ি এবং এ তুবড়ি মৌন হয় না এক মিনিটও। তাঁর বাক্যের স্রোত

বন্যার মত ভেঙে পড়ে শ্রোতাদের কর্ণকুহরকে অভিভূত করে দেয় এবং খানিকক্ষণ তাঁর কাছে থাকতে বাধ্য হলে প্রত্যেক শ্রোতাই মনে মনে বলতে থাকে—ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। মিসেস্ দস্তিদারও সঙ্গে থাকবেন শুনে ইস্কুলের অধিকাংশ মেয়েই চাঁদা দিয়েও আজ বনভোজনে আসতে রাজি হয়নি।

গলা দিয়ে ফাটা কাঁসির মতন আওয়াজ বার করে মিসেস্ দস্তিদার দস্তুরমতন ভারিক্কে-চালে বলেছিলেন, 'ইন্দু, অমন করে আলুর দমের আলু কাটে না।—কী বললে? তোমার মা ঐ-রকম করেই আলু কাটেন? তোমার মা তাহলে রান্না-বান্নার কিছুই বোঝেন না।...শীলা; তুমি হার্মোনিয়াম নিয়ে টানাটানি করছ কেন? গান গাইবে? কী গান? মনে রেখ, আমার সামনে তোমাদের একেলে ন্যাকা-ন্যাকা গজল কি ঠুংরি গাওয়া চলবে না। গান বলতে আমি কেবল বুঝি ব্রহ্মসঙ্গীত।...(গলা চড়িয়ে) নমিতা, ঢালু পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়ে তোমার ও কী হচ্ছে শুনি? যদি গড়িয়ে জলে পড়ে যাও? কী বললে? তুমি সাঁতার জানো? ওঃ সাঁতার জানলে মানুষ বুঝি জলে ডোবে না? অত আর সাহস দেখিয়ে কাজ নেই, শীগ্‌গির এখানে চলে এস! দুঃসাহস আর সাহস এক কথা নয়। সাহস কাকে বলে আমার কাছ থেকে শুনে যাও। মিঃ দস্তিদার—অর্থাৎ আমার স্বামী ফরেস্ট অফিসারের পদ পেয়ে প্রথম-প্রথম বড় ভয় পেতেন। তাঁকে সাহস দেবার জন্যে শেষটা আমাকেও বনে গিয়ে কিছুকাল বাস করতে হয়েছিল। যে-সে বন নয়—যাকে বলে একেবারে গহন অরণ্য, দিনে-দুপুরে সেখানে বেড়িয়ে বেড়ায় গণ্ডার, বরাহ, বাঘ, ভাল্লুক। কিন্তু আমার কিছুতেই ভয় হত না, বাঘ-ভাল্লুককে আমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতুম না! বাঘ-ভাল্লুক—' বলতে বলতে হঠাৎ চম্‌কে থেমে গিয়ে তিনি মাথার উপরকার গাছের দিকে বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইলেন।

ভাল্লু তখন পাতার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অত্যন্ত লুব্ধ চোখে আহারের সরঞ্জামগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল।

তিন ॥ ভাল্লু ও মিসেস্ দস্তিদার

ফরেস্ট অফিসারের সাহসিনী গৃহিণী মিসেস্ দস্তিদার স্বামীর মনে সাহস সঞ্চার করবার জন্যে গভীর অরণ্যে গিয়ে বাস করেছিলেন এবং গণ্ডার, বরাহ, বাঘ ও ভাল্লুককে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনতেন না, এ তথ্য তাঁর নিজের মুখেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর মাথার উপরকার গাছের দিকে তাকিয়ে আমাদের ভাল্লুর দাঁত-বার-করা মুখখানা দেখেই তিনি যে-ব্যবহারটা করলেন তা অত্যন্ত অদ্ভুত ও কল্পনাতীত।

মিসেস্ দস্তিদার প্রথমটা ভাবলেন, তিনি একটা অত্যন্ত অসম্ভব দুঃস্বপ্ন দর্শন করছেন। এটা সুন্দরবন বা হিমালয় বা সাঁওতাল পরগনার দুর্গম জঙ্গল নয়, এ হচ্ছে খাস কলকাতার কাছাকাছি সাজানো বাগান, এখানে স্বাধীন বাঘ-ভাল্লুকের আবির্ভাব হতে পারে না—কখনোই হতে পারে না!

এই বলে মিসেস্ দস্তিদার নিজের মনকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হল না। কারণ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঐ যে ভয়ঙ্কর মুখখানা বেরিয়ে আছে, ওটা একটা রীতিমত জ্যান্ত ভাল্লুকের মুখ ছাড়া আর কী বস্তু হতে পারে? মিসেস্ দস্তিদারের লেকচার বন্ধ হয়ে গেল, সাতিশয় হতভম্ব হয়ে তিনি পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগলেন।

ভাল্লু কিন্তু তখন পর্যন্ত মিসেস্ দস্তিদারকে নিয়ে একটুও মাথা ঘামায়নি। কাল থেকে তার পেটে এক টুকরো খাবার বা একফোঁটা জল পর্যন্ত পড়েনি, কাজেই নিষ্পলক চোখে সে কেবল চড়ি-ভাতির খাবারগুলোর দিকেই তাকিয়ে ছিল।

একটু পরেই ভাল্লু আর লোভ সামলাতে পারলে না, হঠাৎ তড়বড় করে গাছের উপর থেকে নেমে এল।

গাছের উপর থেকে যে একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক নেমে এল, এ-সম্বন্ধে মিসেস্ দস্তিদারের আর কোন সন্দেহ রইল না।

মিসেস্ দস্তিদারের মুখের পানে তাকিয়ে ভাল্লু বললে, 'ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ!'—অর্থাৎ 'কিছু খাবার দেবে গা?'

কিন্তু মিসেস্ দস্তিদার ভাল্লুকের ভাষা শেখেননি, কাজেই কিছু বুঝতেও পারলেন না। তবে ভাল্লুর 'ঘোঁৎ' শুনে সাধারণ ভীরু নারীর মতন তিনি যে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন না, এইটুকুই তাঁর পক্ষে বিশেষ বাহাদুরির কথা। এমন কি তিনি উপস্থিত-বুদ্ধিও হারিয়ে ফেললেন না। ভাল্লুর প্রথম 'ঘোঁৎ' শুনেই তিনি চমকে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন। বাগানের বাংলো অনেক দূরে এবং কাছাকাছি একটা গাছ ছাড়া অন্য কোন আশ্রয়ও নেই। অতএব মিসেস্ দস্তিদার কালবিলম্ব না করে গাছের উপরেই চড়তে আরম্ভ করলেন।

নমিতা ছিল পুকুর-পাড়ে, সে ঝাঁপ খেয়ে ঝপাং করে জলে গিয়ে পড়ল।

শীলা দেখালে আশ্চর্য তৎপরতা। কাছেই ছিল মালীর কুঁড়েঘর। সে যে কেমন করে বেড়া বেয়ে মালীর ঘরের চালের উপরে গিয়ে উঠল, কেউ এটা দেখবার সময় পেলে না।

আর আর মেয়েরাও 'ওগো-মাগো' বলে চেঁচিয়ে যে যেদিকে পারলে সরে পড়ল। কেবল ইন্দু আর নিভা পালাতে পারলে না, সেইখানেই ভয়ে কাবু হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

ভাল্লু মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে প্রথমটা ভাবলে, আচ্ছা, এদের কাছে খাবার চাইলে পাওয়া যাবে কি? তারপরেই তার মনে পড়ল, সে যখন পথে পথে নাচ দেখিয়ে বেড়াত, দর্শকেরা তখন খুসি হয়ে তাকে ফলমূল বখশিস দিত। হয়ত তার নাচের কায়দা দেখে এরাও তাকে কিছু খাবার উপহার দিতে পারে। এই ভেবে ভাল্লু তখনি পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং ধেই-ধেই করে ঘুরে-ফিরে নাচতে আরম্ভ করলে।

তার নৃত্য দেখেই ইন্দু আর নিভার স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গেল—তারাও প্রাণপণে দৌড় মারলে।

ওদিকে মেয়েদের চীৎকার শুনে কয়েকজন উড়ে মালী ছুটে এসে দেখে, চড়ি-ভাতির খাবারগুলো নিয়ে একটা মস্তবড় ভাল্লুক যার-পর-নাই ব্যস্ত হয়ে আছে। তারাও অদৃশ্য হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

ভাল্লু তখন মনে মনে ভাবছে, তার নাচে মোহিত হয়েই মেয়েরা এত ভালো ভালো খাবার ছেড়ে দিয়ে গেল।

মিনিট-চারেকের মধ্যেই পায়েস, সন্দেশ ও রসগোল্লার হাঁড়ি খালি করে ভাল্লু আস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। থাবা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে একবার উপরপানে তাকিয়ে দেখলে।

মালীর ঘরের চালের উপরে বসে শীলা চেঁচিয়ে মিসেস্ দস্তিদারকে ডেকে বললে, 'দেখুন দিদিমণি, ভাল্লুকটা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে।'

মিসেস্ দস্তিদার আরো বেশী উঁচু একটা ডালে গিয়ে উঠে বসে ভারিক্কে চালে বললেন, 'তাকিয়ে থাকুক-গে! আমি ওকে ভয় করি না।'

শীলা বলে, 'দিদিমণি, ভাল্লুকটা বোধহয় আপনার সঙ্গে ভাব করতে চায়!'

মিসেস্ দস্তিদার আরো বেশী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'শীলা, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ?'

শীলা সকৌতুকে বললে, 'না দিদিমণি, বলেন কী! আপনি যখন বনের গণ্ডার-বাঘ চরিয়ে এসেছেন, তখন এই সামান্য পোষা ভাল্লুকটা দেখে আপনি কি ভয় পেতে পারেন? কার সাধ্য এ কথা বলে!'

মিসেস্ দস্তিদার বললেন, 'শীলা, আমি তোমার ঠাট্টার পাত্রী নই। কে তোমাকে বললে এ ভাল্লুকটা পোষা? ওর বড় বড় দাঁত আর নখ দেখেছ? ওর শয়তানি-মাখা চোখ দুটোও দেখ! এ হচ্ছে দস্তুরমত বন্য ভাল্লুক, পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছে।'

শীলা বললে, 'ভাল্লুকটা শহুরেই হোক আর বন্যই হোক ওকে দেখে আমার একটুও ভয় হচ্ছে না।'

চশমার ভিতর থেকে মিসেস্ দস্তিদারের গোল গোল চোখ আরো ড্যাব্‌ডেবে হয়ে উঠল। বিস্মিত স্বরে তিনি বললেন, 'ভয় হচ্ছে না মানে?'

শীলা বললে, 'ভাল্লুকটার ভাব দেখে মনে হচ্ছে না যে ও এই খোলার চালটার উপরে উঠতে চাইবে। ওরা গাছে চড়তেই ভালোবাসে।'

মিসেস্ দস্তিদার বললেন, 'শীলা, তোমার চেয়ে দুষ্টু মেয়ে আমি দেখিনি। তুমি আবার আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ।'

শীলা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে বললে, 'ঐ দেখুন দিদিমণি, ভাল্লুকটা আবার গাছের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।'

সত্যই তাই। একপেট খাবার খেয়ে ভাল্লুর মনে খুব ফুর্তির উদয় হল। তার সাধ হল মিসেস্ দস্তিদারের সঙ্গে একটু খেলাধুলো করবে। সে আবার গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে উপরপানে উঠতে আরম্ভ করলে।

ঘোড়ার উপরে লোকে যেমন করে বসে, মিসেস্ দস্তিদার সেই-ভাবে একটা ডালের উপরে বসে ধীরে ধীরে ডগার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে ভাল্লুর ভারি আমোদ হল। সে মিসেস্ দস্তিদারের ডালের কাছে গিয়ে বললে, 'ঘোঁৎ!'

সড়াৎ করে মিসেস্ দস্তিদার আরো এক হাত সরে গিয়ে একেবারে প্রান্তে গিয়ে হাজির হলেন।

ভাল্লুও জিভ দিয়ে নিজের নাক চাটতে চাটতে সেই ডাল ধরে এগুতে লাগল। আর কোন উপায় না দেখে মিসেস্ দস্তিদার ডাল ধরে ঝুলে পড়লেন। তিনি স্থির করলেন, যা থাকে কপালে—এইবারে তিনি মাটির দিকে লাফ মারবেন। ভাল্লুকের ফলার হওয়ার চেয়ে হাত-পা ভাঙা ভালো।

ঠিক সেই সময়ে ভাল্লু দেখতে পেলে, দূর থেকে একদল লোক লাঠি-সোঁটা নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে ছুটে আসছে। সে বুঝলে, গতিক বড় ভালো নয়।

ভাল্লু তাড়াতাড়ি গাছের অন্যদিকে গিয়ে বাগানের পাঁচিলের উপরে লাফিয়ে পড়ল। তারপর সেখান থেকে একেবারে রাস্তার উপরে।

চার ।। নতুন-রকম লাঠি

ভাল্লু যে বিদায় নিয়েছে, মিসেস্ দস্তিদার তা দেখতে পেলেন না, কারণ পাছে তার কিম্ভূতকিমাকার হেঁড়ে মুখখানা আবার নজরে পড়ে যায়, সেই ভয়ে তিনি প্রাণপণে দুই চোখ মুদে ফেলে গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে দুই পা ছুঁড়ছিলেন ক্রমাগত।

কিন্তু ভাল্লুর পলায়ন আর কারুর নজর এড়ালো না। নমিতা সাঁতার কাটা বন্ধ করে ঘাটে এসে উঠল। শীলা মালীর ঘরের চাল থেকে চট্ করে নেমে পড়ল। নিভা, ইন্দু প্রভৃতি অন্যান্য মেয়েরাও কেউ গাছের গুঁড়ির আড়াল আর কেউ-বা ঝোপঝাপ থেকে বেরিয়ে এল। সবাই ডালে দোদুল্যমান মিসেস্ দস্তিদারের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল।

শীলা বললে, 'আর দোল খাবেন না দিদিমণি! চোখ খুলে দেখুন, সেই পথভোলা ভাল্লুকটা আর এখানে নেই।'

মিসেস্ দস্তিদার তখনো চোখ খুললেন না। তাঁর সন্দেহ হল, দুষ্টু শীলা এখনো তাঁকে ভয় দেখাবার চেষ্টায় আছে।

ইতিমধ্যে লাঠি-সোঁটা নিয়ে পনেরো-ষোলো জন লোক ঘটনা-স্থলে এসে হাজির হল। তারাও যখন অভয় দিলে, মিসেস্ দস্তিদার তখন অতি সন্তর্পণে চোখ খুলে সেই অবস্থায় যতটা সম্ভব মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক দেখে নিলেন।

শীলা বললে, 'দিদিমণি, আপনি যে গভীর জঙ্গলে গিয়ে এমন চমৎকার গাছে চড়তে আর এমন মজার দোলা খেতে শিখেছেন, আমরা কেউ তা জানতুম না। কী বলিস, না রে নমিতা?'

কিন্তু নমিতা হচ্ছে মুখচোরা মেয়ে, মনে মনে হেসেও মুখে কিছু বলতে সাহস করলে না।

মিসেস্ দস্তিদার বেশ বুঝতে পারলেন, আজ যে অভাবনীয় কাণ্ডটা হয়ে গেল, এর পরে আর প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবু অনেক কষ্টে নিজের কঠিন গাম্ভীর্য কতকটা বজায় রাখার চেষ্টা করে তিনি বললেন, 'আমার হাত ছুটো ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর আমি ঝুলতে পারছি না। শীগ্‌গির আমাকে নামিয়ে নাও, নইলে আমি ধপাস করে পড়ে যাব।'

সকলে মহা সমস্যায় পড়ে গেল, কেমন করে মিসেস্ দস্তিদারকে গাছ থেকে আবার মাটির উপরে ফিরিয়ে আনা যায়? খানিকক্ষণ পরামর্শের পর ছুজন লোক লম্বা দড়ি নিয়ে গাছের উপরে গিয়ে উঠল। আরো খানিকক্ষণ চেষ্টার পর তারা মিসেস্ দস্তিদারকে ছুই বাহুমূলে দড়ির বাঁধন লাগিয়ে তাঁকে আবার পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে পাঠিয়ে দিলে।

আমরা খবর পেয়েছি, সেইদিনই বাগান থেকে ফিরে এসে মিসেস্ দস্তিদার তিনমাসের ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন। অন্ততঃ কিছুকালের জন্যে তিনি আর কারুর কাছে মুখ দেখাতে রাজি নন।

যারা লাঠি-সোঁটা নিয়ে এসেছিল ভাল্লুব খোঁজে, তারা বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে ভাল্লু-বেচারি একটু বিপদে পড়েছে। সে মনসা গাছ চিনত না। পাঁচিলের উপর থেকে সে যেখানে লাফিয়ে পড়েছিল সেখানে ছিল মস্ত-বড় একটা মনসার ঝোপ। সুতরাং তার অবস্থা বুঝতেই পারছ! যদিও বড় বড় ঘন লোম থাকার দরুন তার দেহের অনেক জায়গাই মনসা-কাঁটার খোঁচা থেকে বেঁচে গেল, তবু তার নাকের ডগায় এবং চার পায়ের তলায় বিঁধে গেল অনেকগুলো মনসা-কাঁটা।

ভাল্লু রক্তাক্ত নাকের ডগায় থাবা ঘষছে, জিভ দিয়ে পায়ের তলা চাটছে আর মনে মনে বলছে, 'এ কি রকম গাছ রে বাবা! একসঙ্গে এতগুলো কামড় মারে! হুঁ, এ গাছটাকে ভালো করে চিনে রাখা দরকার— ভবিষ্যতে যেখানে এমন সর্বনেশে গাছ থাকবে সেদিকে আর মাড়াব না!'

হঠাৎ গোলমাল শুনে ভাল্লু চমকে মুখ তুলে দেখে, বাগানের লাঠিধারী লোকগুলো আবার তার দিকে ছুটে আসছে।

ভাল্লু তখন মরছে কাঁটার জ্বালায়, তার উপরে আবার এই নূতন বিপদ দেখে তার মেজাজ গেল চটে। সে বুঝলে এরা তাকে ধরতে পারলেই ফের সেই চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেবে—হিমালয়ে যাবার পথ যেখানে লোহার দরজা দিয়ে বন্ধ। সে তখনি পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং শূন্যে সামনের দুই থাবা নেড়ে নিজের ভাষায় আস্ফালন করে বললে, 'আয় না মানুষের বাচ্চারা,— বুকের পাটা থাকে তো এগিয়ে আয়!'

কিন্তু তার চমকপ্রদ হুঙ্কার শুনে এবং রোমাঞ্চকর মুখভঙ্গি দেখে বুদ্ধিমান মানুষের বাচ্চারা আর অগ্রসর হল না। কয়েকজন থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং কয়েকজন দৌড় মেরে আবার বাগানের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

ভাল্লু বুঝলে এই কাপুরুষদের দেখে তার কোনরকম ভয় পাবার দরকার নেই। সে তখন আবার বসে পড়ে আড় চোখে তাদের দিকে দৃষ্টি রেখেই নিজের আহত থাবাগুলো চাটতে লাগল। তার দুটো পায়ের ভিতরে দুটো মনসা-কাঁটা ঢুকে বসে গিয়েছিল।

এমন সময়ে অন্য কোন্ বাগান থেকে খবর পেয়ে একজন বন্দুক-ধারী লোক সেখানে ছুটে এল। কিন্তু তাকে দেখেও ভাল্লুর ভাবান্তর হল না, তার কারণ সে এখনো বন্দুককে চেনবার সুযোগ পায়নি। সে ভাবলে, ও-লোকটার হাতে যা রয়েছে তা একটা নতুন-রকম লাঠি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু সেই নতুন-রকম লাঠিটা যখন দপ্ করে জ্বলে উঠে বেয়াড়া

এক গর্জন করলে ভাল্লুকে তখনি চার পা তুলে তড়াক্ করে লাফ মেরে রীতিমত আর্তনাদ করতে হল।

ভাগ্যে বন্দুকটা ছিল পাখিমারা, তার ভিতরে বুলেটের বদলে ছিল ছর্‌রার কার্তুজ। কতকগুলো ছর্‌রা মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে ধুলো ওড়ালে, কতকগুলো তার লোমের আবরণ ভেদ করতে পারলে না এবং একটা তার বাঁ-কানকে ফুটো করে দিল।

ভাল্লুর পক্ষে তাই যথেষ্ট হল। বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে সে বেগে পলায়ন করলে। পিছন থেকে আবার সেই নতুন-রকম লাঠির গর্জন শোনা গেল, তার কানের কাছ দিয়ে কতকগুলো কি সোঁ-সোঁ করে চলে গেল এবং সেও নিজের গতি আরো বাড়িয়ে দিলে।

ছুটতে ছুটতে সে ভাবতে লাগল, 'বাপ্ রে বাপ্, এ কোন্ আজব দেশে এসে পড়লুম? মানুষের মেয়ে এখানে গাছে উঠে ডাল ধরে দোল খায়, গাছ এখানে কামড় মারে, লাঠি এখানে বিদ্যুৎ জ্বেলে ধমকে ওঠে, আর কী যে ছুঁড়ে কান ফুটো করে দেয়, কিছুই বোঝা যায় না! হিমালয়ের পথে যে এত বাধা, সেটা তো জানা ছিল না, এখন মানে মানে দেশে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই যে বাঁচি!'

ভাল্লু দৌড়চ্ছে আর দৌড়চ্ছেই—বিশেষ করে নতুন-রকম লাঠি দেখে তার পেটের পিলে চমকে গেছে দস্তুরমত। অনেক পথ, অনেক গ্রাম পার হয়ে গেল, তবুও সে থামতে রাজি নয়। যেখান দিয়ে সে যাচ্ছে সেখানেই উঠছে হৈ-হৈ রব। একজন সাইকেলের আরোহী বেশী ব্যস্ত হয়ে পালাতে গিয়ে মাটির উপরে মুখ থুবড়ে খেলে প্রচণ্ড আছাড়, একখানা গরুর গাড়ীর গরু দুটো মহা ভয়ে দৌড়তে লাগল রেসের ঘোড়ার মত, ছেলেরা কেঁদে ককিয়ে ওঠে, মেয়েরা আঁৎকে মূর্ছা যায়, অথর্ব বৃদ্ধরাও দৌড়-বাজিতে হারিয়ে দেয় জোয়ান যুবকদের। এমন কি একটা এক-ঠেঙো খোঁড়াও অদ্ভুত তৎপরতা দেখিয়ে একটা খুব উঁচু বটগাছের মগ-ডালে না ওঠা পর্যন্ত থামল না।

ছুটতে ছুটতে ভাল্লুর দম বেরিয়ে যাবার মত হল। হঠাৎ সামনে

একখানা বাড়ী দেখে সে স্থির করলে, তার ভিতরই আশ্রয় নেবে।

বাড়ীর ভিতরে ঢুকেই উঠোন। উঠোনের এক কোণের এক ঘরে বসে একটা উড়িয়া বামুন উনুনে কি তরকারি রাঁধছিল। আচমকা স্তম্ভিত চক্ষে সে দেখলে, ঘরের দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিপুলদেহ এক ভাল্লুক। পরমুহূর্তেই সে 'হা জগড়্নাথ্অ' বলে দাঁতকপাটি লেগে চিৎপাত হয়ে একেবারে অজ্ঞান!

খাবার দেখেই ভাল্লুর পেটে ক্ষিধে আবার চোঁ-চোঁ করে উঠল। সে গুটি-গুটি এগিয়ে একখানা থালা থেকে কি-একটা তরকারি একগ্রাস তুলে নিলে।—ওরে বাবা রে, কী ভয়ঙ্কর ঝাল রে! মনসার কাঁটা এবং বন্দুকের ছর্‌রাও যা পারেনি, তরকারির লঙ্কা করলে তার সেই দুর্দশা! সে ঘরের মেঝেয় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে ও গড়াগড়ি দিতে লাগল।

হঠাৎ দুম্ করে একখানা প্রকাণ্ড থান-ইঁট এসে পড়ল তার পিঠের উপরে। 'ঘোঁৎ-ঘুঁৎ' (অর্থাৎ 'কে রে') বলে চেঁচিয়ে ভাল্লু একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল, কিন্তু কেউ কোথাও নেই, মেঝের উপরে কেবল উড়িয়া বামুনটার অচেতন দেহ ছাড়া।

আসল কথা হচ্ছে, বাড়ীরই একজন লোক জানলা দিয়ে ইঁটখানা ছুঁড়েই লম্বা দিয়েছে।

কিন্তু ভাল্লু ভাবলে, এও একটা আজগুবি কাণ্ড। কেউ কোথাও নেই—ইঁট ছোড়ে ঘর। কে কবে এমন কথা শুনেছে? আরে ছোঃ, এমন জায়গায় কোন ভদ্র ভাল্লুকের থাকা উচিত নয়!

ভারি বিরক্ত হয়ে ভাল্লু আবার পথে বেরিয়ে পড়ল।

পাঁচ ।। ভোট-বিভ্রাট

কলকাতা থেকে কিছু দূরে ছিল একটি শহর, তার নাম আমি বলব না।

সেইখানে আজ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার না চেয়ারম্যান কিংবা জেলাবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বা অন্য কিছু নির্বাচনের জন্যে মহা ধূমধাম পড়ে গিয়েছে। ধূমধামের কারণটা বলি।

শহরে বাস করতেন মুকুন্দপুরের জমিদারদের দুই তরফ—বড় এবং ছোট। বড় তরফের নাম আনন্দ চৌধুরী। জ্ঞানে, চরিত্রে ও সহৃদয়তায় তাঁর মতন লোক ও-তল্লাটে আর কেউ ছিল না। লোকের উপকার করবার সুযোগ পেলে আনন্দবাবু নিজেকে ধন্য বলে মনে করতেন। আর লোকের উপকার করবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এই নির্বাচন ব্যাপারে।

ছোট তরফের সাধুচরণ চৌধুরী ছিলেন ঠিক উল্টো রকম মানুষ। 'সাধু' নামের এমন অপব্যবহার আর কখনো হয়নি। সাধু তামাক খেতে শিখেছিলেন গোঁফ গজাবার অনেক আগেই—অর্থাৎ এগারো উৎরে বারোতে পা দিয়েই। জীবনে তিনি কখনো একটিমাত্র আধলাও দান করেননি—অথচ নানানরকম বদ-খেয়ালিতে উড়িয়ে দিয়েছেন কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা। শোনা যায় একবার এক বিড়ালের বিয়েতে তিনি নাকি পনেরো হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। নিষ্ঠুরতায়ও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর মা ছেলের অসৎ ব্যবহারের প্রতিবাদ করতেন বলে নিজের মাকেও তিনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাড়ী থেকে। তাঁর লেখাপড়ার কথা না বলাই ভালো—কোনরকমে তিনি নিজের নামটি সই করতে পারতেন মাত্র।

আনন্দ ছিলেন সাধুর খুড়তুতো ভাই। আনন্দকে সবাই শ্রদ্ধা করত বলে সাধুর মন জ্বলত দারুণ হিংসার আগুনে। আনন্দকে জব্দ ও লোকের চোখে খাটো করবার জন্যে সর্বদাই তিনি হরেক-রকম ফন্দি আঁটতেন। সেইজন্যেই নির্বাচন ব্যাপারে তিনি হয়েছেন আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী।

যেমন বিদ্যা-বুদ্ধি, সাধুর চেহারাও তেমনি। তাঁর ঘাড়ে-গর্দানে, বিশাল-ভুঁড়িওয়ালা বেঁটে-সেটে কালো-কুচকুচ মূর্তিখানি দেখলেই চোখ বুজে ফেলবার ইচ্ছা হয়। তাঁর কেশহীন মাথাটি কুমড়োর

মতন তেলা, ঠোঁট দুখানা কাফ্রির মতন পুরু, নাক এত বেশী চ্যাপ্টা যে দেখলে মনে পড়ে ওরাং-ওটাংকে, এবং গর্তে-বসা চোখ দুটো হচ্ছে রীতিমত কুৎকুতে।

তা বলে তোমরা কেউ যেন সাধুকে বোকা ঠাউরে বোসো না। তাঁর ঘটে এটুকু বুদ্ধি ছিল যাতে করে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর পক্ষে বৈধ সৎ-উপায়ে আনন্দের বিরুদ্ধে ভোট সংগ্রহ করা অসম্ভব। লোকে আনন্দকে ভালোবাসে এবং তাঁকে ঘৃণা করে।

দেশের একদল ওঁচা লোক করত সাধুর মোসাহেবি। ভোটারদের কাছে গিয়ে তারা রটিয়ে বেড়াতে লাগল, যারা সাধুর পক্ষে ভোট দেবে তারা প্রত্যেকেই ভোটের এক হপ্তা আগে থেকে রোজ এক টাকার মণ্ডা-মিঠাই-রসগোল্লা উপহার পাবে এবং ভোটের দিন সকালে সাধুর বাড়ীতে তাদের জন্যে হবে যে বিরাট ভোজের আয়োজন, তার মধ্যে থাকবে পুরো একশো রকম চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়।

আনন্দের কানেও এ-খবর উঠতে দেরি লাগল না। তিনি আরো শুনলেন, অধিকাংশ ভোটারই সাধুর পাঠানো দৈনিক মণ্ডা-মিঠাই-রসগোল্লার সদ্ব্যবহার করছে এবং অনেকে আবার খাবারের বদলে নিচ্ছে একটি করে নগদ টাকা।

আনন্দ মনে মনে দুঃখিত হলেন মানুষের অকৃতজ্ঞতা দেখে। দেশের ভালোর জন্যে কতকাল ধরে তিনি কত কাজ করেছেন, আজ সামান্য জলখাবারের লোভেই লোকে তা ভুলে গেল! বুঝলেন, এ-যাত্রায় তাঁর পরাজয় অনিবার্য।

ভোটের দিন দুপুরবেলায় সাধুর বাড়ীতে পড়ল শত শত পাত। একশো রকম খাবারকে হস্তগত করার জন্যে প্রত্যেক লোককে আসন থেকে হাত বাড়িয়ে রীতিমত হামাগুড়ি দিতে হল। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রত্যেক ভোটারের ভুঁড়ি এত ভারি আর ডাগর হয়ে উঠল যে, সাধুর প্রশস্ত বৈঠকখানার ঢালা-বিছানার উপরে ঘণ্টা-দুই চিৎপাত হয়ে বিশ্রাম না করে কেউ আর খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারলে না।

ওদিকে আনন্দের বাড়ী দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন নীরবে কাঁদছে। সেখানে না আছে ভিড়, না আছে গোলমাল।

ভোটের পরিণাম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে সাধু খুব জমকালো গরদের জামা-কাপড়-চাদর পরে মোসাহেবদের সঙ্গে পান চিবোতে চিবোতে মোটরে গিয়ে উঠলেন। মোটরখানা লতা-পাতা-ফুল দিয়ে সাজানো, তাঁর হাতেও জড়ানো বেলের গোড়ে এবং তিনি কপালে পরেছিলেন মা-কালীকে পুজো দিয়ে মস্ত একটি সিঁদুরের ফোঁটা।

যেখানে ভোট নেওয়া হচ্ছিল মোটর সেই মণ্ডপের দিকে চলল। সাধুর দলের কর্মীরা তাঁকে দেখে জয়নাদ করে উঠল।

ঠিক সেই সময় দেখা গেল মোটরে চড়ে আনন্দবাবুও ঘটনা-ক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেছেন। তিনি একলা। তাঁকে দেখে কেউ জয়ধ্বনিও করলে না।

একগাল হেসে নিজের মোটর থেকে সাধু চেঁচিয়ে বললেন, 'আনন্দদাদা, খামোকা মন খারাপ করবার জন্যে কেন তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছ বল দেখি? এবারে তোমার কোন আশাই নেই!'

আনন্দ বললেন, 'জানি ভাই, জানি। ধরে নাও আমি বেরিয়েছি তোমাকেই অভিনন্দন দেবার জন্যে।'

আনন্দের গাড়ী এগিয়ে গেল।

সাধুর এক মোসাহেব বললে, 'দেখছেন কর্তা। আনন্দবাবু ভাঙবেন তবু মচকাবেন না! আবার আপনাকে ঘুরিয়ে ঠাট্টা করে যাওয়া হল!'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সাধু বললেন, 'রোসো না, আগে ভোটাভুটির হাঙ্গামাটা চুকে যাক, তারপর—ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌! ও আবার কে রে?'

মোসাহেবদেরও চক্ষু ছানাবড়া!

ব্যাপারটা হচ্ছে এই। ভোটের মণ্ডপের খানিক আগেই পথের পাশে ছিল একটা ছোটখাটো জঙ্গল। হিমালয়ের যাত্রী শ্রীমান ভাল্লু এই পথ দিয়ে যেতে যেতে রাস্তায় হৈ-চৈ আর অসম্ভব লোকের ভিড় দেখে ঐ জঙ্গলের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু একে

বহুক্ষণ আহারাদির অভাবে তার পথশ্রান্ত দেহ এলিয়ে পড়েছে, তার উপরে তার সূক্ষ্ম ভল্লুকনাসা তাকে খবর দিলে যে, খুব কাছেই কোথায় হরেক-রকম খাবার-দাবার অপেক্ষা করছে ক্ষুধার্ত উদরের জন্যে ;—কাজেই ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে জঙ্গল ছেড়ে তাকে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হয়েছে।

পর-মুহূর্তে সাধুর মোটরখানা বোঁ-বোঁ করে একেবারে তার উপরে এসে পড়ল—তাকে চাপা দেয় আর কি!

কিন্তু হিমাচলের ভাল্লুক এত সহজে মোটর চাপা পড়বার জন্যে জন্মায়নি। এক লাফ মেরে সে মোটরের সামনের দিকে উঠে পড়ল —কিন্তু ইস্! এখানটা যে আগুনের মতন গরম! তড়াক করে আর এক লাফ—ভাল্লু হাজির হল মোটরের ছাদে। গাড়ীর ছাদে একটা স্বাধীন ও বন্য ভাল্লুক নিয়ে কোন অতি-সাহসী লোকও মোটর চালাতে পারে না। কাজেই ড্রাইভার মোটর থামিয়ে, দিলে চোঁ-চাঁ চম্পট! সাধুর তিন মোসাহেবও বিনা বাক্যব্যয়ে মোটরের দরজা খুলে হুড়মুড় করে রাস্তার উপরে ঝাঁপ খেলে এবং দেখতে দেখতে তারাও অদৃশ্য। সাধুর আর্তনাদ তারা আমলেও আনলে না।

সাধুও এই বিপদজনক গাড়ীখানা ত্যাগ করবার জন্যে চটপট গাত্রোত্থান করেই সভয়ে চোখ পাকিয়ে দেখলেন, ছাদের উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে ভাল্লু তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। অমনি তিনি ধপাস করে আবার বসে পড়ে কেঁদে উঠলেন, 'ওগো, মাগো!'

তারপরেই হল একটা আরো ভয়ানক কাণ্ড। ভাল্লুর বিপুল ভার সইতে না পেরে সাধুর মাথার উপরে ছাদ ভেঙে পড়ল।

ভাল্লুও ভয়ে আঁৎকে উঠে দুই হাত—অর্থাৎ সামনের দুই পা বাড়িয়ে একটা কিছু ধরতে গিয়ে জড়িয়ে ধরলে সাধুচরণকেই এবং তারপর সেই অবস্থাতেই টলে গাড়ীর বাইরে গিয়ে পড়ল।

পায়ের তলায় শক্ত মাটি পেয়ে ভাল্লু নিজের আলিঙ্গন থেকে সাধুকে মুক্তি দিলে সাধু ভয়ে আর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠবার সময় পেলেন না, নিজের গোলগাল বপুখানি নিয়ে পথের ধুলোর



ড্রাইভার মোটর থামিয়ে, দিলে চোঁ-চাঁ চম্পট

উপর দিয়ে ক্রমাগত গড়াতে আর গড়াতে সুরু করলেন, তারপর অদৃশ্য হলেন পথের পাশে পচা জলের খানায়।

ভাল্লু চমকে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার একটুও লাগেনি। তার নাসিকা তখন খাবারের সুগন্ধ পেয়ে আবার উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

ভোটমণ্ডপের একপ্রান্তে সাধুচরণ নিজের পক্ষের ভোটারদের লোভ দেখাবার জন্যে বৈকালী জলযোগের যে বিপুল আয়োজন করেছিলেন, সুগন্ধ আসছিল এইখান থেকেই। ভাল্লুর সুচতুর নাসিকা পথনির্দেশ করলে, সে অগ্রসর হল দ্রুতপদে। ভোটমণ্ডপ দৃষ্টিগোচর হবামাত্র সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকের ভিড় দেখে। কিন্তু তীক্ষ্ণ নেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেও সে যখন কারুর হাতে সেই নতুন-রকম লাঠি দেখতে পেলে না, তখন আশ্বস্ত হয়ে এগিয়ে চলল দ্বিগুণ বেগে।

ওদিকে একটা বিরাট ভাল্লুককে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসতে দেখেই দিকে দিকে রব উঠল—'মা রে, বাবা রে, পালা রে, খেলে রে!' এক মিনিটের মধ্যে ভোটমণ্ডপ জনশূন্য হয়ে গেল। তারপর সাধুর খাবারগুলো যে কার বিপুল উদর-গহ্বরে স্থানলাভ করলে, সেটা বোধহয় আর বলে দিতে হবে না।

সাধু ভাল্লুকের ভয়ে কিছুকাল আর বাড়ীর বাইরে পা বাড়াননি। ভোটের ফলাফল যখন বেরুল তখন তিনি জানলেন যে, ভোটাররা তাঁর খাবার খেয়ে পেট ভরিয়েছে বটে, কিন্তু ভোট দিয়েছে আনন্দ চৌধুরীকেই। সুতরাং এ-যাত্রা সাধুচরণের হল 'লাভে ব্যাং, অপচয়ে ঠ্যাং'।

ছয় ॥ অতি-বুদ্ধিমান সোনা-মোনা

দিনের বেলায় যেখান দিয়ে যায় সেইখানেই নতুন নতুন গোলযোগের সৃষ্টি হয় দেখে ভাল্লু স্থির করেছে, এবার থেকে রাত

না এলে সে আর পথের উপরে পদার্পণ করবে না।

অতএব যতক্ষণ দিনের আলো জ্বলত সে কোন ঝোপঝাপের ভিতরে গিয়ে আড্ডা গাড়ত। কখনো কুণ্ডলী পাকিয়ে পিছনের পা-দুটোর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখত, কখনো চুপচাপ শুয়ে শুয়ে ভাবত তার সাধের হিমালয়ের কথা।

রাতের অন্ধকারে আরম্ভ হত তার যাত্রা। ক্ষুধা পেলে ফলমূল সংগ্রহ করত, তেষ্টা পেলে পাওয়া যেত নদী বা পুকুরের জল। চিড়িয়াখানায় বন্দী অবস্থায় তার খাওয়া-দাওয়ার ভাবনা একটুও ছিল না বটে, কিন্তু কোন-কোনদিন পেট-ভরা খাবার না জুটলেও চিড়িয়াখানায় ফিরে যাবার কথা ভুলেও সে ভাবতে পারত না। স্বাধীনতা যে কত মিষ্টি, ভাল্লু তা ভালো করেই অনুভব করতে পেরেছে।

একরাতে ভাল্লু হেলে-দুলে মনের সুখে পথ চলছে, হঠাৎ এল ঝম্‌ঝম্‌ করে জল। সে তখন একটা নিঃসাড় গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। ভাল্লু অন্ধকারেও চোখ চালাতে পারত, চারিদিকে তাকিয়ে একটা মাথা গোঁজবার জায়গা খুঁজতে লাগল। তারপর একখানা বাড়ীর দেওয়ালের তলার দিকে একটা গর্ত দেখে সুড়্‌সুড়্‌ করে সে তার ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

ঢুকে দেখে, বাঃ, দিব্যি একটি শুকনো খটখটে ঘর। সে ভাবতে লাগল, 'মানুষেরা তাদের বাড়ীর চারিদিকের দেওয়ালেই বড় বড় গর্ত কাটে বটে, কিন্তু গর্তগুলো আবার লোহার ডাণ্ডা বসিয়ে এমন-ভাবে আগলে রাখে যে মাথা গলাবার ফাঁকটুকুও পাওয়া যায় না। খামোকা এ-রকম গর্ত কেটে বোকামি করবার কারণ কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু এ-গর্তটা তো সে-রকম নয়! এতে লোহার ডাণ্ডা বসানো নেই, এর ভিতর দিয়ে মুণ্ডুর সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসেই ধড়টাও গলিয়ে ফেলা গেল। নিশ্চয় এ হচ্ছে কোন বুদ্ধিমান মানুষের কীর্তি।'

ভাল্লুর আন্দাজ মিথ্যা নয়। এ গর্তটা কেটেছে দুজন অতি-

বুদ্ধিমান মানুষ, তাদের নাম সোনা ও মোনা। এ অঞ্চলের চোরেদের সর্দার হচ্ছে সোনা আর মোনা, দেওয়ালে সিঁধ কেটে তারা ঢুকেছে গৃহস্থের বাড়ীতে।

নিশুত রাত, তার উপরে বাদলার ঠাণ্ডা পেয়ে বাড়ীর লোকরা আরামে ঘুম দিচ্ছে, ঘরে ঘরে শোনা যাচ্ছে নাসা-যন্ত্রে নিদ্রাদেবীর পুজা-মন্ত্র। সোনা-মোনা নির্বিবাদে কাজ সারলে। সোনার হাতে টাকা ও গহনার বাক্স এবং মোনার হাতে একখানা কাপড়ে বাঁধা একক্াঁড়ি রূপোর গেলাস-বাটি-থালা।

তারা যে-ঘরে সিঁধ কেটেছিল সেই ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

মোনা চুপিচুপি বললে, 'দাদা, আজ মার্ দিয়া কেল্লা!'

সোনা বললে, 'চুপ্। আগে বাইরে যাই, তারপর কথা!'

পা টিপে টিপে তারা ঘরের ভিতরে ঢুকল।

অমনি ভাল্লু বললে, 'ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-ঘোঁৎ'—অর্থাৎ, 'তোমরা আবার কে বট হে?'

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার করে বলা দরকার। তোমরা বোধহয় ভাবছ, ভাল্লুর এক 'ঘোঁৎ-ঘোঁৎ' শব্দের রকম-রকম মানে হয় কেন? তার কারণ হচ্ছে, বাঘ ভাল্লুক শৃগাল কুকুর বিড়াল প্রভৃতির, এবং পক্ষীদেরও শব্দ-ভাণ্ডারে আমাদের মতন বেশী শব্দ নেই। অধিকাংশ সময়েই তারা একই রকম শব্দ করে বটে, কিন্তু উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে সেই একই রকম শব্দের অর্থ হয় ভিন্ন-ভিন্ন রকম। যেমন, কুকুর ডাকে ঘেউ-ঘেউ করে, কিন্তু শত্রুকে দেখলে সে ঘেউ-ঘেউ করে বলে—'ভাগো হিঁয়াসে, নইলে কামড়ে দেব!' আর মনিবকে দেখলেও ঐ এক ঘেউ-ঘেউ রবেই জানায়—'এস প্রভু, আমি তোমার পা চেটে দি!'

অন্ধকারে ভাল্লুর সম্ভাষণ শুনেই সোনা-মোনা ভয়ানক চমকে গেল।

মোনা 'টর্চ' জ্বেলেই 'ই-হি-হি-হি-হি' বলে চীৎকার করে চিৎ-পটাং! তারপর একেবারে অজ্ঞান। তার হাতের রূপোর বাসন-

গুলো মেঝের উপরে ছড়িয়ে পড়ে বেজে উঠল ঝন্-ঝনা-ঝন্।

সোনাও ভাল্লুর বিপুল মুখখানা দেখতে পেলে। সে অজ্ঞান হয়ে গেল না বটে, কিন্তু সেইখানেই দাঁড়িয়ে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

তোমরা ভাল্লুকের জ্বর দেখেছ? যখন-তখন ভাল্লুকদের দেহে একরকম কাঁপুনি আসে এবং খানিক পরেই আবার তা থেমে যায়;—একেই বলে ভাল্লুকের জ্বর। সে সময় তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, তারা ভারি কষ্ট পাচ্ছে।

সোনার কাঁপুনি দেখে ভাল্লুও ভাবলে, লোকটার দেখছি আমারই মতন জ্বর এসেছে। সহানুভূতি-মাখা স্বরে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে সে বলতে চাইলে, 'ভয় নেই ভায়া, ও-রকম জ্বর বেশীক্ষণ থাকে না।'

কিন্তু তার কথা শুনে সোনার কাঁপুনি দ্বিগুণ বেড়ে উঠল।

তাকে ভালো করে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ভাল্লু কয় পা এগিয়ে গেল।

অমনি ছুটে গেল সোনার আচ্ছন্ন ভাবটা। সে বিকট স্বরে 'ওরে বাবা রে, গেছি রে' বলে চেঁচিয়ে উঠে ঘরের বাইরে মারলে এক লাফ।

ইতিমধ্যে চীৎকারে ও বাসন ফেলে দেওয়ার শব্দে বাড়ীশুদ্ধ সবাই জেগে উঠেছে এবং চারিদিকে ছুটোছুটি করছে লোকজন—বাড়ীর উপরে-নীচে জ্বলে উঠেছে অনেকগুলো লণ্ঠন।

সোনা ভারি হুঁসিয়ার চোর। ভাল্লুকে দেখেও সে গহনার বাক্স ছাড়েনি। তার আবির্ভাবে 'চোর, চোর' রব জাগল। এবং উঠোনে লোকের ভিড় দেখে সে তড়বড় করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

সিঁড়ির মুখে দোতলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বাড়ীর কর্তা স্বয়ং। তিনি বামাল সমেত সোনাকে গ্রেপ্তার করলেন।

সোনা কর্তার দুই পা জড়িয়ে ধরে কাকুতি-মিনতি করে বললে, 'হুজুর! আমাকে মারুন ধরুন, থানায় দিন—কিন্তু আর ভাল্লুক

লেলিয়ে দেবেন না। চোর ধরার জন্য আপনারা ভাল্লুক পুষেছেন জানলে আমরা কি আর এ-বাড়ীতে পা বাড়াতুম!'

কর্তা মহা বিস্ময়ে বললেন, 'ভাল্লুক'? আচম্বিতে উঠোনে আবার রব উঠল—'ভাল্লুক, ভাল্লুক!' চোখের পলক পড়তেই সকলে যে যার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিলে।

লোকেরা জ্বলন্ত লণ্ঠনগুলো উঠোনেই ফেলে রেখে গেল। উঠোনের উপরে দাঁড়িয়েছিল কেবল কর্তার ছোট ছেলে খোকাবাবু—বয়স দেড় বৎসর।

কর্তা স্তম্ভিত চোখে দেখলেন, একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক খোকার কাছে এসে দাঁড়াল। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না বটে, কিন্তু ভয়ে তাঁর প্রাণ উড়ে গেল!

এদিকে খোকার কিন্তু ভয়-ডর কিচ্ছু নেই। সে কুকুর ভারি ভালোবাসত এবং ভাল্লুকে ঠাউরে নিলে বোধহয় বড়জাতের কোন কুকুর বলেই। সে রাঙা রাঙা ঠোঁটে ফিক্-ফিক্ করে হেসে, নধর নধর হাত দুখানি নেড়ে ভাল্লুকে ডাকতে লাগল—'আয়, আয়, আয়!'

ভাল্লু যখন পথে পথে নর্তক-জীবন ও চিড়িয়াখানায় বন্দী-জীবন-যাপন করত, তখনি সে আবিষ্কার করেছিল একটি মস্তবড় সত্য। মানুষের খোকা-খুকিরা তাকে যত ভালোবাসে ও আদর করে, এত আর কেউ নয়। আজ পর্যন্ত সে যত খাবার বখ্‌শিস পেয়েছে তার বেশীর ভাগই এসেছে খোকা-খুকিদের নরম নরম হাত থেকে। তাই সে খোকা-খুকি দেখলেই নিজের বিশেষ বন্ধু বলে মনে করত।

আজও সবাই যখন ভয় পেয়ে লম্বা দিলে, তখন এই নির্ভীক ছোট্ট খোকাটির সাদর আহ্বান শুনে ভাল্লুর মন বড় খুসি হয়ে উঠল। সে তখনি খোকার পায়ের তলায় চার পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আনন্দে গদ-গদ হয়ে একবার এপাশে, আর একবার ওপাশে ফিরতে লাগল।

খোকাও তার পাশে বসে একবার ফিক্ করে হাসে এবং একবার

কচি-কচি হাত বাড়িয়ে ভাল্লুর বড়বড় লোম গুছি করে ধরে টান মারে।

ওদিকে খোকার মা প্রথমটা ভয়ে পালিয়ে গেলেও ছেলেকে উদ্ধার করবার জন্যে আবার উঠোনের উপরে ছুটে এসে, ব্যাপার দেখে অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

ভাল্লু তখন তাঁর পায়ের কাছেও গিয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

খোকার মা ভরসা পেয়ে বললেন, 'কী ভালোমানুষ ভাল্লুক গো!'

সিঁড়ির উপরে কর্তাও তখন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। ভয় ও বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে তিনি বললেন, 'কিন্তু আমার বাড়ীতে ভাল্লুক এল কোথা থেকে ?'

সিঁধেল সোনা তখন আসল ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। সে বললে, 'হুজুর, ঐ ঘরে আমরা সিঁধ কেটেছি। সিঁধের গর্ত দিয়ে ঐ বনের ভাল্লুকটা নিশ্চয় বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়েছে।'

ভাল্লুক কারুকে আক্রমণ করে না, উল্টে পোষা কুকুরের মতন খেলা করে দেখে বাড়ীর লোকেরা আবার উঠোনের আনাচ-কানাচ থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। খোকার মা ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ভয়ে ভয়ে ভাল্লুর গায়ে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন।

কর্তা সোনাকে চাকরদের হাতে সমর্পণ করে নীচে নেমে সিঁধের ঘরে ঢুকলেন। তখনো মোনার ভির্মি ভাঙেনি। সেও ধরা পড়ল। সিঁধের গর্তটা পরীক্ষা করে তিনি ঘরের বাইরে এসে সানন্দে বললেন, 'আমার সর্বস্ব যেতে বসেছিল, ভাগ্যে ঐ কাদের পোষা ভাল্লুক এসে চোর ধরেছে, তাই আবার সব ফিরে পেলুম।'

খোকা মায়ের কোল থেকে ভাল্লুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল।

কর্তা বললেন, 'এই ভাল্লুকটিকে আমি পুষব, ও আমার খোকার খেলার সাথী হবে।'

সাত ।। গাঁটছড়ার 'টাগ-অব্-ওয়ার'

বড়ই বিপদ ! যে-বাঁধন ছিঁড়ে পালাতে চাই আবার সেই বন্ধন ? ভাল্লুর মুখ শুকিয়ে গেল মনের অসুখে।

ভাল্লুকে পুষেছেন খোকার বাবা। তাঁর কুকুর ছিল, এখন মরে গেছে, তারই শিকল দিয়ে ভাল্লুকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

যদিও ভাল্লুর আদর-যত্নের অভাব নেই, তার জন্যে আসে ভালো ভালো খাবার, খোকার মা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, খোকন এসে তার সঙ্গে প্রায় সারাদিনই কথা কয়, খেলা করে, সে-পাড়ার যত ছোট ছোট ছেলেমেয়েও তার চারিপাশ ঘিরে খেলাধুলো করে, তবু ভাল্লু খুসি হতে পারে না। মুখখানি বিমর্ষ করে চুপ মেরে বসে থাকে। আর খেলাধুলো করবে কি, দু-পা এগুতে গেলেই শিকলে পড়ে টান। গলায় দড়ি দিয়ে কার খেলার সাধ হয় বল ?

হপ্তাখানেক গেল। সন্ধ্যাবেলা আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। খোকা ঘুমোতে গিয়েছে। ভাল্লু একলা।

উঠোনের চারিধারে ঘর—কোনদিকেই চোখ ছোটাবার উপায় নেই। ভাল্লু যেদিকে তাকায় দৃষ্টি বাধা পেয়ে ফিরে আসে। এই দুঃখ ভাল্লুকে আরো কাতর করে তোলে।

কেবল উপর-দিকটা খোলা। মুখ তুললে দেখা যায় তারার চুম্‌কি বসানো নীলাকাশের খানিকটা, আর একখানি বড় চাঁদ।

ভাল্লু দীর্ঘশ্বাস ফেললে কিনা জানি না, কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। চাঁদ দেখলে জীবজন্তুদের মনে কি-রকম ভাবের উদয় হয়, আমার পক্ষে তা বলা অসম্ভব। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি। চাঁদনি রাতে পথের কুকুরগুলোর চীৎকার বড় বেড়ে ওঠে। কিন্তু কেন ? কুকুররা চেঁচিয়ে চাঁদকে কী বলতে চায় ?

ভাল্লু কী ভাবছিল? হয়ত সে ভাবছিল যে, হিমালয়ের দিকে গিয়েছে যে-পথ, এই চাঁদ তার উপরেও ফেলেছে রূপোলি আলো। পথের ধারে ধারে হাওয়ার দোলায় দুলছে নীল বন, চন্দ্রকিরণ জ্বলছে তার পাতায় পাতায়। সেখানে চোখ ছোটে দিকে দিকে সুদূরে, নড়লে-চড়লে বাজে না শিকলের বেসুরো সঙ্গীত। সেখানে যত খুসি ছুটোছুটি কর, কোন পাঁচিল, কোন বন্ধ দরজা, কোন বাঁধন বাধা দেয় না। ভাবতে ভাবতে ভাল্লুর মনটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে এল। তার ভাবটা তখন বোধহয় এইরকম—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়?'

ঐ তো সদর-দরজাটা এখনো খোলা রয়েছে! ঐ দরজার ওপারেই তো স্বাধীনতার পথ! একবার যদি শৃঙ্খল ছিঁড়তে পারি তাহলে আর আমাকে পায় কে? কুকুর-বাঁধা শিকল যে ভাল্লুকের পক্ষে নগণ্য, বাড়ীর কর্তা সেটা খেয়ালে আনেননি।

ভাল্লুর এক টানে ঝনাৎ করে ছিঁড়ে গেল শিকল। ভাল্লু মারলে দৌড়। যে-সে দৌড় নয়—যাকে বলে ভোঁ-দৌড়।

গ্রাম পার হয়ে মাঠ, মাঠ পার হয়ে বন, বন পার হয়ে একটা নদী।

ভাল্লু মনের সুখে খানিকক্ষণ নদীতে সাঁতার কাটতে লাগল। তার সাড়া পেয়ে একটা কুমির ভেসে উঠে তদারক করতে এল। ভাল্লু মুখ খিঁচিয়ে তাকে দিলে এক জোর ধমক। শিকারটা সুবিধা-জনক নয় বুঝে কুমির আবার ডুব মারলে। এবং ভাল্লুও বুঝলে, যেখানে জলে বেড়ায় প্রকাণ্ড টিকটিকি সে-ঠাঁই মোটেই নিরাপদ নয়। সে তাড়াতাড়ি নদীর ওপারে গিয়ে উঠল।

তারপরেই ভাল্লুর নাকে এল একটা মিষ্টি সুগন্ধ—অর্থাৎ খাবারের গন্ধ।

এখানেই তার দুর্বলতা। তাকে অনায়াসেই পেটুকচূড়ামণি উপাধি দেওয়া যেতে পারে। নাকে খাবারের গন্ধ এলে সে আর

স্থির থাকতে পারে না—তার ভরা পেটেও জেগে ওঠে নতুন ক্ষুধার তাড়না।

শূন্যে নাক তুলে সে অগ্রসর হতে লাগল। একটা গ্রামে ঢুকল। গ্রামের এক বাড়ীতে আজ বিয়ের ঘটা। সাজানো আলোর মালা। লোকজনের ছুটোছুটি ও হাঁক-ডাক। লুচি-তরকারির গন্ধ।

বাইরের উঠোনে বরযাত্রীরা আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। পান-তামাক নিয়ে চাকররা আনাগোনা করছে। বালকরা ফুলের মালা ও প্রীতি-উপহারের কবিতা বিতরণ করছে। একজন বড় ওস্তাদ তানপুরা কাঁধে নিয়ে, কানে এক হাত চেপে মস্ত বড় হাঁ করে পিলে-চমকানো তান ছাড়ছেন আর সমঝদাররা তারিফ করে বলছেন, বাহবা-কি-বাহবা। এবং একদল ফাজিল ছেলে মাঝে মাঝে আড়াল থেকে চ্যাঁচাচ্ছে—বাহবা-কি-ছ্যা-ছ্যা।

ভাল্লু কোনদিনই মানুষকে ভয় করত না; কারণ বরাবরই সে দেখে আসছে মানুষরাই তাকে যমের মতন ভয় করে। সুতরাং সে অম্লান বদনে গদাই-লস্করি চালে আসরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

পর-মুহূর্তেই কী যে দক্ষযজ্ঞ ছত্রভঙ্গ কাণ্ড বাধল, সেটা তোমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারবে। বরযাত্রীরা পালাল পায়ের জুতো ফেলে, তানপুরাহীন ওস্তাদজী লম্বা দিলেন ওস্তাদি তান ভুলে, বরকর্তা পালাতে গিয়ে খেলেন ভীষণ আছাড় এবং সেই অবস্থাতেই তাঁর মনে পড়ল ভাল্লুকরা মরা মানুষ ছোঁয় না, সুতরাং দুই চোখ বুঁজে ফেলে আড়ষ্ট হয়ে এমন ভাব দেখালেন, যেন তিনি মরে কাঠ হয়ে গিয়েছেন—যদিও মস্ত ভুঁড়ির হাপরের মতন হাঁপানি তিনি বন্ধ করতে পারলেন না। আধ মিনিটের মধ্যেই আসর জনশূন্য ও শব্দহীন।

ভাল্লু দু-একগাছা ফুলের মালা শুঁকে বুঝলে, সেগুলো খাবার জিনিস নয়। একটা ভরতি চায়ের পেয়ালায় জিভ ডুবিয়ে চাখলে, তাও অখাদ্য বলে মনে হল। তার পরেই তাকে আহ্বান করলে ভিয়ান-ঘরের লুচি-তরকারির গন্ধ। সেই গন্ধের উৎপত্তি কোথায়

জানবার জন্যে ভাল্লু আবার দ্রুতপদে অগ্রসর হল।

অন্দর-মহলের উঠোন। দালানে ঠিক যেন একটি লাল চেলির পুঁটলির পাশে টোপর মাথায় বর-বাবাজী ঘাড় হেঁট করে বসে আছে, পুরোহিত করছে মন্ত্র উচ্চারণ এবং তাদের ঘিরে গয়না ও রংচঙে কাপড়-পরা মেয়েদের ভিড়।



বরের দুই কাঁধে দুই পা দিয়ে উঠে উঁচু কুলুঙ্গিটার ভিতরে ঢুকে বসল।

কনের মা বিন্দি-দাসীকে ডেকে বললেন, 'ওরে, সদরে গিয়ে দেখে আয় তো, ওখানে অত হৈ-চৈ কিসের?'

বিন্দি সদরের দিকে গেল এবং তারপরেই মাটিতে আঁচল লোটাতে লোটাতে দুই চোখ কপালে তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে

ফিরে এল এবং দুম্-দাম্ শব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

কনের মা সবিস্ময়ে বললেন, 'ওরে বিন্দি, কী হল রে, হঠাৎ তুই ক্ষেপে গেলি নাকি?'

বিন্দির জবাব পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু ভাল্লুর দেখা পাওয়া গেল।

পুরুত-ঠাকুর বুড়ো-থুথ্‌থুড়ো হলেও অতি চটপটে, তিড়িং করে লাফ মেরে তখনি চম্পট দিলেন। বর রীতিমত হতভম্ব! তার পাশের পুঁটলিটা আশ্চর্যরকম জ্যান্ত হয়ে উঠল।

বর-কনের পিছনকার দেওয়ালের গায়ে ছিল একটা মস্ত কুলুঙ্গি। কনের বুঝতে দেরি লাগল না যে, এখন লজ্জা করবার সময় নয়। সে টপ্ করে গাত্রোত্থান করলে এবং ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া বরের দুই কাঁধে দুই পা দিয়ে উঠে উঁচু কুলুঙ্গিটার ভিতরে ঢুকে বসল। অন্যান্য মেয়েরা যখন কলরব তুলে উধাও হল, বরও তখন বুঝতে পারলে 'যঃ পলায়তি স জীবতি।'

কিন্তু পালাতে গিয়ে পড়ল গাঁটছড়ায় টান। বর গাঁটছড়া ধরে টান মারতেই কুলুঙ্গির ভিতর থেকে কনেও গাঁটছড়ার অন্য প্রান্ত ধরে প্রাণপণে টেনে রইল। বরও ছাড়বে না, কনেও ছাড়বে না—সে এক অপূর্ব 'টাগ-অব্-ওয়ার'।

ভাল্লুর ভাব দেখলে বোধ হয়, এখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই যেন হয়নি। খাবারের গন্ধ তাকে ডাক দিয়েছে, কোনদিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করবার সময় তার নেই। ভিয়েন-ঘর খুঁজে বার করতে বিলম্ব হল না।

সেখানেও হল আর-এক দফা হাঁউ-মাউ, হুটোহুটি, ছুটোছুটি, লুটোপুটির পালা। তারপর সব ঠাণ্ডা।

ভাল্লু তখন মনের সাধে বেছে বেছে খাবার খেতে বসল।

খেতে খেতে যখন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তখন বাড়ীর ভিতরে কোথায় উপরি-উপরি দুইবার গুড়ুম্ গুড়ুম্ করে বেজায় আওয়াজ হল।

ভাল্লু চমকে উঠল। ওরে বাবা, এখানেও নতুন রকম লাঠির

গোলমাল ? মানুষগুলো কি পাজি, খেয়ে-দেয়ে যে একটু জিরিয়ে নেব তারও জো নেই।

ভাল্লু হন্তদন্তের মত সেখান থেকে সরে পড়ল।

আট ।। বনের বাঘা

জ্বালালে রে, ভারি জ্বালালে! যেখানে যাব, সেখানেই ঐ নতুন রকম লাঠি গুড়ুম-গুড়ুম করে আক্কেল গুড়ুম করে দেবে ?

ভাল্লু পাঁই-পাঁই করে ছুটতে লাগল। অত বড় আর ভারি দেহ নিয়ে কী করে যে সে অত তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারে, ভাবলেও অবাক হতে হয়।

আবার গ্রামের পর গ্রাম, বনের পর বন, মাঠের পর মাঠ, নদীর পর নদী। মাথার উপরে সোনার চাঁদ খালি হাসে আর হাসে, পরীদের উড়ন্ত ফানুসের মতন জোনাকীরা টিপ্‌টিপ্‌ করে জ্বলতে জ্বলতে উড়ে যায়, মাঝে মাঝে 'কা-হুয়া, কা-হুয়া' বলে চেঁচিয়ে শেয়ালরা খবরদারি করতে আসে।

স্বাধীনভাবে পথ চলার আনন্দে ভাল্লুর মন যখন রীতিমত মেতে উঠেছে, বনের ঝোপ নেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল হাম্‌দোমুখো বাঘা।

ভাল্লু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঘা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল। ভাল্লুও আড়চোখে তাকে দেখে নিয়ে বুঝে ফেললে, এ জীবটিকে বৈষ্ণব বলে সন্দেহ হয় না।

বাঘা দু-পা এগিয়ে এল। ভাল্লু বললে, 'ঘোঁৎ ?' ('কে তুমি ?')

বাঘা মাটিতে ল্যাজ আছড়ে বললে, 'গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ !' ('আমি বাঘা। তোমার ঘাড় মটকাতে চাই।')

মাটিতে আছড়াবার মতন ল্যাজ ভাল্লুর ছিল না। তবু বাঘাকে ভড়কে দেবার জন্যে একটা কিছু করা উচিত বুঝে সে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনের দুই থাবা নেড়ে নেড়ে বললে,

'ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-ঘোঁৎ!' ('মট্ করে মটকাবার মতন ঘাড় আমার নয়। তফাতে সরে যা হতভাগা!')

বাঘা মনে মনে তারিফ করে বললে,—এই কুকুরমুখো ধিঙ্গিটা আমার ওপরে বেশ এক হাত নিলে দেখছি। আমি ল্যাজটা আছড়াতে পারি বটে, কিন্তু আমার পক্ষে এমন মানুষের মতন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব।—প্রকাশ্যে বললে, 'হালুম্ হুলুম্, হালুম্ হুলুম্।'

ভাল্লু বললে, 'ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক!'

বাঘা বললে, 'রক্ত খাব!'

ভাল্লু বললে, 'থাবড়ে বদন বিগড়ে দেব!'

—'আও, আও!'

—'নিকালো হিঁয়াসে!'

—'হোঁদল্-কুৎকুতে!'

—'থ্যাবড়ানাকী চেরণদাঁতী!'

তারপর বাক্যযুদ্ধের পালা সাঙ্গ। ভাল্লুর ঘাড়ে পড়বার জন্যে বাঘা মারলে লাফ—ভাল্লু গেল চট করে একপাশে সরে। বাঘা মাটিতে পড়েই ফিরে ঘাঁক্ করে ভাল্লুর পিছনে কামড়ে দিলে। ভাল্লুও ফিরে বাঘার মুখে মারলে ধাঁ করে এক থাবড়া।

ভাল্লুর পিছনে ছিল পুরু লোম, বাঘার কামড়ে তার কিছুই হল না। কিন্তু ভাল্লুর থাবড়ায় বাঘার বাহারি মুখের যে দুর্দশা হল তা আর বলবার নয়।

তখন অরণ্য-রাজ্যের প্রজারা চারিপাশে এসে জড়ো হয়েছে মজা দেখবার জন্যে। শিয়াল, বনবিড়াল, সজারু এবং গাছের ডালে লাঙ্গুল ঝুলিয়ে তিনটে হনুমান। এমন কি একটা ভীতু খরগোসও গর্তের ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি না মেরে থাকতে পারলে না। মজা দেখতে এল না কেবল হরিণরা।

এর আগে বাঘা কোনদিন ভাল্লুক দেখেনি, কারণ ভাল্লুকরা এ বনে বসবাস করত না। আজ প্রথম ভাল্লুকের পরিচয় পেয়ে সে দস্তুরমত হতভম্ব হয়ে গেল।

ভাল্লু বললে, 'ভায়া, আর একহাত লড়াই করবে নাকি?'

বাঘার গা যেন জ্বলে গেল। কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে সে আবার ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

শেয়ালরা সুধোলে, 'কা-হুয়া, কা-হুয়া?'

'কুছ্ নেহি হুয়া' বলে ভাল্লু আবার চলতে সুরু করলে।

চাঁদের আলোয় ধব্‌ধব্ করছে বনের পথ। পাপিয়ারা মেতেছে গানের জলসায়। নিঝুম রাতের কানে কানে বাতাস বাজাচ্ছে সবুজ পাতার বীণা। পথের শেষে ঘাস-বিছানায় শুয়ে একটি নদী কল-তানের ছন্দে গাঁথছিল হীরার মালা।

ভাল্লুর তেষ্টা পেয়েছে। সে নদীর ধারে গিয়ে চুক্-চুক্ করে জলপান করছে, এমন সময় এখানেও একটা কুমির তার সঙ্গে আলাপ করতে এল। কিন্তু ভাল্লু জলে নামলে না। সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, আলিপুরের চিড়িয়াখানায়, মানুষদের ঘরের দেওয়ালে আমি তো অনেক টিকটিকি দেখেছি, কিন্তু জলের টিকটিকিগুলো এত বড় হয় কেন?

কুমিরটা প্রায় তীরের কাছে এসে বললে, 'ভাল্লুক ভায়া, একবার জলে নামো না হে। তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা কই!'

ভাল্লু বললে, 'না হে ধুমসো টিকটিকি, আমার সময় নেই।'

—'এত ব্যস্ত কেন? কোথা যাও?'

—'ক্ষিধে পেয়েছে। বটতলায় চললুম বটফল কুড়িয়ে খেতে।'

নয় ॥ কালুয়া-সুন্দরী

বটগাছের ঝিল্‌মিলে পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদ হাসিমুখে উঁকি মেরে দেখলে, ভাল্লু মনের সাধে কুড়িয়ে খাচ্ছে মাটির উপর ঝরে-পড়া বটের ফল।

তারপর চাঁদ নিলে ছুটি। সমস্ত পৃথিবী পড়ল অন্ধকারের

ঢাকনা চাপা,—শূন্যে জেগে রইল খালি তারা-ছড়ানো আকাশের মায়াময় আবছায়া।

ভাল্লুর ঘুম পেলে। নরম বিছানার খোঁজে সে একটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে তার আগেই ঢুকে ঘুমোচ্ছিল একটা মস্ত গোখরো সাপ, ভাল্লুর সাড়া পেয়ে সে কালো বিদ্যুতের মত মাথা তুলে বলে উঠল, 'ফোঁস, ফোঁস্! রোস্ তো, রোস্ তো,—দেখবি মজা—রোস্ তো, রোস্ তো। ফোঁস্!' সাপ মারলে ছোবল, কিন্তু তার আগেই চটপটে ভাল্লু চালালে থাবা, গোখরোর বিষ-দাঁত শুদ্ধ মুণ্ডু গেল কোথায় উড়ে। ভাল্লু একটু তফাতে গিয়ে থেবড়ি খেয়ে বসে দেখতে লাগল, গোখরোর মুণ্ডহীন লটপটে ধড়টা ক্রমাগত পাকসাট মারছে আর পাক খাচ্ছে। ভাল্লু অবাক হয়ে ভাবলে, এ কি রকম জানোয়ার রে বাবা! মাথা না থাকলেও মরবার নাম করে না! আবার তেড়ে কামড়াতে আসবে নাকি? দরকার নেই এখানে ঘুমিয়ে, অন্য ঝোপে যাওয়া যাক!...

পুব-আকাশে রামধনু-রঙের খেলা দেখে পাখিরা খুসি হয়ে ঘুম-ভাঙানিয়া তান সাধতে লাগল, কিন্তু ভাল্লুর ঘুম তবু ভাঙল না। গেল রাতে তার কম খাটুনি হয়নি তো, স্বপ্নলোক থেকে সে সহজে ফিরে আসতে রাজি হল না।

বেলা বাড়ছে, চাষারা মাঠে মাঠে লাঙল চষছে, ক্ষেতের আশপাশ দিয়ে হাটের লোক আনাগোনা করছে।

হঠাৎ কোত্থেকে বাজল কার ডুগডুগির ডিমি-ডিমি। ভাল্লু চমকে জেগে উঠল। কান খাড়া করে শুনলে ডুগডুগির বাজনা। ভাবলে, কে বাজায় এখানে এ বাজনা?

ডুগডুগির সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে মানুষদের উল্লাস-ধ্বনি ও হাত-তালির শব্দ। এই উল্লাস-ধ্বনি ও ডুগডুগির ভাষা যে ভাল্লুর কাছে অত্যন্ত পরিচিত! পথে পথে ডুগডুগির তালে তালে কত নাচের আসর সে যে মাত করে দিয়েছে, তা কি ভোলবার কথা? ভাল্লুর মনটা আনচান করতে লাগল। কথায় বলে, 'চড়কে-পিঠ ঢাকে

কাটি পড়লেই সড়-সড় করে ওঠে', ভাল্লুর অবস্থাও হল তাই। নিজেকে সে একজন উঁচু-দরের নৃত্যশিল্পী বলে জানে, সুতরাং ডুগডুগির ছন্দ শুনে আর স্থির থাকতে পারলে না। ধড়মড় করে উঠে বসে ঝোপের ফাঁক দিয়ে সাবধানে একটুখানি মুখ বাড়ালে।

খানিক তফাতেই নদীর ধার দিয়ে নদীরই মতন এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে হাটের পথের রেখা। পথের পাশে প্রকাণ্ড একটা অশত্থ-গাছ এবং তারই ছায়ার নীচে জমেছে লোকের ভিড়। সেইখানে ডুগডুগি বাজিয়ে একটা লোক দেখাচ্ছে ভাল্লুক-নাচ। যে ভাল্লুকটা নাচছে সে ভাল্লুর মতন জোয়ান মস্ত-বড় নয় বটে, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়, তারা দুজনেই হচ্ছে একই জাতের জীব।

চাঙ্গা হয়ে উঠল ভাল্লুর শিল্পী-প্রাণ। সে মাথা তুলে, মাথা নামিয়ে, এপাশে-ওপাশে মাথা কাত করে—নানানভাবে দস্তুরমত সমালোচকের দৃষ্টিতে নতুন ভাল্লুকটার নাচ খানিকক্ষণ ধরে দেখে বেশ বুঝে ফেললে, এ এখনো নৃত্যকলার ছাত্র মাত্র—তার মতন উচ্চশ্রেণীতে উঠতে, এর এখনো অনেক দিন লাগবে।

ভাল্লু মনে মনে ভাবলে, বোকা মানুষগুলো এই বাজে নাচ দেখেই এত হাততালি আর বাহবা দিচ্ছে, সেরা আর্ট কাকে বলে নিশ্চয় এরা তার খবর রাখে না! ঝোপ থেকে বেরিয়ে একবার দেখিয়ে দেব নাকি আমার পায়ের কায়দা?···ধেই-ধেই করে নাচবার জন্যে তার দুই পা যেন নিস্‌পিস্‌ করতে লাগল।

নাচ দেখতে দেখতে ভাল্লু হঠাৎ আর-একটা আবিষ্কার করে ফেললে। যে নাচছে, সে তার মতন পুরুষ নয়—সে হচ্ছে ভল্লুকী।

সঙ্গে সঙ্গে ভাল্লুর মত গেল বদলে। মনে মনে সে বললে, 'আহা মরি মরি, ভল্লুকীর কী সুন্দর দেহের গড়নটি! মাঝে মাঝে নাচের তাল কেটে যাচ্ছে বটে—তা একটু-আধটু তাল অমন কেটেই থাকে, কিন্তু কী চমৎকার ওর নাচের ধরনটি! ওগো ভাল্লুক-মেয়ে, তুমি হিমালয়ের কোন্‌ বনের ঋক্ষরাজকুমারী? কোন্‌ পামর মানুষ

তোমাকে বাপ-মায়ের আদর-ভরা কোল থেকে ছিনিয়ে এনে এমন পথের ধুলোয় নামিয়েছে ? হায় হায়, কত কষ্টই পাচ্ছ না জানি !'

হঠাৎ বোধহয় নাচের তাল বেশিরকমই কেটে গেল, ভাল্লুকওয়ালা লাঠি তুলে ভল্লুকীর উপরে ঠকাস্ করে এক ঘা বসিয়ে দিলে। ভল্লুকী কেঁদে উঠল, তার কান্নার আওয়াজ শাঁখের ডাকের মত।

ভাল্লুক-মেয়ের গায়ে হাত তোলা ? এ নিদারুণ দৃশ্য ভাল্লু সহ্য করতে পারলে না, ভয়ঙ্কর এক গর্জন করে সে একেবারে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল। যারা একমনে নাচ দেখবার আমোদে মেতেছিল, সেই ভয়ঙ্কর গর্জন শুনে বেজায় চমকে তারা ফিরে দেখে, ঝোপ ভেদ করে ছুটন্ত বিভীষিকার মত আবির্ভূত হয়ে একটা সুবৃহৎ ভাল্লুক বেগে তেড়ে আসছে তাদের দিকেই। গ্রামের প্রান্তে প্রকাশ্য দিবালোকে এমন অসম্ভব ব্যাপার কল্পনাতীত বলে প্রথমটা নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে না পেরে দু-এক মুহূর্ত সকলে দাঁড়িয়ে রইল হতভম্বের মত ; এবং তারপরেই হাঁউ-মাঁউ করে চেঁচিয়ে যে যেদিকে পারলে টেনে লম্বা দিলে।

ভাল্লুকওয়ালাদের ব্যবসা ভাল্লুক নিয়ে, কাজেই প্রথমটা সে ভয় পেয়ে সেখান থেকে নড়তে রাজি হল না।

কিন্তু ভাল্লু যখন কাছে এসে মানুষের মতন দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, সামনের দুই পায়ের নখ বার করা থাবা বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হল তখন ভল্লুকীর বাঁধন-দড়ি ছেড়ে বিকট চীৎকার করে সেও দিলে চোঁ-চা চম্পট।

ভাল্লু খানিক দূর পর্যন্ত ভাল্লুকওয়ালার পিছনে পিছনে তাড়া করে গেল। তারপর ফিরে আবার গদাইলস্করি চালে ভল্লুকীর দিকে আসতে লাগল।

ইতিমধ্যে ভল্লুকী মাটিতে চার থাবা পেতে বসে চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে ভাল্লুকে ভালো করে দেখে নিয়েছে এবং বলতে কি— তাকে তার পছন্দও হয়েছে।

ভাল্লু কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার কিছুক্ষণ ধরে

ভল্লুকীকে মুগ্ধ চোখে নিরীক্ষণ করলে। তারপর এগিয়ে ভল্লুকীর ঠাণ্ডা নাকে নিজের ঠাণ্ডা নাক ঘসে মধুর স্বরে বললে, 'ঘোঁৎ-ঘোঁৎ!'



বিকট চীৎকার করে সেও দিলে চোঁ-চা চম্পট।

ভল্লুকীও লজ্জিত চোখ নামিয়ে মেয়েলি মিহি গলায় বললে, 'ঘোঁৎ-ঘোঁৎ!'

তারপর তাদের দুজনের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হল, আমার বিশ্বাস তা হচ্ছে এইরকম :

ভাল্লু বললে, 'ওগো রাজকন্যে, তোমার নাম কী, তোমার বাসা কোন্ বনে ?'

ভল্লুকী মাছি তাড়াবার জন্যে গা-ঝাড়া দিয়ে বললে, 'জানি না। জ্ঞান হবার আগেই উনুনমুখো মানুষরা আমাকে ধরে এনেছে।'

—'মানুষরা তোমার কোন নাম রাখেনি ?'

—'ওমা, তা আবার রাখেনি! মানুষরা আমাকে কালুয়া বলে ডাকে।'

—'কালুয়া? আ মরি মরি, কী মিষ্টি নাম!' ভাল্লু দুই চোখ মুদে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল।

ভল্লুকী খুসি হয়ে সুধোলে, 'বীরবর, তোমার নামটি তো শোনা হল না!'

ভাল্লু ভরাট গলায় বললে, 'আমার নাম ভাল্লু।'

—'ভাল্লু? হুঁ, যোদ্ধার মতন নামই বটে!···ঘ্যাঁক্, ঘ্যাঁক্ —ঘোঁক!'

—'একি?'

—'একঝাঁক মাছি গো। তিনটেকে খেয়ে ফেলেছি। বাকি-গুলো ভারি জ্বালাচ্ছে!'

ভল্লুকীর মন রাখবার জন্যে ভাল্লু তখন মক্ষিকাদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর বললে. 'নাঃ, অসম্ভব! কাল আমি বনের বাঘের সঙ্গেও যুদ্ধে জিতেছি কিন্তু পাজির পা-ঝাড়া এই উড়ন্ত শত্রুগুলো ধরাই দেয় না, যুদ্ধ করব কী? এক বেটা আবার আমার কানে ঢুকে "বোঁ বোঁ" বলে গান গাইছে। রাজকন্যে, এখান থেকে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

দুজনে হন্-হন্ করে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে ভল্লুকী বললে, 'ক্ষিধের চোটে আমার নাড়ী চোঁ-চোঁ করছে।'

ভাল্লু বললে, 'বটফল খেতে চাও তো ঐ বটতলায় চল।'

বটফল খেতে খেতে ভল্লুকী বললে, 'হ্যাঁগো, তুমি অমন ছট্‌ফট্ করছ কেন?'

—'বললুম তো কানে ঢুকেছে মাছি।'

—'কই, দেখি!'

ভাল্লু শুয়ে পড়ে মুখ কাত করে রইল। ভল্লুকী তার কানের কাছে নিজের নাক নিয়ে গিয়ে হুস্‌হুস্ করে ছাড়তে লাগল প্রচণ্ড নিশ্বাস। মাছিটা টুপ করে বেরিয়েই ভল্লুকীর বদন-বিবরে ঢুকে পড়ল।

ভাল্লু কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, 'কালুয়া সুন্দরী, তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?'

ভল্লুকী আনন্দে গদগদ হয়ে হেলে-দুলে বললে, 'রাজি।'

ব্যস, তাদের বিয়ে হয়ে গেল। মানুষের বিয়ের মতন জানোয়ারদের বিবাহ ব্যাপারে লক্ষ কথা, পুরুত, মন্ত্র, বরপণ ও আরো হাজার ঝঞ্ঝাটের দরকার হয় না—এ একটা মস্ত সুবিধা।

ঠিক এমনি সময়ে দূরে উঠল একটা গোলমাল। নতুন বর-বউ চমকে ফিরে দেখে, শত শত লোক আকাশ ফাটানো চীৎকার করতে করতে মাঠ দিয়ে ঝড়ের মতন ছুটে আসছে এবং সকলের আগে আগে আসছে সেই ভাল্লুকওয়ালা।

ভল্লুকী ভাল্লুর পেটের তলায় মুখ গুঁজে সভয়ে বললে, 'ওমা, কী হবে গো!'

ভাল্লু পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সদম্ভে বললে, 'কুছ্ পরোয়া নেহি। মাছির মতন কানের মধ্যে ঢুকে ওরা বোঁ-ও-ও বলে গান গাইতেও পারে না। যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি।'

ভল্লুকী সাহস পেয়ে বললে, 'বীরবর তুমিই ধন্য!'

গুড়ুম্ গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ হল।

ভাল্লু বিনা বাক্যব্যয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে চার পায়ে দৌড়তে আরম্ভ করলে।

ভল্লুকী বললে, 'তুমি কি ওদের আক্রমণ করতে যাচ্ছ?'

—'পাগল, আমি পালাচ্ছি!'

—'সে কী গো, আমাকে ফেলে?'

—'উপায় কী গিন্নি, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমি নতুন রকম লাঠির শব্দ শুনেছি, আর কি এখানে থাকি?'

নদীর ধারে গিয়ে ভাল্লু ফিরে দেখলে, ভল্লুকী তার সঙ্গ ছাড়েনি। খুসি হয়ে বললে, 'এই যে, তুমিও এসেছ, ভালোই হয়েছে। এখন জলে ঝাঁপ দাও তো দেখি! কিন্তু সাবধান, ধুম্‌সো টিকটিকিকে কাছে ঘেঁষতে দিও না।'

—'ধুম্‌সো টিকটিকি আবার কে?'

জলে ঝাঁপ খেয়ে ভাল্লু বললে, 'ঐ দেখ!'

কিন্তু কুমির-ভায়া হাঁদা-গঙ্গারাম নয়। একসঙ্গে ডবল ভাল্লুক দেখে সে ডুব মেরে অন্যদিকে চলে গেল।

দশ ॥ কালুসর্দার ও টুনু-ঝুনু

ভাল্লু সাঁতার কেটে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দেখলে, ভল্লুকী তার পিছনে নেই, কখন জল থেকে উঠে গিয়ে চুপ করে ডাঙার উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাল্লু চীৎকার করে তাকে ডাকলে।

কিন্তু ভাল্লুকী তবু সাড়া দিলে না।

ভাল্লু বুঝলে, নদীর জলে ধুম্‌সো টিকটিকিকে দেখে ভলকী ভয়ে ভড়কে গিয়েছে। বউকে অভয় দেবার জন্যে ভাল্লু যখন ফিরব ফিরব করছে, তখন আবার গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ, এবং সোঁ করে কি একটা জিনিস এসে ভাল্লুব ঠিক পাশ দিয়ে জলের উপরে ছোঁ মেরে চলে গেল।

ভাল্লু বোকা নয়। নতুন রকম লাঠির চীৎকার শুনেই কালুয়া-সুন্দরীর কথা ভুলে সে বেগে সাঁতার কাটতে শুরু করলে। মিনিট কয় পরে ওপারে গিয়ে উঠে ফিরে দেখলে, ভাল্লুকওয়ালা এসে আবার কালুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাল্লু ধরলে বনের পথ।

নয়নপুরের জমিদারের নাম প্রশান্ত চৌধুরী। তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে। তাদের ডাকনাম টুনু ও ঝুনু।

ঝুনু হচ্ছে দিদি, বয়স ছয় বৎসর। টুনুর বয়স চারের বেশী নয়।

ঝুনু একেবারে পাকা গিন্নিটি, এই বয়সেই তার নাকি কিছুই জানতে বাকি নেই। সে জানে আকাশের তারারা হচ্ছে চাঁদামামার খোকা-খুকি। ফুলপরীরা রাত্রে যেসব ফানুস উড়িয়ে দেয়, মানুষরা যে তাদেরই জোনাকি বলে ডাকে এ বিষয়েও ঝুনুর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। ঝুনু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে বনগাঁবাসী মাসি-পিসির বাড়ীতে গিয়ে নিমন্ত্রণ খেয়ে আসে, তারপর সকালে সেখানকার গল্প বলে টুনুকে অবাক করে দেয়।

আজ সে হঠাৎ বললে, 'টুনু, হরিণ দেখেছিস?'

—'না।'

—'হরিণরা কোথায় থাকে জানিস?'

—'উহুঁ।'

—'বনে।'

—'কোন্ বনে?'

—'মাঠের ওপারে যে বনটা দেখা যাচ্ছে, ঐ বনে।'

টুনু বললে, 'আমি হরিণ দেখব।'

ঝুনু বললে, 'হাঁটতে পারবি?'

—'হুঁ-উ-উ!'

—'তবে আয় আমার সঙ্গে।'

তেপান্তর মাঠ। যেখানে বনরেখা দেখা যাচ্ছে সেখানে যেতে মাইল তিনেক পথ পেরুতে হয়। পায়ে হাঁটা মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চলল ঝুনু আর টুনু।

মাইল খানেক পথ চলতে না চলতেই টুনু বসে পড়ে বললে, 'দিদি, আমায় কোলে নে।'

ঝুনু কী আর করে, টুনুকে কোলে তুলে নিলে। কিন্তু চার

বছরের খোকাকে কোলে নিয়ে ছয় বছরের খুকি আর কতক্ষণ পথ চলতে পারে? খানিক পরেই হাঁপিয়ে পড়ে ঝুনুও পথের উপরে বসে পড়ল।

এমন সময়ে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করল কালাচাঁদ মণ্ডল বা কালু-সর্দার। সে হচ্ছে এ অঞ্চলের চোর-ডাকাতদের দলপতি। প্রথমেই তার শিকারী চোখ পড়ল ঝুনুর গলার সোনার হার ও হাতের সোনার চুড়ির উপরে।

কালু গলার আওয়াজ যথাসাধ্য নরম করে সুধোলে, 'তোমরা কাদের খোকা-খুকি গো?'

ঝুনু বললে, 'আমার বাবা জমিদারবাবু।'

—'এখানে কেন?'

—'ঐ বনে যাব।'

—'বনে গিয়ে কী করবে খুকুমনি?'

—'হরিণ দেখব।'

—'ও, তাই নাকি? তা হরিণ তো ও-বনে থাকে না!'

—'হরিণ তবে কোথায় থাকে শুনি?'

খানিক দূরের একটা জঙ্গল দেখিয়ে কালু বললে, 'ওখানে অনেক হরিণ আছে। দেখবে?'

—'দেখব বলেই তো এসেছি।'

—'এস, তবে আমার কোলে ওঠ।'

ঝুনু আর টুনুকে নিয়ে কালু জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হল।

এখন, সেই জঙ্গলেরই ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের ভাল্লু। একটা ঝুপসি ঝোপের তলায় ঢুকে সে তখন ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ তার কানে গেল শিশুর কান্না।

ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে ভাল্লু ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ঝোপের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে দিলে।

কালু তখন এক হাতে ঝুনুকে মাটির উপরে চেপে ধরে আর এক হাতে তার গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিচ্ছে।

আগেই বলেছি আমাদের ভাল্লু প্রত্যেক খোকা-খুকিকে বন্ধু বলে মনে করত। এতটুকু একটি খুকির উপরে এমন বিষম অত্যাচার সে সহ্য করতে পারলে না। ভয়ানক গর্জন করে তেড়ে গিয়ে কালুকে মারলে প্রচণ্ড এক চড়। কালু আর্তনাদ করে ঠিকরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

কালুর কবল থেকে মুক্তি পেয়েও ঝুনু ও টুনুর পিলে গেল চমকে। সামনে তাদের প্রকাণ্ড এক ভাল্লুক! সে আবার চড় মেরে মানুষকে রক্তাক্ত করে দেয়! তারা দুজনেই কেঁদে উঠল।

ভাল্লু বুঝলে, তাকে দেখে শিশুরা ভয় পেয়েছে। সে তখন দুই পায়ে ভর দিয়ে ধেই-ধেই করে নাচতে আরম্ভ করলে—কারণ বরাবরই সে দেখে আসছে, তাকে নাচতে দেখলেই শিশুরা হেসে উঠে খুসি হয়ে হাততালি দেয়।

যা ভেবেছে তাই! ভাল্লুক-নাচ দেখেই ঝুনু আর টুনু কান্না ভুলে গেল।

খানিক্ষণ নাচানাচি করে ভাল্লু মাটির উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিতে দিতে ঝুনু আর টুনুর পায়ের কাছে গিয়ে, চার থাবা তুলে একেবারে স্থির হয়ে রইল।

টুনুর মনে হল, ভাল্লু যেন মিট্‌মিট্ করে তাদের পানে তাকিয়ে হাসছে। সে ভয়ে ভয়ে ভাল্লুর গায়ে হাত দিলে, ভাল্লু তবু নড়ল না। ঝুনু তখন সাহস সঞ্চয় করে তার গায়ে একবার হাত বুলিয়ে নিলে, ভাল্লু তখনও আড়ষ্ট।

ঝুনু বললে, 'ভাল্লুকটা ভারি ভালোমানুষ রে!'

টুনু বললে, 'একে আমি পুষব।'

জমিদার বাড়ীতে তখন হুলুস্থুলু পড়ে গিয়েছে—ঝুনু ও টুনুর অন্তর্ধানে.চারিদিকে উঠেছে খোঁজ খোঁজ রব।

জমিদার প্রশান্ত চৌধুরী অনেক লোকজন নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন। সঙ্গে আছে তাঁর বাল্যবন্ধু নবীনবাবু। তিনি আলিপুর

চিড়িয়াখানার একজন পদস্থ কর্মচারী, ছুটি পেলে মাঝেমাঝে এখানে বেড়াতে আসেন।

একজন লোকের মুখে শোনা গেল, ঝুনু ও টুনুকে দেখা গিয়েছে মাঠের ধারে।

তারপর মাঠের এক চাষী খবর দিলে, কালুসর্দার দুটি শিশুকে কোলে করে নিয়ে গিয়েছে জঙ্গলের দিকে।



হেলে-দুলে পায়চারি করছে বিরাট এক ভাল্লুক,
পিঠে তার বসে রয়েছে ঝুনু ও টুনু।

ডাকাত কালুসর্দার? প্রশান্তবাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। দলবল নিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটলেন তিনি পাগলের মত।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখা গেল এক দৃশ্য—যেমন ভয়াবহ, তেমনি অদ্ভুত!

একদিকে মাটির উপরে পড়ে রয়েছে কালুর রক্তাক্ত ও অচেতন দেহ, হাতে তার ঝুনুর সোনার হার। আর একদিকে হেলে-দুলে পায়চারি করছে বিরাট এক ভাল্লুক, পিঠে তার বসে রয়েছে ঝুনু ও টুনু।

টুনু সকৌতুকে বলছে, 'হট্ হট্ ঘোড়া, হট্ হট্। জোর্‌সে চল্, জোর্‌সে চল্!'

নবীনবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'আরে, এ যে আমাদের চিড়িয়াখানার সেই ভাল্লুকটা! আজ কদিন হল পালিয়ে এসেছে!'

ভাল্লু বেগতিক দেখে ঝুনু ও টুনুকে পিঠে করেই চম্পট দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু এবার সে আর ফাঁকি দিতে পারলে না, মানুষের উপকার করতে গিয়ে আবার মানুষের হাতেই বন্দী হল।

ঝুনুর মুখে সমস্ত শুনে প্রশান্তবাবু কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন, 'এই ভাল্লুকটি আমার ছেলে-মেয়ের প্রাণরক্ষা করেছে। একে আমি যত্ন করে বাড়ীতে রেখে দেব।'

নবীনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব! এই ভাল্লুকটি হচ্ছে সরকারের সম্পত্তি। ওকে আবার যেতে হবে চিড়িয়াখানায়।'

হায় ভাল্লু! হায় রে হিমাচলের স্বপ্ন!



জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী

কলম নিয়ে বসেছিলুম বর্তমানের ছবি আঁকতে। কিন্তু কাগজে কালির আঁচড় পড়বার আগেই দেখি, মনের পটে স্মৃতিদেবী নতুন করে আঁকতে স্বুরু করে দিয়েছেন একখানি পুরাতন ছবি। তবে পুরাতন হলেও সে ছবি চিরনূতন।

ব্যক্তিত্বের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, মনুষ্যবিশেষের স্বাতন্ত্র্য। এক-একখানি বাড়ীর ভিতরেও থাকে এমনি বিশেষ বিশেষ স্বাতন্ত্র্য। শহরে দেখতে পাওয়া যায় হাজার হাজার বাড়ী এবং তাদের প্রত্যেকেরই ভিতরে থাকে কিছু না কিছু পার্থক্য। এই পার্থক্য এতই সাধারণ যে, তার মধ্যে বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা যায় না।

কিন্তু এক-একখানি বাড়ী অসাধারণ হয়ে ওঠে এক-একজন মহামনা মহামানুষকে অঙ্কে ধারণ করে। সেই মনস্বীদের ব্যক্তিত্বের স্মৃতি বহন করে ইঁট-কাঠ-পাথর দিয়ে গড়া বাড়ীগুলিও হয় স্বাতন্ত্র্যে অনন্যসাধারণ। হয় যদি তা পর্ণকুটীর, সবাই রাজপ্রসাদ ফেলে তাকে দেখতে ছোটে বিপুল আগ্রহে। এই জন্যেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী, বেলুড় মঠ এবং মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির বাসভবন আকৃষ্ট করে বৃহতী জনতাকে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী।

উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমে তিনটি সংকীর্ণ, নোংরা গলি এবং পূর্বদিকে একটি গণ্ডগোল-ভরা বাজার। এরই মাঝখানে অভিজাত পল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী নিজের জন্যে রচনা করে নিয়েছে অপূর্ব এক স্বাতন্ত্র্য, বিচিত্র এক প্রতিবেশ। আজ তার নূতন গৌরব করবার কিছুই নেই, কিন্তু তার প্রভূত পূর্বগৌরব তাকে এমন গরীয়ান, এমন অতুলনীয় করে রেখেছে যে, এখনো তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মন হয়ে ওঠে শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। সে হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির প্রতীক, সে হচ্ছে সমগ্র দেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকগণের প্রধান তীর্থ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের ধর্মে, আমাদের সমাজে, আমাদের জাতীয় জীবনে যাঁরা নূতন রূপ ও নূতন আদর্শ এনেছেন, ঐখানেই তাঁরা প্রথম পৃথিবীর আলোক দেখেছেন, ঐখানেই তাঁরা লালিত-পালিত হয়েছেন এবং ঐখানেই তাঁরা ঢুনিয়ার পাট তুলে দিয়ে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ঐ বাড়ীর ঘরে ঘরে দিকে দিকে ছড়ানো আছে অসাধারণ মানুষদের পদরেণু।

এইজন্যে বিদেশীরাও কলকাতায় এলে ঠাকুরবাড়ীতে আসবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারতেন না। কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, চিত্রকলার ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করেছেন ঠাকুরবাড়ীর যতগুলি সন্তান, বাংলাদেশে আর কোন পরিবারে তা দেখা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও সুনয়নী দেবী এবং

এখনকার উদীয়মানদের মধ্যে সুভো ঠাকুর। যাঁরা ভিতরকার খবর রাখেন তাঁরাই জানেন, ঠাকুর পরিবারভুক্ত প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই মধ্যে আছে সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি সুগভীর অনুরাগ। তাঁরা ইচ্ছা করলেই লেখক বা শিল্পী হতে পারতেন, কিন্তু যে কারণেই হোক তাঁদের সে ইচ্ছা হয়নি।

নতুন বাংলার সঙ্গীতও জন্মলাভ করেছে ঠাকুরবাড়ীর মধ্যেই। বাঙালী হচ্ছে কাব্যপ্রিয় ভাবুক জাতি। গানে সুরের ঐশ্বর্যের সঙ্গে সে লাভ করতে চায় কথার সৌন্দর্যও। কথাকে নামমাত্র সার করে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা যখন সুর ও তালের 'ব্যাকরণ' নিয়ে তাল-ঠোকাঠুকি করছে, বাংলাদেশের লোকসাধারণ তখন একান্ত প্রাণে উপভোগ করছে রামপ্রসাদের গীতাবলী, বাউল-সঙ্গীত ও কীর্তনে বৈষ্ণব-পদাবলী প্রভৃতি। যেসব গান সুরের সাহায্যে কথার ভাবকেই মর্যাদা দিতে চায়, আমাদের কাছে তাদেরই আদর বেশী। বাংলাদেশের মেঠো বা ভাটিয়ালী গানও কাব্যরসে বঞ্চিত নয়। নব্য বাংলার বিদ্বজ্জনদের চিত্ত পশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে ভিন্নভাবাপন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁদের মনের ভিতরেও স্বাভাবিক নিয়মেই থাকে খাঁটি বাঙালীর সহজাত সংস্কার। তাঁদের বৈঠকখানায় বা ড্রয়িংরুমে বাংলার সেকেলে গানগুলি প্রবেশ করবার পথ খুঁজে পেত না, কিন্তু ওস্তাদী তানা-না-নাও সহ্য করতে তাঁরা ছিলেন নিতান্ত নারাজ। এই দোটানার মধ্যে দুই কূল রাখবার ব্যবস্থা করলেন ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতাচার্য। আধুনিক যুগের উপযোগী উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর কাব্যকথাকে ফুটিয়ে তোলা হতে লাগল এমন সব সুরের সংমিশ্রণে, যার মধ্যে আছে একাধারে মার্গসঙ্গীত, বাউল-সঙ্গীত, কীর্তন-সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের বিশেষত্ব। এই নতুন পদ্ধতিতে গায়ক কোথাও কথার গতিরোধ করে অযথা দীর্ঘ তান ছাড়বার সুযোগ পান না এবং কবিও কোথাও সুরকে অবহেলা না করে তার সাহায্যেই কথার ভাবকে উচিতমত প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। আজ সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গিয়েছে এই নূতন পদ্ধতির বাংলা

গান এবং এ গান উপভোগ করতে পারেন উচ্চশিক্ষিতদের সঙ্গে অল্পশিক্ষিত শ্রোতারাও।

সাহিত্যকলা, চিত্রকলা ও সঙ্গীতকলার পরে আসে নাট্যকলার কথা। এ ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অগ্রনায়কদের সঙ্গে দেখি ঠাকুর-বাড়ীর গুণিগণকে। যে কয়েকটি সৌখীন বাংলা রঙ্গালয়ের আদর্শে এদেশে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীর রঙ্গালয় হচ্ছে তাদের মধ্যে অন্যতম। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ছিলেন তার প্রধান কর্মী। তারপরেও ঠাকুরবাড়ীর সন্তানদের মধ্যে নাট্যকলার ধারা ছিল সমান অব্যাহত। অভিনেতারূপে দেখা দেন রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আরো অনেকেই। মধ্য যৌবন থেকেই দেখছি, ঠাকুরবাড়ী থেকে প্রায় প্রতি বৎসরেই এক বা একাধিক নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে আসছে। আজ রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ পরলোকে। কিন্তু আজও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ীর ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন; প্রায়ই এখানে-ওখানে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। নাট্যজগতেও ঠাকুর পরিবারের তুলনা নেই।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা। আমার বোধহয়, কলকাতা শহরে সর্বপ্রথমে মহিলা নিয়ে অভিনয়ের প্রথা প্রবর্তিত হয় ঠাকুর-বাড়ীর রঙ্গমঞ্চেই। অভিনেয় নাটিকা ছিল 'বাল্মীকি প্রতিভা'।

নৃত্য যে একটি নির্দোষ আর্ট এবং শিক্ষিত ও ভদ্র পুরুষ আর মহিলারা যে অম্লানবদনে নাচের আসরে যোগ দিতে পারেন, বাংলা-দেশে এ বাণী অসঙ্কোচে প্রথম প্রচার করেন ঠাকুরবাড়ীর রবীন্দ্র-নাথই। তিনি কেবল প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, নিজে হাতে ধরে ছেলেমেয়েদের নামিয়েছিলেন নাচের আসরে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নৃত্যকলা জাতে উঠল তাঁর হাতের পবিত্র স্পর্শে।

অলিগলির দ্বারা পরিবেষ্টিত বটে জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুরবাড়ী,

কিন্তু তার ফটক পার হলেই সংকীর্ণতার কোন চিহ্নই আর নজরে পড়ে না। সামনেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তারপর ত্রিতল অট্টালিকার ভিতরেও আর একটি বড় অঙ্গন। বামদিকে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা-ভবন, তারও পশ্চিম দিকে আবার খানিকটা খোলা জমি। ডানদিকে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথদের মস্ত বাড়ী, তার দক্ষিণে একটি নাতিবৃহৎ উদ্যানে ফুলগাছের চারা ও বড় বড় গাছের ভিড়। ধূলিমলিন অলিগলির ইঁট-কাঠের শুষ্কতার মাঝখানে একখানি জীবন্ত নিসর্গচিত্র—তৃণহরিৎ ক্ষেত্র, ফুলগাছের কেয়ারি, শ্যামলতার মর্মর সঙ্গীত। দখিনা বাতাস বয়, কুঁড়ি ফোটার খবর আসে, জেগে ওঠে গানের পাখিরা।

ঠাকুরবাড়ী আজও জোড়াসাঁকোয় দাঁড়িয়ে অতীতের স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু সে বাগান আর নেই। মরু-মুল্লুকের মারোয়াড়ী এসে তার বে-দরদী হাত দিয়ে লুপ্ত করেছে সেই ধ্বনিময়, গন্ধময়, বর্ণময় স্বপ্ননীড়খানি। আর নেই সেই ফুল-ঝরা ঘাসের বিছানা, সবুজের মর্মর-ভাষা, গীতকারী বিহঙ্গদের আত্মনিবেদন।

মাইকেলের রাবণ বলেছিল, 'কুসুমিত নাট্যশালাসম ছিল মম পুরী।' আগে ঠাকুরবাড়ীও ছিল তাই। কখনো পুরাতন বাড়ীর ভিতরে, কখনো রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রাভবনে, কখনো অবনীন্দ্রনাথদের মহলে বসত অভিনয়ের বা গানের বা নাচের বা কাব্যপাঠের আসর। বাংলার শিক্ষিত সমাজে নৃত্যকলা যখন অভিনন্দিত হয়নি, ঠাকুর-বাড়ীতে এসে তখনও নাচ দেখিয়ে গিয়েছেন জাপানের সেরা নর্তকী তেঙ্কোয়া এবং স্বর্গীয় শিল্পী যতীন্দ্রনাথ বসু। 'ফাল্গুনী' নাট্যাভিনয়েও আমাদের সামনে এসে নৃত্যচঞ্চল মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অন্ধ বাউলের ভূমিকায়।

কলকাতায় গানের মালা গেঁথে রবীন্দ্রনাথ ঋতু-উৎসবও সুরু করেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতেই। বিচিত্রাভবনের পশ্চিমদিকে খোলা জমির উপরে বৃহৎ পটমণ্ডপ বেঁধে আসরে বহু শ্রোতার জন্যে স্থান সংকুলান করা হয়েছিল। বহু গায়ক, গায়িকা ও যন্ত্রী

সেই উৎসবে যোগদান করেছিলেন। সেটা বর্ষা কি বসন্ত ঋতুর পালা, তা আর স্মরণ হচ্ছে না, তবে জলসা যে রীতিমত জমে উঠেছিল, এ কথা বেশ মনে আছে। ঋতুর জন্যে এমন দল বেঁধে ঘটা করে পার্বণের আয়োজন, এদেশে এটা ছিল তখন অভিনব ব্যাপার। কেবল দোলযাত্রায় এখানে রং ছুঁড়ে হৈ হৈ করে হোলীর গান গেয়ে মাতামাতি হুড়োহুড়ি করা হয় বটে। কিন্তু সে হচ্ছে নিতান্ত প্রাকৃত-জনদের উৎসব, ললিতকলাপ্রিয় শিক্ষিতদের প্রাণ তাতে সাড়া দেয় না।

নাচ-গান-অভিনয় বা কাব্যপাঠের আসর না বসলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অভাব হত না। তখন বসত গল্প ও সংলাপের বৈঠক এবং সেখানে এসে সমবেত হতেন বাংলাদেশের বিদ্বজ্জনসমাজের বাছা-বাছা বিখ্যাত ব্যক্তিগণ, তাঁদের নামের সুদীর্ঘ ফর্দ এখানে দাখিল করা অসম্ভব। এমনি সব বৈঠকের আয়োজন করা ঠাকুর-বাড়ীর চিরদিনের বিশেষত্ব। আমরা যখন ভূমিষ্ঠ হইনি, তখনও ঠাকুরবাড়ীর বৈঠকের শোভাবর্ধন করে যেতেন দেশের যত পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে সুরু করে প্রায় প্রত্যেক জ্ঞানী ও গুণী বাঙালী এখানে এসে ওঠা-বসা করে গিয়েছেন— ঠাকুরদের এই প্রাচীন বাসভবনকে যে Historic বা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাড়ী বলে গণ্য করা যায় সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সারা কলকাতা শহরে এর চেয়ে গরিমাময় বাড়ী নেই আর একখানিও।

তখনকার সেই আনন্দসম্মিলনের দিনে প্রায়ই আমরা অবনীন্দ্র-নাথের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতুম। কখনো তাঁকে পেতুম দোতালার সুপ্রশস্ত বৈঠকখানায়, কখনো বা পেতুম দক্ষিণের সুদীর্ঘ বারান্দা বা দরদালানে। সেখানকার ছবি মনের ভিতরে খুব স্পষ্ট। প্রায়ই গিয়ে দেখতুম, বাগানের দিকে মুখ করে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তিন সহোদর বসে আছেন তিনখানি আরাম-আসনে। গগনেন্দ্রনাথ হয়তো কোন বিলাতি পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন, সমরেন্দ্রনাথ হয়তো কোন নাতি কি নাতনীকে আদর

করছেন এবং অবনীন্দ্রনাথ পটের উপরে তুলিকা চালনায় নিযুক্ত। তারপর ছবি আঁকতে আঁকতেই আমাদের সঙ্গে আলাপ করতেন। একবার চোখ তুলে কথা বলেন, আবার চোখ নামিয়ে পটের ওপরে বুলিয়ে যান তুলি। আলাপের সঙ্গে কলার কাজ।

ভেঙে গিয়েছে আজ ঠাকুরবাড়ীর সকল আনন্দের হাট। বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে বলে সে বাড়ীর ভিতরে আর প্রবেশ করি না। ঠাকুরবাড়ী আজ নিরালা, নিস্তব্ধ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেবল তুলি ধরে ছবি আঁকা নয়, কলম ধরেও ছবি আঁকা। এটি হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথেরই শিল্পীমনের বিশেষত্ব। শব্দচিত্রাঙ্কনে তার এই চমৎকার নৈপুণ্যের দিকে সমালোচকদের মধ্যে সর্বপ্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বোধহয় 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। লেখকরূপে ও চিত্রকররূপে অবনীন্দ্রনাথ একই কর্তব্য পালন করেন। ছবিকার হয়েও তিনি যেমন লেখাকে ভুলতে পারেননি, লেখক হয়েও তেমনি ভুলতে পারেননি ছবিকে। পৃথিবীর আরো কোন কোন বড় চিত্রকর লেখনী ধারণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কারুর রচনায় এ বিশেষত্বটি লক্ষ্য করিনি।

লেখকরূপে ও চিত্রকররূপে অবনীন্দ্রনাথকে জেনেছি বাল্যকাল থেকেই। সে সময়ে এদেশে উচ্চশ্রেণীর বাল্যপাঠ্য পুস্তকের অভাব ছিল অত্যন্ত। বয়স্ক লিখিয়েরা মাথা ঘামাতেন কেবল বয়স্ক পড়ুয়াদের জন্যেই, কিংবা শিশুদের জন্যে বড় জোর লিখতেন পাঠশালার কেতাব। শিশুদের চিত্তরঞ্জন করবার ভার নিতেন ঠাকুমা-দিদিমার দল। কিন্তু শিশুরা যখন কৈশোরে গিয়ে উপস্থিত হত, তখন বয়সগুণে অধিকতর বেড়ে উঠত তাদের মনের ক্ষুধা, অথচ

তারা খোরাক সংগ্রহ করবার সুযোগ পেত না। সে বয়সে তাদের মনের উপরে রেখাপাত করতে পারত না শিশুভুলানো ছড়া ও রূপকথা। এই অভাব মোচন করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথও গোড়া থেকেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল'ও রূপকথা বটে, কিন্তু যে উচ্চশ্রেণীর লিপিকুশলতার গুণে রূপকথাও একসঙ্গে নাবালক ও সাবালকদের উপযোগী হয়ে ওঠে, ওর মধ্যে আছে সেই বিশেষ গুণটি। সেইজন্যে কিশোর বয়সে তা পাঠ করে মুগ্ধ হতুম আমরা। তারপর তিনি বলতে সুরু করলেন 'রাজকাহিনী'। কাহিনীগুলি প্রকাশিত হত বড়দের পত্রিকা 'ভারতী'তে, কিন্তু ছোটরাও তা সাগ্রহে পাঠ করত এবং পড়ে আনন্দলাভ করত বড়দেরও চেয়ে বেশী। সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে আকৃষ্ট করেছিল এই 'রাজকাহিনী'রই শব্দচিত্রগুলি। অবনীন্দ্রনাথের 'ভূতপত্রীর দেশে'ও যেখানে সেখানে পাওয়া যাবে অপূর্ব শব্দচিত্র, সেগুলি ভুলিয়ে দেয় ছেলে-বুড়ো সবাইকেই।

অবনীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার বিস্তৃত সমালোচনা করবার জায়গা এখানে নেই। লিখেছেন তিনি অনেক: গল্প, কাহিনী, নক্সা, হাস্যনাট্য, ছড়া এবং প্রবন্ধ প্রভৃতি। প্রত্যেক বিভাগেই আছে তাঁর বিশিষ্ট হাতের বিশদ ছাপ। তাঁর নাম না বলে তাঁর যে কোন রচনা অন্যান্য লেখকদের রচনাস্তূপের মধ্যে স্থাপন করলেও তাকে খুঁজে বার করা যেতে পারে অতিশয় অনায়াসেই,—এমনি স্বকীয় তাঁর রচনাভঙ্গি। সে ভঙ্গি অননুকরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাভঙ্গি অনুকরণ করে অনেকে অল্পবিস্তর সার্থকতা লাভ করেছেন, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের লিখন-পদ্ধতির নকল করবার সাহস কারুর হবে বলে মনে হয় না।

ছেলেবেলায় 'সাধনা' পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রতিলিপি দেখি সর্বপ্রথমে। ছবিগুলি মুদ্রিত হত শিলাক্ষরে (লিথোগ্রাফ)। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং তাই অবলম্বন করে ছবি। আমাদের খুব ভালো লাগত। কিন্তু তাদের ভিতরে পরবর্তী যুগের

অবনীন্দ্রনাথের সুপরিচিত চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি কেউ আবিষ্কার করতে পারবেন না। প্রথম জীবনে তিনি য়ুরোপীয় পদ্ধতিতেই চিত্রাঙ্কন করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং শিক্ষা পেয়েছিলেন ইতালীয় শিল্পী গিলহার্ডি ও ইংরেজ শিল্পী পামারের কাছে। অবনীন্দ্রনাথের তখনকার আঁকা ছবি তাঁর বাড়ীতে এখনো রক্ষিত আছে।

প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুস্তকাগারে একখানি পুঁথির মধ্যে মোগল যুগের ছবি দেখে হঠাৎ তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন, তাঁর চোখ ফিরে আসে বিদেশ থেকে স্বদেশের দিকে। কিছুদিন ধরে চলে ভারতীয় শিল্পসম্পদ নিয়ে নাড়াচাড়া। প্রাচ্য চিত্রকলা পদ্ধতিতে 'কৃষ্ণলীলা' অবলম্বন করে এঁকে ফেললেন কয়েকখানি ছবি। সেগুলি দেখে শিক্ষক পামার চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে, আর তোমাকে কিছু শেখাবার নেই।' অবনীন্দ্রনাথ নিজের পথ নিজেই কেটে নিলেন। ভারত-শিল্পের নবজন্মের সূচনা হল।

তারপর কেমন করে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা-প্রসাদাৎ নবযুগের ভারত-শিল্প বাংলাদেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে বিশাল ভারতবর্ষে আপন বিজয় পতাকা উত্তোলন করে, তা নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না, কারণ অবনীন্দ্রনাথের জীবনী বা ভারত-শিল্পের ইতিহাস রচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবেই তাঁকে দেখতে ও দেখাতে চেষ্টা করব।

সাল-তারিখ মনে নেই, তবে কলকাতার সরকারী চিত্র-বিদ্যালয়ে তখনও প্রাচ্য চিত্রকলা শেখাবার ব্যবস্থা হয়নি এবং তার সঙ্গে তখনও সংযুক্ত ছিল একটি আর্ট-গ্যালারি। সে সময়ে শ্রেষ্ঠ চিত্র বলতে আমরা বুঝতুম য়ুরোপীয় চিত্রই। ঐ আর্ট-গ্যালারির মধ্যে য়ুরোপীয় শিল্পীদের আঁকা অনেক ছবি সাজানো ছিল—এমন কি রাফাএলের পর্যন্ত (যদিও তা মূল ছবি নয়)। একদিন সেখানে ছবি দেখতে গিয়েছি। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর সেই অসংখ্য বিলাতী ছবির ভিড়ের মধ্যে আচম্বিতে এক কোণে আবিষ্কার করলুম

জলীয় রঙে আঁকা কয়েকখানি অভাবিত ছবি। সেগুলি হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা মেঘদূত চিত্রাবলী। এক সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল আমার চোখ আর মন। প্রত্যেকখানি ছবি আকারে একরত্তি, সেখানে রক্ষিত ঢাউস ঢাউস বিলাতী ছবি ছেড়ে লোকের চোখ হয়তো তাদের দিকে ফিরতেই চাইত না, কারণ তারা কেবল আকারেই এতটুকু নয়, তাদের মধ্যে ছিল না পাশ্চাত্ত্য বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্যের বাহুল্যও। তবু কিন্তু তাদের দেখে আমি একেবারে অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার সামনে খুলে গেল যেন এক অজানা সৌন্দর্যলোকের বন্ধ দরজা। মন সবিস্ময়ে বলে উঠল, যে অচিন সুন্দরকে দেখবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এখানে আসিনি, অকস্মাৎ সে নিজেই এসে আমার কাছে ধরা দিল।

আজকের দর্শকরা হয়তো ঐ ছবিগুলি দেখে আমার মতন অত বেশী অভিভূত হবেন না। কারণ বহুকাল ধরে অসংখ্য দেশী ছবি নিয়ে অনুশীলন করে চক্ষু তাঁদের অনেকটা শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি তখন ছিলুম সম্পূর্ণরূপে বিলাতী ছবি দেখতেই অভ্যস্ত, এমন কি য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্রবিদ্যা শেখবার জন্যে সরকারী আর্ট স্কুলে ছাত্ররূপে যোগদানও করেছি। কাজেই ছবিগুলি আমার কাছে এনে দিলে নূতন আবিষ্কারের বার্তা। সেইদিন থেঁকেই আমি হয়ে পড়লুম অবনীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত।

মানুষটিকে চোখে দেখবার সাধ হল এবং সুযোগও মিলল অনতিবিলম্বেই। খবর পেলাম, অবনীন্দ্রনাথদের ভবনে শিল্প-সম্পর্কীয় এক সভার অধিবেশন হবে। যথাসময়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। অবনীন্দ্রনাথকে দেখলুম। শান্ত, মিষ্ট মুখ। সহজ সরল ভাব, কোনরকম ভঙ্গি নেই। ভালো লাগল মানুষটিকে।

সভায় বউবাজার চিত্র-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (তাঁর নাম কি মন্মথবাবু ?) বক্তৃতা দিতে উঠে অবনীন্দ্রনাথের গুণগ্রামের পরিচয় দিলেন। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীও (ইউ. রায়) দু-চার কথা বললেন। শুনলুম ওঁরা একটি শিল্প-সম্পর্কীয় ।তষ্ঠান গঠন করতে চান এবং

রবীন্দ্রনাথ তার নামকরণ করেছেন 'কলা-সংসদ'। কিন্তু তারপর কি হয়েছিল জানি না, তবে 'কলা-সংসদ' সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য শুনতে পাইনি।

তারপর কিছুদিন যায়। 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল অবনীন্দ্রনাথের ছবির পর ছবি। অনেককে তারা করলে আনন্দিত। এবং অনেককে আবার করে তুললে দস্তুরমত ক্রুদ্ধ; বিলাতী শিক্ষাগুণে তাঁরা এমন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, ঘরের ছেলে হয়েও ঘরোয়া রূপের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারলেন না। যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অবনীন্দ্রনাথের রচনার শব্দচিত্রগুলি দেখে প্রশংসা করেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের আঁকা প্রত্যেক চিত্রই যেন তাঁর চোখের বালি হয়ে উঠল। তিনি প্রথমশ্রেণীর চিত্র-সমালোচক (যা তিনি ছিলেন না) সেজে বারংবার উষ্মা প্রকাশ ও ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। গালিগালাজ যাদের পেশার মত, এমন আরো বহু ব্যক্তি যোগদান করলে সুরেশচন্দ্রের দলে। বাজার হয়ে উঠল সরগরম।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন 'যোগাসনে লীন যোগীবরে'র মত— নিন্দা-প্রশংসায় সমান অটল। ঐ সব আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর মুখে ছিল না কোন প্রতিবাদ। তরঙ্গের ধারাবাহিক প্রহার চিরদিনই নিশ্চল ও নিস্তব্ধ হয়ে সহ্য করতে পারে সাগরশৈল। তিনি আত্মগত হয়ে বাস করতে লাগলেন নিজের পরিকল্পনার জগতে। দিনে দিনে নব নব রূপ সৃষ্টি করে ভরিয়ে তুলতে লাগলেন রসজ্ঞ বিদ্বজ্জনদের চিত্ত।

মাঝে মাঝে তুলি ছেড়ে কলম ধরেন, যাদের অনুসন্ধিৎসু মন জানতে চায়, বুঝতে চায়, তাদের জানাতে এবং বোঝাতে ললিতকলার আদর্শ ও গুপ্তকথা। তাঁর সেই প্রবন্ধগুলিও প্রাচ্য চিত্রকলার রহস্যোদ্ঘাটনের পক্ষে অল্প সাহায্য করেনি। গঠন করলেন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টস নামে একটি প্রতিষ্ঠান। সেখানে দেশীয় চিত্র সম্বন্ধে লোকসাধারণের চিত্তকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে বাৎসরিক ছবির মেলা বসাবার ব্যবস্থা করা হল।

ওদিকে গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের আসরে আসীন হয়ে তিনি তৈরি করে তুলতে লাগলেন দলে দলে নূতন শিল্পী। ফল যা হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বাংলার জমিতে যে বাক্য-বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন, তা কোন ফলই প্রসব করতে পারেনি। জয় হয়েছে অবনীন্দ্রনাথেরই।

অবনীন্দ্রনাথের বিজয়গৌরব কেবল ভারতে নয়, স্বীকৃত হয়েছে ভারতের বাইরেও। কিন্তু যেখানে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধে এবং পরস্পর-বিরোধী আদর্শ দুটি সমান্তরাল রেখার মত থেকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে নারাজ হয়, সেখানে অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর শিল্পীর প্রভাব দেখা গিয়েছে। একদল কলকাতা চিত্র-বিদ্যালয়ের অনুগামী, আর একদল হচ্ছে বোম্বাই আর্ট স্কুলে শিক্ষিত। হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে আসবার আগে কলকাতার সরকারী চিত্র-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে রকম শিক্ষালাভ করে বেরিয়ে আসত, বোম্বাইয়ের শিল্পীদের দৌড় তার চেয়ে বেশী ছিল না। তাঁদের আর্ট পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চেষ্টা করত (এবং এখনো করছে) ভারতবর্ষকে প্রকাশ করতে। এই বর্ণসঙ্কর বা দোআঁশলা আর্ট সৃষ্টি করতে পারে বড় জোর রবি বর্মা বা ধুরন্ধরের মত শিল্পীকে। রবি বর্মার ছবিতে যে মানুষগুলি দেখা যায়, তাদের প্রত্যেকেরই ভাবভঙ্গি দস্তুরমত থিয়েটারি। তাঁর 'গঙ্গাবতরণ' নামে জনপ্রিয় চিত্রে হিন্দুদের পৌরাণিক দেবতা মহাদেবের যে ভঙ্গিবিশিষ্ট মূর্তি দেখি, সাজ-পোশাক পরিবর্তন করতে পারলে অনায়াসে তিনি বিলাতী সাহেবে পরিণত হতে পারেন। আগে একাধিক বাঙালী শিল্পীও এই শ্রেণীর ছবি এঁকেছেন, তাদের কিছু কিছু নমুনা আজও বাজারে দুর্লভ নয়।

কিন্তু হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার পদ্ধতি যখন বাঙলার বাইরেও সাগ্রহে অবলম্বিত হতে লাগল এবং নন্দলাল বসু প্রমুখ অসাধারণ শিল্পীর প্রভাব যখন সর্বত্র ছড়িয়ে

পড়তে লাগল, বোম্বাইয়ের শিল্পীদের অবস্থা হয়ে পড়ল তখন নিতান্ত অসহায়ের মত। বোম্বাই স্কুল অফ আর্টের ভূতপূর্ব পরিচালক গ্লাডস্টোন সলোমন বাংলা পদ্ধতির সেই অগ্রগতি সহ্য করতে পারেননি। প্রায় উনিশ বৎসর আগে 'Essays on Mogul Art' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি হ্যাভেল সাহেব, অবনীন্দ্রনাথ ও বাংলার পদ্ধতির বিরুদ্ধে করেছিলেন প্রভূত বিষোদ্গার। তবু বাতাসের গতি ফিরল না দেখে অল্পকাল আগেও আবার তিনি তর্জন-গর্জন (বা অরণ্যে রোদন) করতে ছাড়েননি। কিন্তু বৃথা এসব চেষ্টা। যে ঘুমিয়ে পড়েছে তাকে জোর করে আবার জাগানো যায়, কিন্তু যে জেগে উঠেছে তাকে জোর করে আবার ঘুম পাড়ানো সম্ভবপর নয়।

এখন অবনীন্দ্রনাথের জীবনের সন্ধ্যাকাল। দিনের কাজ তাঁর ফুরিয়ে গিয়েছে, বেলা-শেষের কর্মশ্রান্ত বিহঙ্গের মত বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে তিনি ফিরে এসেছেন নিজের নীড়ে। একান্তে বসে স্বপ্ন দেখেন,—গত জীবনের সার্থক স্বপ্ন। তাঁর পায়ের তলায় গিয়ে বসলে আমাদেরও মনে আবার জেগে ওঠে অতীতের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া কত দিনের স্মৃতি, কত আনন্দময় মুহূর্ত, কত বিচিত্র রসালাপ।

মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

প্রসিদ্ধ লেখক ও 'ভারতী'-সম্পাদক স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের মধ্যম জামাতা। তাঁর মুখে শুনেছি, গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টসের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব একবার কি কারণে অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'তুমি বড় সেন্টিমেণ্টাল।'

অবনীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি আর্টিষ্ট, সেন্টিমেণ্ট নিয়েই আমার কারবার। আমাকে তো সেন্টিমেণ্টাল হতেই হবে।'

এই সেন্টিমেণ্টালিটি বা ভাবপ্রবণতাই অবনীন্দ্রনাথকে চিরদিন

চালিত করেছে ললিতকলার নানা দিকে, নানা ক্ষেত্রে। যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি, তাঁর কথা শুনেছি, তখনই উপলব্ধি করেছি, তাঁর মন সর্বদাই আনাগোনা করতে চায় ভাব থেকে ভাবান্তরে, রূপ থেকে রূপান্তরে। অলসভাবে বসে বসে দিবাস্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকা, এ হচ্ছে তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সর্বদাই তিনি কোন না কোন রূপ-সৃষ্টির কাজ নিয়ে নিযুক্ত হয়ে থাকতে ভালোবাসেন। নিরালায় একলা বসে ছবি তো আঁকেনই, এমন কি যখন বাইরেকার আর পাঁচজন এসে তাঁকে ঘিরে বসেন তখনও তাঁর কাজে কামাই নেই, গল্প করতে করতেই পটের উপরে এঁকে যান রেখার পর রেখা। যখন ছবির পাট তুলে দেন তখন নিয়ে বসেন কাগজ ও কলম। খাতার উপরে ঝরে পড়ে রঙের বদলে সাহিত্যরসের ধারা। তারপর খাতা মুড়লেও কাজ বন্ধ হয় না। ছোট ছোট ভাস্কর্যের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকেন। তারও উপরে আছে অন্যরকম কাজ বা শিল্পীসুলভ খেলা। বাগানে বেড়াতে বেড়াতেও দৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য করে, প্রকৃতি দেবী সেখানে নিজের হাতে তৈরি করে রেখেছেন কত সব মূর্তি বা বস্তু। হয়তো এক টুক্রো শুকনো ডাল বা পালাকে দেখাচ্ছে ঠিক ডিঙার মত। অমনি সেটি সংগ্রহ করা হল এবং আর একটি গাছ থেকে সংগৃহীত হল মানুষের মত দেখতে একটি পালা। অমনি অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় তারা পরিণত হল অপূর্ব একটি প্রাকৃতিক ভাস্কর্য-কার্যে। যেন রূপকথায় বর্ণিত নদ-নদীর মধ্যে জলযাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে ছোট্ট একখানি তরণী ও তার কর্ণধার। এ তাঁর হেলাফেলার খেলা নয়, এ শ্রেণীর অনেক কাজ তাঁর সংগ্রহশালায় সাদরে সুরক্ষিত হয়েছে। তিনি এর কি একটি নাম দিয়েছিলেন বলে স্মরণ হচ্ছে—বোধহয় 'কাটুম-কুটুম খেলা।'

বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।' অবনীন্দ্রনাথও ঐ দলের মানুষ। রূপ আর রূপ—তিনি সারক্ষণই সমাহিত হয়ে আছেন আপন রূপলোকে। মনে মনে সর্বদা এঁকে যান ছবি আর ছবি—সেসব ছবি হয়তো

কোনদিন পটেও উঠবে না, কলমেও ফুটবে না, তবু পরিপূর্ণ হয়ে থাকে তাঁর মানস-চিত্রশালা।

চার-পাঁচ বৎসর আগে একদিন অবনীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছি। কথাবার্তা কইতে কইতে হঠাৎ বললুম, 'একটুখানি লেখা দিন।'

তিনি বললেন, 'কাগজ-কলম নিয়ে বোসো। আমি বলি, তুমি লিখে নাও।'

তারপর এক সেকেণ্ডও চিন্তা না করেই এবং একবারও না থেমে তিনি মুখে মুখে যে শব্দচিত্রখানি রচনা করলেন, এখানে তা তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলুম না :

'ময়না বললে দাদামশা ছবি আঁকবো, বেশ কথা—সবাই ঐ কথাই বলে : ছবি যে আঁকে সেই জানে ছবি আঁকা সহজ নয়, কিন্তু যারা দেখে তারা ভাবে এ তো বেশ সহজ কাজ! ঐ হল মজা ছবি লেখার।

ময়না রং তুলি নিয়ে আঁকতে বসলো হিজিবিজি কাগের ছা—

আমি সেই হিজিবিজি থেকে কখনো কাগের ছা, কখনো বগের ছা বানিয়ে দিই, আর ছবি আঁকার প্রথম পাঠ দি ময়নাকে, যথা—

হিজিবিজি কাগের ছা
লিখে চল যা তা
লিখতে লিখতে পাকলে হাত
লেখার হবে ধারাপাত—

সেই সময় ধারা দিয়ে বৃষ্টি নামে, লেখা মুছে যায় জলের ছাটে, ভাত আসে, দুপুর বাজে, পুকুরঘাটে নাইতে চলে ময়না—দুপুরের ঘুমের আগে প্রথম পাঠ শেষ কোরে।'

রচনারীতি সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব মত আছে। প্রত্যেক বিখ্যাত লেখকই নিজের জন্যে একটি বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি নির্বাচন করে নেন। ফ্রান্সের সাহিত্যগুরু ফ্লবেয়ার একটানা লিখে যেতে পারতেন না, একটিমাত্র শব্দ নির্বাচনের জন্যে কখনো কখনো তিনি কাটিয়ে দিতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা—এমন কি এক বা একাধিক দিবস।

ঔপন্যাসিক বালজাক প্রথম যে পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিতেন, তার বাক্যাংশ বা বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগ পাঠ করেও কেউ কিছু বুঝতে পারত না। পরে পরে সাত-আটবার প্রুফ দেখার এবং পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের পর তবেই তা পাঠকদের উপযোগী হয়ে উঠত।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনার পাণ্ডুলিপি দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। সেগুলির মধ্যে যথেষ্ট কাটাকুটির চিহ্ন আছে। পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হবার পরও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না, নব নব সংস্করণের সময়ে বার বার চলত তাঁর অদল-বদলের কাজ।

রচনাকার্যে নিযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও আমি দেখেছি। তিনিও অনায়াসে রচনা করতে পারতেন না। যথেষ্ট ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে তিনি লেখনী চালনা করতেন। একবার যা লিখতেন আবার তা কেটে দিয়ে নতুন করে লিখতেন দ্বিতীয়বার।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের রচনাপদ্ধতি স্বতন্ত্র। আমি যখন 'রংমশাল' পত্রিকার সম্পাদক, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁকে কিছু লেখবার জন্যে অনুরোধ করেছিলুম। সেবারেও তিনি মুখে মুখে বলে গেলেন এবং আমি লিখে নিলুম। লেখাটি সম্পূর্ণ হলে আমি তাঁকে পড়ে শোনালুম, যদি কিছু অদলবদলের দরকার হয়। কিন্তু সে দরকার আর হল না। মনে আছে, সেই দিনই তিনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'হেমেন্দ্র, প্রথমে যা মনে আসবে, তাই লিখো। তবেই লেখা হবে স্বাভাবিক।'

বিখ্যাত লেখক ও নানা সংবাদপত্রের সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলতেন, 'একটা বাক্য (sentence) খানিকটা লিখে মনের মত হল না বলে কেটে দেওয়া ঠিক নয়। সেই বাক্যটাই চটপট সম্পূর্ণ করে ফেলা উচিত, কারণ সাংবাদিকের কাজ শেষ করতে হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।'

কিন্তু এ রীতি সাংবাদিকের উপযোগী হলেও সাহিত্যিকের নয়। অবনীন্দ্রনাথের কাছে যে পদ্ধতি সহজ এবং যা অবলম্বন করে তিনি রাশি রাশি সোনা ফলাতে পারেন, অধিকাংশ সাহিত্যিকের পক্ষে তা অকেজো হয়ে পড়বার সম্ভাবনা। তবে এখানেও একটা মধ্যপন্থা আছে। মনের ভিতরে প্রথমেই যে বাক্য আসবে, মনে মনেই তা অদলবদল করে নিয়ে তারপর কাগজ-কলমের সাহায্য গ্রহণ করলে রচনায় বিশেষ কাটাকুটির দরকার হয় না।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা বলি। সে বোধ করি তেতাল্লিশ কি চুয়াল্লিশ বৎসর আগেকার কথা।

'ভারতী' পত্রিকার জন্যে রচনা করেছিলুম প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ। সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী বললেন, 'এ লেখার সঙ্গে অজন্তার তুই-একখানা ছবি দেওয়া দরকার। তুমি অবনীন্দ্রনাথের কাছে যাও, আমার নাম করলে সেখান থেকেই ছবি পাবে।'

সরাসরি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার ভরসা আমার হল না। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর অন্যতম বিখ্যাত লেখক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন আমার পরিচিত, তিনি আমাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন, মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতেও পদার্পণ করতেন। আমি তাঁকেই গিয়ে ধরলুম, অবনীন্দ্রনাথের কাছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

সুধীন্দ্রনাথের পিছনে পিছনে অবনীন্দ্রনাথদের বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলুম। দ্বারবানদের দ্বারা রক্ষিত দরজা পার হয়েই একখানি ঘর, সেখানে দেওয়ালের গায়ে হাতে আঁকা ছবি। একখানি বড় ছবির কথা মনে আছে, তাতে ছিল একটি কলাগাছের ঝাড়। দেশীয় পদ্ধতিতে আঁকা নয়। চিত্রকার অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

সামনেই প্রশস্ত সোপানশ্রেণী—সেখানেও রয়েছে বিলাতী পদ্ধতিতে আঁকা প্রকাণ্ড একখানি তৈলচিত্র—'শূদ্রকের রাজসভা',

চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবিখানি প্রভূত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

দোতালার মস্তবড় বৈঠকখানা, সাজানো গুছানো, শিল্পসম্ভারে পরিপূর্ণ। ঘরের মাঝখানে বসে আছেন অবনীন্দ্রনাথ, পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবী। তাঁর সামনে উপবিষ্ট একটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোছের লোক। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে অবনীন্দ্রনাথ একবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, তারপর আবার পণ্ডিত গোছের লোকটির দিকে ফিরে বললেন, 'লাইনগুলি একবার বলুন তো!'

তিনি বললেন, 'বৈষ্ণব কাব্যের রাধা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলছেন—

"রন্ধনশালায় যাই
তুঁয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।"

অর্থাৎ শাশুড়ী-ননদী কোন সন্দেহ করতে পারবে না, ভাববে চোখে ধোঁয়া লেগেছে বলে আমি কাঁদছি!'

অবনীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বাঃ, বেড়ে তো! "ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি!" এ লাইন নিয়ে খাঁসা একখানি ছবি আঁকা যায়।'

সুধীন্দ্রনাথ আমার পরিচয় দিলেন। আমিও আমার আগমনের উদ্দেশ্য বললুম।

তিনি বললেন, 'বেশ, অজন্তার ছবির ব্যবস্থা আমি করে দেব। আপনার ঠিকানা রেখে যান।'

সেখানেই সেদিন প্রথম মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখেছিলুম, পরে যাঁর সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছিলুম ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্ববন্ধনে।

দিন দুই পরেই একটি সাহেবের মত ফরসা যুবক আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত, হাতে তাঁর অজন্তার দুইখানি ছবির প্রতিলিপি। তাঁর নাম শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গত যুগের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পুত্র। অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে

চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করে তিনি পরে হয়েছিলেন লাহোরের সরকারি চিত্র-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

এর পর অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাধিকবার দেখা হয় গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে প্রাচ্য-চিত্রকলার প্রদর্শনীতে। সেখানে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর বড়দাদা গগনেন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে হাজির থেকে তখনকার আনাড়ী দর্শকদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন দেশী ছবির গুণের কথা। প্রাকৃতজনদের কাছে জাতীয় শিল্পকে লোকপ্রিয় করে তোলবার জন্যে সে সময়ে দেখতুম তাঁদের কি অসাধারণ প্রচেষ্টা ও আগ্রহ!

ঐ প্রদর্শনী-গৃহেই একদিন অবনীন্দ্রনাথের কাছে ভয়ে ভয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করলুম, আমিও প্রাচ্য চিত্রকলার শিক্ষার্থী হতে চাই।

খুব সম্ভব 'ভারতী' ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কোন কোন শিল্প সম্পর্কীয় রচনা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি বললেন, 'এখন আপনার মত ছাত্রই আমার দরকার—যারা একসঙ্গে তুলি আর কলম চালাতে পারবে। আঁকুন দেখি একটি পদ্মফুল।'

হঠাৎ এভাবে আঁকতে অভ্যস্ত ছিলুম না, বিশেষ তাঁর সামনে দস্তুরমত 'নার্ভাস' হয়ে গেলুম।

যে কিম্ভূতকিমাকার পদ্ম এঁকে দেখালুম, তা দেখে তিনি হতাশ হলেন না, বললেন, 'আপনার চেয়েও যারা খারাপ আঁকত, তারাও আমার হাতে এসে উৎরে গেছে। আপনার হবে।' বোধ করি সেদিনও তাঁর মত ছিল—

'হিজিবিজি কাগের ছা
লিখে চল যা তা—
লিখতে লিখতে পাকলে হাত
লেখার হবে ধারাপাত।'

কিন্তু হায় রে, ছবি আঁকায় হাত আর আমার পাকলো না। এমনভাবে পড়ে গেলুম সাহিত্যের আবর্তে, নজর দেবার অবসরই পেলুম না অন্য কোন দিকে।

অবনীন্দ্রনাথের গল্প

অবনীন্দ্রনাথ ভাবুক, কিন্তু ভারিক্কে মেজাজের মানুষ নন। এমন সব বিখ্যাত গুণী ব্যক্তি আছেন, অত্যন্ত সাবধানে তাঁদের কাছে গিয়ে বসতে হয়। এমনি তাঁরা রাশভারী যে তাঁদের সামনে মন খুলে কথা কইতেও ভরসা হয় না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ রাশভারীও নন রাশহাল্কাও নন, তিনি একেবারে সহজ মানুষ। কোন রকম ছ্যাবলামি না করেও যে-কোন প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আর পাঁচজনের সঙ্গে যোগ দিয়ে গল্পসল্প, হাসি-তামাসা বা রঙ্গভঙ্গ করতে পারেন। তাঁর সরস সংলাপ গুরুতর বিষয়কেও করে তোলে সহজ-সরল।

পরম উপভোগ্য তাঁর মজলিস। সেখানে কারুকেই মুখে চাবিতালা দিয়ে বসে থাকতে হয় না, সবাই অসঙ্কোচে বলতে পারেন তাঁদের প্রাণের কথা। অনেক জ্ঞানী ও গুণী চমৎকার বৈঠকী আলাপ করেন বটে, কিন্তু সমগ্র বৈঠকটিকে একাই এমনভাবে সমাচ্ছন্ন করে রাখেন যে, আর কেউ সেখানে মুখ খুলবার ফুরসৎ পান না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের বৈঠক Soliloquy বা আত্মভাষণের বৈঠক নয়। সেখানে সবাই তাঁর কথা শোনবার ও নিজেদের কথা শোনাবার অবসর পান। সেখানে কখনো কখনো কারুকে কারুকে মুখরতা প্রকাশ করতেও দেখেছি কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ অধীরতা প্রকাশ করেননি।

তাঁর ভাবপ্রবণ মনে মাঝে মাঝে জাগে এমন সব অদ্ভুত খেয়াল, ভারিক্কে ব্যক্তিদের কাছে যা ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়। কলকাতায় বর্ষা নামে, বিদ্যুৎ জ্বলে, বাজ হাঁকে, আকাশে মেঘের মিছিল চলে, দিকে দিকে ছায়ার মায়া দোলে, ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণের বাগানে বাদলের ঝর ঝর ধারা ঝরে, গাছপালার পাতায় পাতায়

মর্মরবাণী জাগে, বাতাসের নিঃশ্বাসে ফুলের ও সোঁদা মাটির গন্ধ ভেসে আসে, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের মনে ফোটে না বর্ষার পুরস্ত রূপখানি। বৈষ্ণব কবিদের মত তাঁরও বিশ্বাস, বর্ষার জলসার সঙ্গে দর্দুর বা ভেকের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বলেন, 'এখানে ব্যাঙ্ কই, ব্যাঙ্ না ডাকলে কি বর্ষা জমে?'

তখনই হুকুম হয়, 'যেখান থেকে পারো কতকগুলো ব্যাঙ্ ধরে নিয়ে এস।'

লোকজন ঝুলি নিয়ে ছোটে। হেদুয়া না গোলদীঘির পুকুর-পাড়ে নিরাপদে ও নির্ভাবনায় দল বেঁধে বসে যেসব দর্দুরনন্দন কাব্য বর্ণিত মকধ্বনিতে পরিপূর্ণ করে তুলছিল চতুর্দিক, হানাদাররা হঠাৎ গিয়ে পড়ে তাদের উপরে, টপাটপ করে ধরে পুরে ফেলে ঝুলির ভিতরে। তারপর ঝুলিভর্তি ব্যাঙ্ এনে ঠাকুরবাড়ীর বাগানে ছেড়ে দেয়। বাস্তুহারা হয়েও ভেকের দল ভড়কে যায় না, গ্যাঙর গ্যাঙর তানে সম্মিলিত কণ্ঠে চলতে থাকে তাদের গানের আলাপ। অবনীন্দ্রনাথের মনে বর্ষার ঠিক রূপটি ফোটে। কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে হয়তো বাড়ীর লোকের কান আর প্রাণ।

এ গল্পটি আমার কাছে বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ঠাকুরবাড়ীর প্রত্যেকেরই একটি শিষ্ট আচরণ লক্ষ্য করেছি। সর্বপ্রথম যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছি তখন তিনি ছিলেন প্রৌঢ়, আর আমি ছিলুম প্রায় বালক। কিন্তু তখনও এবং তারপরও অনেক দিন পর্যন্ত তিনি আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে পারেননি। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথও আমাকে 'বাবু' বলে সম্বোধন করতেন, এটা আমার মোটেই ভালো লাগত না। অবশেষে আমার অত্যন্ত আপত্তি দেখে অবনীন্দ্রনাথ আমাকে 'বাবু' ও 'আপনি' প্রভৃতি বলা ছেড়ে দেন। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরও আমার পিতার বয়সী হয়েও আমার সঙ্গে ব্যবহার করতেন সমবয়সী বন্ধুর মত, তবু কিন্তু তিনি আমাকে কোনদিনই 'তুমি' বলে ডাকতে পারেননি, আমি আপত্তি

করলে খালি মুখ টিপে হাসতেন। এ শ্রেণীর শিষ্টাচার দুর্লভ।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক স্বর্গীয় প্রফুল্ল সরকারকে অবনীন্দ্রনাথ একদিন অতিশয় অবাক করে দিয়েছিলেন। ১৩৩১ কি '৩২ সালের কথা। আমি তখন আনন্দবাজারের নাট্য-বিভাগের ভার গ্রহণ করেছি।

প্রফুল্লবাবু একদিন বললেন, 'হেমেন্দ্রবাবু, দোলযাত্রার জন্যে আনন্দবাজারের একটি বিশেষ সংখ্যা বেরুবে। অবনীন্দ্রনাথের একটি লেখা চাই। আপনার সঙ্গে তো তাঁর আলাপ আছে, আমাকে একদিন তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন?'

বললুম, 'বেশ তো, কাল সকালেই চলুন।'

পরদিন যথাসময়ে অবনীন্দ্রনাথের বাড়ীতে গিয়ে দেখলুম, বাগানের দিকে মুখ করে তিনি বসে আছেন একলা।

তাঁর সঙ্গে প্রফুল্লবাবুকে পরিচিত করবার জন্যে বললুম, 'ইনি দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে আসছেন।'

অবনীন্দ্রনাথ সুধোলেন, 'সে আবার কোন্ কাগজ?'

প্রফুল্লবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সবিস্ময়ে বললেন, 'আপনি আনন্দবাজারের নাম শোনেননি?'

অবনীন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'না। খবরের কাগজ আমি পড়ি না।'

প্রফুল্লবাবু দমে গিয়ে একেবারে নির্বাক।

আমি বললুম, 'আনন্দবাজারের দোল-সংখ্যার জন্যে উনি আপনার একটি লেখা চাইতে এসেছেন।'

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'বেশ, লেখা আমি দেব।'

অবনীন্দ্রনাথ মজার মানুষ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে আগে খুব ঘটা করে মাঘোৎসব হত। বিশেষ করে জমে উঠত ব্রহ্ম-সঙ্গীতের আসর। রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীত রচনা করতেন। সেই সব গান শোনবার জন্যে যাঁরা ব্রাহ্ম নন তাঁরাও সেখানে গিয়ে সৃষ্টি করতেন বিপুল জনতা। নিমন্ত্রিতদের জন্যে জলখাবারেরও ব্যবস্থা

থাকত। এখনকার ব্যবস্থার কথা জানি না। একবার আমার বড় ছেলে (এখন ফুটবল খেলার মাঠে রেফারি অলক রায় নামে সুপরিচিত) আবদার ধরলে, আমার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর মাঘোৎসব দেখতে যাবে। তাকে নিয়ে গেলুম। বাইরেকার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। আমার ছেলের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'তোমার সঙ্গে এটি কে?'

বললুম, 'আমার ছেলে।'

অবনীন্দ্রনাথ তো হেসেই অস্থির। বললেন, 'হেমেন্দ্র, তুমি আমার চোখে ধূলো দেবে ভেবেছ? ভাইকে ছেলে বলে চালিয়ে দিতে এসেছ?'

আমি যতই বলি, 'না এ সত্যিই আমার ছেলে' তিনি কিছুতেই সে-কথা মানতে রাজি হলেন না, কারণ আমার নাকি অত বড় ছেলে হতেই পারে না!

তিনি আমাকে তরুণ বয়স থেকে দেখেছেন। সেই তারুণ্যকেই তিনি মনে করে রেখেছেন, আমি যে তখন প্রৌঢ় সেটা তাঁর চোখে ধরা পড়েনি। কেবল প্রৌঢ় নই, আমি তখন ছয়টি সন্তানের পিতা।

অবনীন্দ্রনাথ কেবল তুলি ও কলমের ওস্তাদ নন, তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যও অসাধারণ। এটা নিশ্চয়ই সহজাত সংস্কারের ফল। তাঁর পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন 'বাবুবিলাস' নাটক এবং নিজের বাড়ীতেই করেছিলেন তার অভিনয়ের আয়োজন। তাঁর পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম যুগের বাংলা রঙ্গালয়ের একজন বিখ্যাত নাট্য-ধুরন্ধর। তিনি ছেলেবেলা থেকেই নিজের বাড়ীতে নাট্যোৎসব দেখে এসেছেন, সুতরাং পাদপ্রদীপের মায়ার দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই। রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ ভারিকে ভূমিকা নিয়েই রঙ্গমঞ্চে দেখা দিতেন, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন হাল্কা কৌতুকরসের ভূমিকা। তাঁর এই শ্রেণীর কয়েকটি অভিনয় আমি দেখেছি এবং মুগ্ধ হয়েছি। তিনি নিজে যেমন সহজ-সরল

মানুষ, নাট্যমঞ্চের উপরেও দেখা দিয়েছেন ঠিক সেইভাবেই, একবারও মনে হয়নি কৃত্রিম অভিনয় দেখছি।

সাধারণ রঙ্গালয়েও মাঝে মাঝে তিনি অভিনয় দেখতে গিয়েছেন। 'সীতা' নাট্যাভিনয়ে বাংলা নাট্যজগতে দৃশ্য-পরিকল্পনায় যুগান্তর এনেছিলেন তাঁরই এক শিষ্য শ্রীচারুচন্দ্র রায়। 'মিশরকুমারী' নাট্যাভিনয়ে দৃশ্য-পরিকল্পক স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়ের কাজ দেখে খুসি হয়ে তিনি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন বলে মনে হচ্ছে। আর একজন নামকরা দৃশ্য-পরিকল্পক স্বর্গীয় পটলবাবুও তাঁর কাছে উপদেশ নিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের যবনিকার সম্মুখ অংশে (Proscenium) যে কারুকার্য দেখিয়েছিলেন, সকলেই তার প্রশংসা না করে পারেনি।

আজ উদয়শঙ্করের নাম সকলের মুখে মুখে। কিন্তু প্রথম যখন তিনি কলকাতায় আসেন, দেশের কেউ তাঁর নাম জানত না এবং কোথাও তিনি আমল পাননি। সে এক যুগ গিয়েছে। পুরুষের নাচ ছিল থিয়েটারের বকাটে ছেলেদের নিজস্ব, শিক্ষিত ভদ্রঘরের ছেলে নাচবে, এটা ছিল লোকের কল্পনারও অগোচর। উদয়শঙ্কর দস্তুরমত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। শেষটা তিনি একদিন আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলেন। আমি বললুম, 'আপনি অবনীন্দ্র-নাথের কাছে যান। তিনি শিল্পী, তাঁর মন গণ্ডী মানে না। নিশ্চয় তিনি কোন পথ বাৎলে দিতে পারবেন।'

আমার পরামর্শ ব্যর্থ হয়নি। উদয়শঙ্কর নাচবে শুনে অবনীন্দ্রনাথ বিস্মিত হননি বা তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চাননি, পরম উৎসাহিত হয়ে সুধীসমাজে তাঁকে পরিচিত করবার জন্যে প্রাচ্য চিত্র কলাভবনের সুবৃহৎ হলঘরে একদিন তাঁর নাচ দেখাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই সুগম হয়ে গেল উদয়শঙ্করের পথ। বিদ্বজ্জনগণ তাঁকে দিলেন জয়মাল্য, সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়ে গেল জনসাধারণের বদ্ধ মন ও দৃষ্টি।

এক সন্ধ্যায় পুরাতন ঠাকুরবাড়ীর উঠোনে রবীন্দ্রনাথের কি

একটি নাচ-গানের আসর বসেছে, পালাটির নাম আর মনে পড়ছে না। উঠোনের দক্ষিণ দিকে রঙ্গমঞ্চ, উত্তরে ঠাকুরদালানে ওঠবার সোপানের উপরে অবনীন্দ্রনাথের পাশে বসে আছি আমি। মঞ্চের উপরে কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে নাচতে নাচতে গান গাইছে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'দেখ হেমেন্দ্র, আমাদের নাচের একটা বিষয় আমার মনে ধরে না। গানের কথায় যা যা থাকবে, নাচের ভঙ্গিতেও যে তা ফুটিয়ে তুলতে হবেই, এমন কোন বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। নাচ হচ্ছে একটা স্বতন্ত্র আর্ট, গানের কথাকে, সে নকল করবে কেন? সুরের তালের সঙ্গে নিজের ছন্দ মিলিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করতে হবে নূতন নূতন সৌন্দর্য।'

'ভারতী' পত্রিকার কার্যালয়ে বসত আমাদের একটি সাহিত্যিক বৈঠক। এই মজলিসে পদার্পণ করতেন প্রবীণ ও নবীন বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক। অবনীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে শুনিয়ে আসতেন স্বরচিত ছোট ছোট হাস্যনাট্য বা নক্সা। তাঁর পাঠ হত একসঙ্গে আবৃত্তি ও অভিনয়। লেখার ভিতরে যেখানে গান থাকত, নিজেই গুনগুন করে গেয়ে আমাদের শুনিয়ে দিতেন, গানে সুর সংযোগও করতেন নিজেই। শুনেছি কোন কোন যন্ত্রও তিনি বাজাতে পারেন।

চলমান জল দেখতে তিনি ভালোবাসতেন। পুরীতে সাগরসৈকতে একখানি বাড়ী করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'পাথারপুরী'। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে কিছুকাল কাটিয়ে আসতেন। কলকাতাতেও এক সময়ে প্রত্যহ সকালে গঙ্গাবক্ষে স্টিমারে চড়ে বেড়িয়ে আসতেন বহুদূর পর্যন্ত। সেই গঙ্গাভ্রমণ উপলক্ষ্যে তাঁর কয়েকটি চমৎকার রচনা আছে।

আমিও কলকাতার গঙ্গার ধারে বাড়ী করেছি শুনে তিনি ভারি খুসি। উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আমাকেও গঙ্গার ধারে একখানা বাড়ী দেখে দাও না।'

কিন্তু তাঁর গঙ্গার ধারে থাকা আর হয়নি। তবে এখন তিনি যেখানে বাস করছেন, সেও মনোরম ঠাঁই। নেই শহরের গণ্ডগোল,

নিরিবিলি মস্ত বাগান। গাছে গাছে বসে পাখিদের গানের সভা, দিকে দিকে নাচে সবুজ সুষমা, ফুলে ফুলে পাখনা দুলিয়ে যায় প্রজাপতিরা, সরোবরে টল টল করে রোদে সোনালী জ্যোৎস্নায় রূপালী জল। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর মত দক্ষিণ দিকে তেমনি প্রশস্ত দরদালান, আবার তিনিও সেখানে আগেকার মতই তেমনি বাগানের দিকে মুখ করে আসনে আসীন হয়ে থাকেন। কিছুদিন আগে গিয়েও দেখেছি, বসে বসে কাগজের উপরে আঁকছেন একটি ছেলেখেলার কাঠের ঘোড়া।

কিন্তু আজ ব্যাধি ও ব্যার্ধক্য তাঁর হাত করেছে অচল। একদিন আমাকে কাতর স্বরে বললেন, 'হেমেন্দ্র, বড় কষ্ট। আঁকতে চাই আঁকতে পারি না, লিখতে চাই লিখতে পারি না।' স্রষ্টা সৃষ্টি করতে পারছেন না ইচ্ছা সত্ত্বেও, মন তাঁর জাগ্রত, কিন্তু দেহ অন্তরায়, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য কল্পনা করা যায় না। পৃথিবীর জীবনযাত্রা, আলোছায়া রঙের খেলা তেমনি চলছে, শিল্পীই আজ কেবল নীরব, নিশ্চল দর্শক মাত্র।

অবনীন্দ্রনাথ এখন দূরে গিয়ে পড়েছেন, জীবন-সংগ্রামে আমারও অবসর হয়েছে বিরল, তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করবার সৌভাগ্য হয় কালেভদ্রে কদাচ। সাহিত্যক্ষেত্রে চরণস্পর্শ করে প্রণাম করেছি মাত্র দুইজন লোককে। তাঁরা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ।

স্যর যদুনাথ সরকার

ভারতবাসীরা ইতিহাস রচনার জন্যে খ্যাতিলাভ করেনি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস দুর্লভ। মুসলমানরা এদেশে এসে ইতিহাস রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করেন বটে এবং তাঁদের দেখাদেখি অল্প কয়েকজন হিন্দুও কিছু কিছু ঐতিহাসিক রচনা রেখে গিয়েছেন। কিন্তু সে রচনাগুলি প্রায়ই নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না।

এদেশে নিয়মিতভাবে ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেন পাশ্চাত্য লেখকরাই। যদিও সে সব হচ্ছে বিজেতার লিখিত বিজিত দেশের ইতিহাস, তবু তাদের মধ্যে পাওয়া যায় অল্পবিস্তর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং প্রচুর মূল্যবান তথ্য। এবং এ কথা বললেও ভুল বলা হবে না যে, বাঙালীরা ইতিহাস রচনা করতে শিখেছে ইংরেজদের কাছ থেকেই।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম গুরু বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের দিকে বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর যুগেই বাঙালী লেখকরা বিশেষভাবে ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত হন। কিন্তু আমাদের ইতিহাস রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল বলে মনে হয় না। অনেকেরই সম্বল ছিল কেবল ইংরেজদের লিখিত ইতিহাস। অনেকের রচনা হচ্ছে অনুবাদ। অনেকে স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। অনেকের ভিতরে ছিল না সত্যকার ঐতিহাসিকসুলভ মনোবৃত্তি। অনেকে নন নিরপেক্ষ সমালোচক। অনেকে বিনা বা অল্প পরিশ্রমেই হতে চাইতেন ঐতিহাসিক।

বঙ্কিমোত্তর যুগে বাঙলার ঐতিহাসিক সাহিত্য ধীরে ধীরে উন্নত হতে লাগল। কিন্তু সে উন্নতিকেও সর্বতোভাবে আশাপ্রদ বলা যায় না। সে সময়েও এমন ঐতিহাসিক ছিলেন, যিনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ও গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করেছেন। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের নাম সুপরিচিত, কিন্তু তিনি ইতিহাস রচনায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেননি এবং তাঁর রচনাও ভূরি ভূরি ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়ের নাম, কারণ মৌলিক গবেষণা করবার যথেষ্ট শক্তি তাঁর ছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে তিনিও পরস্পরবিরোধী তথ্যগুলি ওজন করে নিজের মত গঠন করতেন না; আগে একটি বিশেষ মত খাড়া করে তার স্বপক্ষেই তথ্যের পর তথ্য সংগ্রহ করে যেতেন, 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থে তার একাধিক প্রমাণ আছে। সিরাজদ্দৌলা

চরিত্রের কালো দিকটা সাদা করে দেখাবার জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। এমন একদেশদর্শিতা ঐতিহাসিকের পক্ষে অশোভন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙলার ইতিহাস' একখানি মূল্যবান গ্রন্থ বটে, কিন্তু তার মধ্যে প্রত্নতত্ত্বের প্রাধান্য আছে বলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা সুখপাঠ্য হয় না। কেবল রাশি রাশি সাল-তারিখ, মুদ্রা, শিলা বা তাম্রলিপির মধ্যে পড়ে পাঠকের মন দিশাহারা হয়ে ওঠে, আখ্যানবস্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্য কথা বলতে কি, আমাদের মাতৃভাষায় আজ পর্যন্ত নিখুঁত ইতিহাস রচিত হয়নি।

মাতৃভাষায় যা হয়নি, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে একজন বাঙালী ঐতিহাসিকের দ্বারা সেই দুরূহ কার্যটি সম্পাদিত হয়েছে। স্যর যদুনাথ সরকার হচ্ছেন বাংলা দেশের প্রথম ঐতিহাসিক, যিনি কেবল স্তূপীকৃত, রসহীন প্রমাণপঞ্জীর মধ্যে ছুটোছুটি করতে চাননি, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর শিল্পীর মত সব রকম তথ্যই সংগ্রহ করে এমন এক অপূর্ব রূপ দিয়েছেন যা একাধারে নিরপেক্ষ সমালোচনা এবং ইতিহাস এবং প্রামাণিক কথা-সাহিত্য। তিনি অলঙ্কারবহুল পল্লবিত ভাষা পরিহার করেও রচনাকে নিরতিশয় সরস করে তুলতে পারেন। বিস্ময়কর তাঁর সংযম। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে এমন-ভাবে তিনি নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন, মন চমৎকৃত না হয়ে পারে না। কল্পনার সাহায্যে ঔপন্যাসিক করেন চরিত্র সৃষ্টি, তাঁর চরিত্র সৃষ্টি হয় বাস্তব ঘটনা অবলম্বন করে। তাঁর পরিকল্পনার ইন্দ্রজালে ইতিহাসের মানুষগুলি বহু যুগের ওপার হতে আবার জীবন্ত মূর্তি ধারণ করে ফিরে এসে দাঁড়ায় বর্তমানকালে। তার ইতিহাস-গ্রন্থাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় কত উপন্যাস, কত নাটক ও কত গাথার উপাদান।

অদ্ভুত কর্মী পুরুষ এই স্যর যদুনাথ। তাঁর ধৈর্য, পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসা সত্যসত্যই অসাধারণ। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস রচনা করতে কেটে গিয়েছে তাঁর পঞ্চাশ বৎসর। এই কাজে

তাঁকে ইংরেজী, ফরাসী, পার্সী, সংস্কৃত, হিন্দী ও মারাঠী ভাষা থেকে অসংখ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয়েছে। এ সম্বন্ধে আর কোন ঐতিহাসিকই এমন বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করেননি। মোগল সাম্রাজ্যের বিশেষজ্ঞ হিসাবে ভারতে তিনি অদ্বিতীয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক কেবল পরিশ্রমী হলেই চলে না। মুটের মত গলদঘর্ম হয়ে খাটবার লোকের অভাব হয় না। ঐতিহাসিককে তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে করতে হয় গভীরভাবে মস্তিষ্কচালনা। রীতিমত মাথা খাটিয়ে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে না পারলে ব্যর্থ হয় সমস্ত পরিশ্রম। তথ্যের থাকে দুটি দিক—স্বপক্ষে ও বিপক্ষে। এই দুটি দিক দিয়ে তথ্যগুলিকে ওজন করে দেখতে হয়—এখানে ঐতিহাসিককে হতে হবে প্রথম শ্রেণীর অনপেক্ষ সমালোচক। অ্যাবট সাহেব ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পক্ষপাতী জীবনীকার। কিন্তু তাঁর লিখিত বিশাল গ্রন্থের মধ্যে প্রকৃত নেপোলিয়নকে দেখতে পাওয়া যায় না। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও সিরাজ-জীবনী রচনা করেছেন সিরাজের বিরুদ্ধে যেসব ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় সেদিকে না তাকিয়েই। কিন্তু স্যর যদুনাথ এ শ্রেণীর ঐতিহাসিক নন। তাঁর প্রকাণ্ড গ্রন্থ 'ঔরংজেবের ইতিহাস' ও শিবাজীর জীবনচরিত পাঠ করলেই সকলে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন, প্রত্যেক ঐতিহাসিক চরিত্রকেই তিনি চারিদিক থেকে দেখতে চেষ্টা করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। তিনি কোন তথ্য ব্যবহার করেছেন গুণ দেখাবার জন্যে এবং দোষ দেখাবার জন্য ব্যবহার করেছেন কোন তথ্য। আবার বহু তথ্যকে পরিত্যাগ করেছেন। লোভনীয় হলেও অবিশ্বাস্য বলে।

স্যর যদুনাথের সমগ্র জীবন কেটে গিয়েছে শিক্ষাব্রত ও ইতিহাস চর্চার ভিতর দিয়ে। রাজসাহী জেলায় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। বাইশ বৎসর বয়সে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষা দেন এবং সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লাভ করেন স্বুবর্ণ পদক ও বৃত্তি। তারপর

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করে কলকাতায়, পাটনায়, বেনারসে ও কটকে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত হন।

অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে ঐতিহাসিক সাধনা। ছাত্র-জীবন সাঙ্গ করেই সর্বপ্রথমে রচনা করেন টিপু সুলতান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর আরো অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বপ্রথম স্মরণীয় দান হচ্ছে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'ঔরংজেবের ইতিহাস'। এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে সাজাহানের অর্ধেক রাজত্বকালের ও ঔরংজেবের সমগ্র জীবনকালের কথা। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আছে সাজাহানের রাজত্বকাল ও উত্তরাধিকারের জন্যে যুদ্ধ। তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ১৬৫৮ থেকে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারতের কথা। চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ১৬৫৪ থেকে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের কথা। পঞ্চম খণ্ড ঔরংজেবের শেষ জীবন নিয়ে রচিত হয়। ঐ গ্রন্থ পাঠ করে ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেব তাকে 'বাঙালী গিবন' বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি 'শিবাজী ও তাঁর যুগ' রচনা করে পেয়েছিলেন বোম্বাইয়ের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে স্যর জেমস ক্যাম্পবেল সুবর্ণ পদক। 'মোগল সাম্রাজ্যের নিম্নগতি ও পতন' হচ্ছে তাঁর আর এক-খানি বিরাট গ্রন্থ। এছাড়া তিনি আরো কয়েকখানি উপভোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে আরভিনের 'লেটার মোগলস' (দুই খণ্ড), 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' (দ্বিতীয় খণ্ড) ও 'আইন-ই আকবরি'। তাঁর রচিত বাংলা প্রবন্ধও আছে, তবে সংখ্যায় সেগুলি বেশী নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইংরেজীতে তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা ভাষান্তরিত করেছেন। তাঁর ইংরেজী রচনা সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে। আজ তাঁর বয়স তিরাশী বৎসর। কিন্তু আজও তাঁর মনীষা, মস্তিষ্ক চালনার শক্তি ও কর্মতৎপরতা অটুট আছে। চিরদিনই তিনি মৌলিক গবেষণার পক্ষপাতী। বয়স হয়েছে বলে অলস হয়ে বসে থাকতে

ভালোবাসেন না। এখন গত ষাট-বাষট্টি বৎসরের ঐতিহাসিক গবেষণা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে আছেন।

আমাদের অধিকাংশ ঐতিহাসিক টেবিলের সামনে চেয়ারাসীন হয়ে পুঁথিপত্রের মধ্যেই কালযাপন করেন। কিন্তু যে যে দেশের ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলবেন, স্যর যদুনাথ স্বয়ং বার বার সেই সব দেশে গিয়ে স্বচক্ষে ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করলে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। মহারাষ্ট্র প্রদেশে গিয়েছেন উপরি উপরি পঞ্চাশবার। ঔরংজেব যেখানে যেখানে গিয়ে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন, বার বার সেই সব স্থান নিজের চোখে দেখে এসেছেন। এই রকম দেশভ্রমণের ফলে তাঁর দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে বহু নূতন নূতন তথ্য। নানা জায়গা থেকে তিনি সংগ্রহ করে এনেছেন ঔরংজেব ও তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের পাঁচ হাজার পত্র।

যাঁরা শস্তায় কিস্তিমাৎ করে নাম কিনতে চান, তাঁদের উপরে স্যর যদুনাথের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দুই-চারখানা ইংরেজী কেতাব পড়ে যা হোক কিছু একটা খাড়া করে দিলেই চলে না। তিনি জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন হঠযোগীর মত। মাত্র দুই-তিনটি পংক্তির জন্য তাঁকে রাশি রাশি প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয়েছে, হয়তো কেটে গিয়েছে দিনের পর দিন। যতদিন না নিজের ধারণা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, ততদিন গভীর চিন্তায় নিযুক্ত থাকতে হয়েছে। লোকপ্রিয়তা অর্জন করবার জন্যে কোনদিন তিনি সত্যকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করতে যাননি। অথচ যা করেছেন, সহানুভূতির সঙ্গেই করেছেন, কোনরকম বিরুদ্ধ ভাবের আশ্রয় নেননি।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ। মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবের আমন্ত্রণে সে বৎসরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয় বর্ধমানে। সাহিত্য সম্মিলনীতে এত ঘটা আর কখনো দেখিনি। এই রেশনের ও দুর্ভিক্ষের যুগে সেদিনকার রাজকীয় ভূরিভোজনের আয়োজনকে গতজন্মের স্বপ্ন বলে মনে হয়। সেরকম সব খাবারও আর তৈরি হয় না এবং সে রকম সব খাবার খাওয়াবার শক্তি বা সুযোগও আজ

আর কারুর নেই। সম্মিলনের প্রধান সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং ইতিহাস শাখায় সভাপতিত্ব করেছিলেন স্যর যদুনাথ সরকার। তাঁর সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয় সেইখানেই। স্যর যদুনাথ বাংলা ভাষায় একটি অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন। তাঁর বাংলা রচনা তাঁর ইংরেজীর মত চোস্ত ও মধুর না হলেও প্রাঞ্জল।

তারপর তাঁর সঙ্গে বার বার দেখা হয়েছে এম. সি. সরকার এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে। ওঁরা তাঁর প্রকাশক ও আত্মীয়। অল্পস্বল্প আলাপও করেছি মাঝে মাঝে। মৃদুভাষী মানুষ তিনি, প্রকৃতি গম্ভীর বলে মনে হয়। কোন রকম 'পোজ' বা ভঙ্গিধারণের চেষ্টা নেই। চেহারা ও সাজপোশাক এত সাদাসিদা যে, কেউ বুঝতেই পারে না তিনি কত বড় পণ্ডিত ও অনন্যসাধারণ মানুষ। জনতার ভিতরে তিনি অনায়াসেই হারিয়ে যেতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব করা যায়।

প্রাচীন বয়সে নিয়তির কাছ থেকে তিনি সদয় ব্যবহার লাভ করেননি। তাঁর চার পুত্র, ছয় কন্যা। তাঁদের মধ্যে বর্তমান আছেন কেবল তিনটি মেয়ে, একটি ছেলে। একটি মেয়ে বিলাতে পড়তে গিয়ে অজ্ঞাত কারণে আত্মঘাতী হন এবং তার কিছুকাল পরেই কলকাতার গত দাঙ্গার সময়ে তাঁর এক পুত্র আততায়ীর হস্তে মারা পড়েন। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও এবং মাথার উপরে কিঞ্চিদধিক আশী বৎসরের ভার নিয়েও স্যর যদুনাথ ভেঙে পড়েননি, অবিচলভাবে সহ্য করেছেন এই সব চরম দুর্ভাগ্যের আঘাত।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বোধ হয় সেটা ১৩২০ (কিম্বা ১৩২১) সাল। আমি তখন আড়ালে থেকে 'যমুনা' পত্রিকা সম্পাদন করছি—যদিও ছাপার হরফে সম্পাদক বলে পরিচিত ছিলেন স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ পাল।

সেই সময়ে সৌরীন প্রায়ই আসতেন 'যমুনা' কার্যালয়ে। মূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অশ্রান্ত গল্পগুজবে আসর মুখরিত করে রাখেন। পেশায় পুলিশ কোর্টের উকিল। কিন্তু ওকালতির চেয়ে টান বেশী সাহিত্যের দিকেই। তাই পুলিশ কোর্টে তাঁর মন টিঁকত না। যখন-তখন সেখান থেকে পিঠটান দিয়ে তিনি মেলামেশা করতে যেতেন সাহিত্যিকদের সঙ্গে।

'যমুনা' কার্যালয়ে সৌরীনের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হত বটে, কিন্তু কথা বলাবলি হত না। তিনি আসতেন, আর পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন, আমি চুপ করে বসে বসে শুনতুম।

সৌরীনের আসল পরিচয় পেয়েছিলুম আরো কয়েক বৎসর আগে। 'ভারতী'তে ছোট গল্পে বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়ে তিনি তখনকার একজন শক্তিশালী উদীয়মান লেখক বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ঝরঝরে হালকা ভাষা, সরল এবং মধুর। রচনাভঙ্গিটিও আমার খুব ভালো লাগত এবং আজও লাগে—কারণ তাঁর ভাষা এখনো দরিদ্র হয়ে পড়েনি। এবং সেই সময়েই তিনি সাহিত্যজগৎ থেকে নাট্যজগতেও দৃষ্টিপাত করতে ছাড়েননি। ১৯০৮ ও ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয় তাঁর রচিত দুখানি কৌতুক-নাট্য—'যৎকিঞ্চিৎ' ও 'দশচক্র'।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রথম বয়স থেকেই। ভাগলপুরে বসে শরৎচন্দ্র একটি তরুণ লেখকদের দল গড়ে তুলেছিলেন। তখন শরৎচন্দ্রের নামও কেউ জানত না এবং কেউ চিনত না সেই সব তরুণকে। তাঁদের নাম হচ্ছে স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবী, স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। ভাগলপুরের দল যে হাতেলেখা পত্রিকায় লেখনী চালনা করতেন, তার নাম ছিল 'ছায়া'। শরৎচন্দ্রের উঠতি বয়সের বহু রচনাই পরে 'ছায়া' পত্রিকার অঙ্ক ছেড়ে প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে এসে দেখা দিয়েছে।

সৌরীনের বাড়ী কলকাতায়, কাজেই ভাগলপুরে তিনি স্থায়ী

হতে পারেননি। উপেন্দ্রনাথও কলকাতায় চলে আসেন। কিন্তু এখানে এসেও তাঁরা সাহিত্যের নেশা ছাড়তে পারলেন না। সাহিত্য চর্চায় উৎসাহী আরো কয়েকজন তরুণকে নিয়ে গঠন করলেন 'ভবানীপুর সাহিত্য সমিতি'। এখানকার হাতেলেখা পত্রিকার নাম হল 'তরণী'।

'ছায়া' ও 'তরণী' করত গুরু-শিষ্যের সংবাদবহন। ডাকযোগে তারা আনাগোনা করত কলকাতায় এবং ভাগলপুরে। পরস্পরকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করতেও ছাড়ত না।

তারপর আত্মলীলার আসর ছেড়ে সৌরীন এসে যোগ দিলেন 'ভারতী'র সঙ্গে। তখন সরলা দেবী ছিলেন 'ভারতী'র সম্পাদিকা। কিছুকাল দক্ষ হস্তে পত্রিকা চালিয়ে বিবাহ করে তাঁকে পাঞ্জাবে চলে যেতে হয়। সেই সময়ে সৌরীন কলকাতায় থেকে সরলা দেবীর নির্দেশ অনুসারে 'ভারতী'র কাজ চালিয়ে যেতেন।

তারপর সৌরীন যে কীর্তি স্থাপন করলেন, বাংলা সাহিত্যের দরবারে তা হচ্ছে একটি বিশেষরূপে উল্লেখ্য ঘটনা।

সাহিত্যসাধনা ছেড়ে শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে গিয়ে হয়েছেন মাছি-মারা কেরানী। তাঁর নিজের মুখেই প্রকাশ, 'এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি, ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনোদিন লিখেছি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে—ইতিমধ্যে কবিকে (রবীন্দ্রনাথ) কেন্দ্র করে কি করে যে নবীন বাঙলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো আমি তার কোনো খবরই জানিনে।'

শরৎচন্দ্র নিরুদ্দেশ। কিন্তু তাঁর রচনার পাণ্ডুলিপিগুলি যে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জিম্মায় আছে, সৌরীন এ খবরটা জানতেন। সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি 'বড়দিদি' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আনিয়ে শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতসারেই 'ভারতী'তে তিন কিস্তিতে ছাপিয়ে দিলেন (১৯০৭ খ্রীঃ)। তার ফলেই শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে হয় জনসাধারণের প্রথম পরিচয় সাধন। শরতের চাঁদের মুখ থেকে মেঘের ঘোমটা প্রথম খুলে দেন সৌরীন্দ্রমোহনই। এজন্যে তিনি অভিনন্দন পেতে পারেন।

তারপর কেটে গেল আরো কয়েক বৎসর। শরৎচন্দ্র অজ্ঞতবাসে। সাহিত্য নিয়ে নেই তাঁর কিছুমাত্র মাথাব্যথা। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন।

সে সময়ে ফণীন্দ্রনাথ পাল চালাচ্ছেন 'যমুনা' পত্রিকা; তার সঙ্গে তখনও আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় পত্রিকা চালনায় ফণীবাবুকে সাহায্য করতেন। তাঁরা দুইজনেই শরৎচন্দ্রকে ধরে বসলেন, 'যমুনা'র জন্যে আবার লেখনী ধারণ করতে।

সৌরীন লিখেছেন: 'যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্র পাল আমায় ধরিয়াছেন—যে "যমুনা"কে তিনি জীবন-সর্বস্ব করিতে চান, আমার সহযোগিতা চাহেন। শরৎচন্দ্র আসিলে তাঁকে ধরিলাম—এই যমুনার জন্য লিখিতে হইবে।'

শরৎচন্দ্র বলিলেন—একখানা উপন্যাস 'চরিত্রহীন' লিখিতেছি। পড়িয়া ছাখো চলে কিনা।

প্রায় পাঁচ আনা অংশ লেখা 'চরিত্রহীনে'র কপি তিনি আমার হাতে দিলেন। পড়িলাম। শরৎচন্দ্র কহিলেন—নায়িকা কিরণময়ী। তার এখনো দেখা পাওনি। খুব বড় বই হইবে।

'চরিত্রহীন' যমুনায় ছাপা হইবে স্থির হইয়া গেল। তিনি অনিলা দেবী ছদ্ম নামে 'নারীর মূল্য' আমায় দিয়া বলিলেন—আমার নাম প্রকাশ করিয়ো না। আপাতত যমুনায় ছাপাও।

তাই ছাপানো হইল। তারপর দিলেন গল্প—'রামের সুমতি'। যমুনায় ছাপা হইল। বৈশাখের যমুনার জন্যে আবার গল্প দিলেন—'পথনির্দেশ।'

সৌরীন্দ্রমোহন ও উপেন্দ্রনাথ মধ্যস্থ হয়ে না দাঁড়ালে এবং লেখার জন্যে পীড়াপীড়ি না করলে শরৎচন্দ্র যে সাহিত্যক্ষেত্রে পুনরাগমন করতেন, এ কথা জোর করে বলা যায় না।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলে নি। শরৎচন্দ্রের একটি মজার শখ ছিল। তিনি যেসব লেখককে নিজের শিষ্যস্থানীয়

বলে মনে করতেন, তাঁদের প্রত্যেককে উপহার দিতেন একটি করে ভালো ফাউণ্টেন পেন। তাঁর একখানি পত্রে দেখি, নিরুপমা দেবী ও সৌরীনের জন্যেও তিনি ফাউণ্টেন পেন ঠিক করে রেখেছেন।

যমুনা কার্যালয়ে একদিন আমাকে বললেন, 'হেমেন্দ্র, তুমি যদি আমাকে গুরু বলে মানো, তাহলে তোমাকেও একটি ফাউণ্টেন পেন দেব।'

তার ছেলেমানুষি কথা শুনে মনে মনে হেসে বললুম, 'আপনি আমার শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু আমার গুরু রবীন্দ্রনাথ। আর কারুকে তো গুরু বলে মানতে পারব না।' বলা বাহুল্য, আমার ভাগ্যে আর ফাউণ্টেন পেন লাভ হয়নি।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপরে 'ভারতী' সম্পাদনার ভার দিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী অবকাশ গ্রহণ করলেন। সেই সময়ে মণিলালের বাল্যবন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন হন 'ভারতী'র সহযোগী সম্পাদক। আমি তখন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মর্মবাণী'র সহকারী সম্পাদক। কিন্তু মণিলালের আহ্বানে আমিও যোগ দি 'ভারতী'র দলে। ঐখানেই সৌরীন্দ্রের সঙ্গে আমার মৌখিক কথোপকথন সুরু হয়। ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে আমাদের সৌহার্দ্য। কেবল 'ভারতী'র বৈঠকে আড্ডা দিয়েই আমাদেব তৃপ্তি হয় না, কোনদিন আদালত থেকে ধড়াচূড়ো না বদলেই তিনি সোজা চলে আসেন আমার কাছে, কোনদিন আমিই সিধে গিয়ে উঠি তাঁর বাড়ীতে। দুজনেই নাট্যকলার অনুরাগী, একসঙ্গে গিয়ে বসি এ রঙ্গালয়ে, ও রঙ্গালয়ে।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারে সৌরীনের লেখা 'রুমেলা' নাটক অভিনীত হয়। তারপর 'নাট্যমন্দিরে' ও 'আর্ট থিয়েটারে' তাঁর আরো দুখানি কৌতুক-নাটিকার অভিনয় হয়—'হারানো রতন' ও 'লাখ টাকা'। শেষোক্ত নাটকে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী প্রধান হাস্য-রসাশ্রিত ভূমিকায় যে চমৎকার অভিনয় এবং 'মেক-আপে' যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করেছিলেন, তা আজও আমার চোখের সামনে

ভাসছে। এই শ্রেণীর লঘু হাস্যনাট্য রচনায় সৌরীন্দ্রমোহন প্রভৃতি দক্ষতা জাহির করেছেন। কিন্তু নবযুগের বাংলা নাট্যকলা কিছুদূর অগ্রসর হয়েই নিছক হাসির পালা প্রায় সাঙ্গ করে দিয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই অমৃতলাল বসুর মত অতুলনীয় হাস্য-নাট্যকার আর এখানে আসর জমাবার সুযোগ পাবেন না। সৌরীন্দ্রমোহনও আর হাস্যনাট্য রচনায় নিযুক্ত হন না। বাঙালী দর্শকদের গোমড়া মুখ দেখলে হাসির পালা বাঁধবার সাধ হয় কার?

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমিও 'প্রেমের প্রেমারা' নামে একখানি দুই অঙ্কের হাসির নাটিকা রচনা করেছিলুম। মণিলাল ও সৌরীনের চেষ্টায় পালাটি মিনার্ভা থিয়েটারে গৃহীত হয়। আমি তখন দেওঘরে। সৌরীন নিজেই সানন্দে একখানি পত্রে আমাকে সেই খবরটি দেন এবং নিজেই উদ্‌যোগী হয়ে অভিনয় সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেন।

শিশিরকুমারের প্রথম অভিনয় দেখি তাঁরই মধ্যস্থতায়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ। একদিন তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'হেমেন্দ্র, আজ ষ্টার রঙ্গমঞ্চে বিখ্যাত শৌখীন অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" নাটকে ভীমের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। টিকিট বেচে অভিনয়, কারণ "সাহায্য-রজনী"। আমি একখানা টিকিট কিনেছি, তুমিও একখানা নাও।'

পুরনো নাটক, শৌখীন অভিনয়। তার উপরে পুরুষরা সাজবে মেয়ে, আমার কাছে যা অসহনীয়। মনে বিশেষ কৌতূহল না থাকলেও সৌরীনের আগ্রহে শেষ পর্যন্ত অভিনয় দেখতে গেলুম। গিয়ে ঠকিনি। সে রাত্রে যে বিস্ময়কর নাট্যপ্রতিভার নিদর্শন দেখেছিলুম, ক্ষীয়মাণ গিরিশোত্তর যুগের নাট্যজগতে তা ছিল সম্পূর্ণরূপেই অপ্রত্যাশিত। সৌরীন রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে আনলেন: শৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ে শিশিরবাবুর এই শেষ অভিনয়। এর পর তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন সাধারণ রঙ্গালয়ে।

সৌরীন আগে লিখতেন ছোট গল্প এবং মাঝে মাঝে কবিতাও। তারপর উপন্যাস রচনাতেও নিপুণ হাতের পরিচয় দেন। সরল রচনার ওস্তাদ বলে তিনি শিশুসাহিত্যেও কৃতী লেখকরূপে রীতিমত নাম কিনেছেন। তাঁর লেখা কেতাবের নামের ফর্দ হবে সুদীর্ঘ। এত লিখেও তাঁর লেখার উৎসাহ ফুরিয়ে যায়নি। আজও তিনি লিখছেন, অশ্রান্তভাবেই লিখছেন। তাঁর সাহিত্যশ্রম উল্লেখনীয়।

চলচ্চিত্র যখন বোবা, তাঁর রচিত উপন্যাস 'পিয়ারী' চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী চন্দ্রাবতী সেই প্রথম দেখা দেন চলচ্চিত্রপটে। গল্প ভালো। কিন্তু যা সচরাচর হয়ে থাকে, পরিচালনার দোষে ছবিখানি জমেনি। কিন্তু হালে সৌরীন অর্জন করেছেন যশের 'লরেল'। তাঁর উপন্যাস অবলম্বনে রচিত 'বাবলা' এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ বাংলা চিত্র বলে সমাদৃত হয়েছে। বন্ধুর সাফল্যে আমিও আনন্দিত।

সৌরীন আজ প্রাচীন। বয়সে আমার চেয়ে চার-পাঁচ বৎসরের বড়। কিন্তু এখনো বালকোচিত স্বভাব ছাড়তে পারেননি। থেকে থেকে কেন যে তিনি অভিমান করবেন, নিজেকে উপেক্ষিত ভেবে মুখভার করে থাকবেন, তার হদিস পাওয়া কঠিন। হঠাৎ রাগেন, আবার হঠাৎ ঠাণ্ডা হন। বৈশাখের চড়া রোদ আবার আষাঢ়ের মেদুর ছায়া। শেষ যেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন তিনি বৈশাখী তপ্ততার দ্বারা আক্রান্ত। আমি বলেছিলুম, 'ভাই, আমরা দুজনেই আজ জীবনের প্রান্তদেশে এসে পড়েছি। যা অকিঞ্চিৎকর, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার বয়স কি আর আছে?'

নজরুলের জন্মদিন স্মরণে

স্নেহাস্পদ নজরুল ইসলাম চুয়ান্নো বৎসরে পা দিয়েছেন। কিন্তু বহু বৎসর আগেই রুদ্ধ হয়েছে তাঁর সাহিত্যজীবনের গতি। কবির পক্ষে এর চেয়ে চরম দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই। জীবন্ত তরু, কিন্তু ফলন্ত নয়।

আর একটা বড় দুঃখের কথা হচ্ছে এই : নজরুলের লেখনী আর কবিতা প্রসব করে না বটে, কিন্তু তিনি যে কবি, এ বোধশক্তি আজও হারিয়ে ফেলেননি। এবারের জন্মদিনে কোন ভক্ত তাঁর স্বাক্ষর প্রার্থনা করেছিলেন। নজরুল তাঁর খাতায় এই বলে নাম সই করেন—'চিরকবি কাজী নজরুল ইসলাম'। এই স্বাক্ষরের আড়ালে আছে যাতনার ইতিহাস।

শিল্পীর পক্ষে এই অবস্থা অত্যন্ত মর্মন্তুদ। অতুলনীয় চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পক্ষাঘাত রোগের আক্রমণে তাঁরও হয়েছিল এই অবস্থা। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সৃষ্টি করার কাজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সেটা ছিল অতিশয় পীড়াদায়ক। একদিন তাঁর ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাসভবনে দ্বিতলের প্রশস্ত অলিন্দে বসে আছি এবং তিনিও তাঁর কারুকাজ করা আসনে আসীন হয়ে নীরবে রোগযন্ত্রণা সহ্য করছেন। হঠাৎ আমার দিকে কাতর দৃষ্টি তুলে অবনীন্দ্রনাথ মৃদু ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'বড় কষ্ট, হেমেন্দ্র! আঁকতে চাই, আঁকতে পারি না; লিখতে চাই, লিখতে পারি না!'

একদিন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তাঁর এবং অন্যান্য সকলেরই অজ্ঞাতসারে কালব্যাধি তখনই তাঁর দেহের মধ্যে শিকড় বিস্তার করেছিল। ভিতরে ভিতরে কি সর্বনাশের আয়োজন হচ্ছে,

তিনি সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে না পারলেও, তখনই শুকিয়ে গিয়েছিল তাঁর রচনার উৎস। সেই সময়ে আমি ছিলুম এক পত্রিকার ('দীপালী') সম্পাদক। নিজের কাগজের জন্যে শরৎচন্দ্রের কাছে থেকে একটি রচনা প্রার্থনা করলুম। আমি নিশ্চিতরূপেই জানতুম, আমার আরজি মঞ্জুর হবে, কারণ তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন। আগেও তার কাছ থেকে লেখা চেয়েছি এবং পেয়েছি। কিন্তু সেবারে আমার প্রার্থনা শুনে অত্যন্ত করুণ স্বরে তিনি বললেন, 'ভাই হেমেন্দ্র, বিশ্বাস কর, আমি আর লিখতে পারি না। লিখতে বসলেই মাথার ভিতরে বিষম যাতনা হয়। কলম ছেড়ে উঠে পড়ি!' তাঁর চক্ষের ও কণ্ঠের আর্ত ভাব এখনো আমি ভুলিনি। তারপর সত্যসত্যই শরৎচন্দ্র আর কোন নতুন রচনায় হাত দেননি।

এখানে ফ্রান্সের অমর ঔপন্যাসিক আলেকজাণ্ডার ডুমার কথাও মনে হয়। শেষ বয়সেও তাঁর মনের মধ্যে রচনার জন্যে প্রেরণার অভাব ছিল না, তিনি রোজ টেবিলের ধারে গিয়ে বসতেন। তাঁর হাতে থাকত কলম এবং সামনে থাকত কাগজ। কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু তিনি আর লিখতে পারতেন না। তাঁর তখনকার মনের যাতনা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

নজরুলের মন বোধহয় এখন এইরকমই শোকাবিষ্ট হয়েছে। নিজেকে যখন 'চিরকবি' বলে স্বাক্ষর করছেন, তখন মনে মনে এখনো তিনি নিশ্চয়ই বাস করছেন কাব্য-জগতে। কিন্তু নিজে যা দেখছেন, বা বুঝছেন, ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারছেন না। এ যেন মূকের স্বপ্নদর্শন। যা দেখা যায়, তা বলা যায় না। বলতে সাধ হলেও বলা যায় না।

পত্রান্তরে নজরুল সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি। কিন্তু তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে আরো কোন কোন কথা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

নজরুল যখন প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, তখন এখানে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিরা সমুদিত ও সুপরিচিত হয়েছেন। আরো দুই-একজন তখন উদীয়মান অবস্থায়। রবীন্দ্রনাথের লেখনী তখনও অশ্রান্ত। আমাদের কাব্যজগতে সেটা ছিল সুভিক্ষের যুগ। কবিতার কোন অভাবই কেউ অনুভব করেনি।

কিন্তু যুগধর্ম প্রকাশ করতে পারেন, দেশ যে এমন কোন নূতন কবিকে চায়, নজরুলের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারলে সকলেই।

এদেশে এমনিই তো হয়ে আসছে বরাবর। যুগে যুগে আমরা পুরাতন ও পরিচিতদের নিয়েই মেতে থাকতে চেয়েছি, অর্বাচীনদের উপরে কোন আস্থা না রেখেই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী গদ্যলেখকরা যে উৎকট ভাষা ব্যবহার করতেন, তা ছিল পুরোমাত্রায় সংস্কৃতের গোলাম। আমরা তারই মধ্যে পেতুম উপভোগের খোরাক, সৌন্দর্যের সন্ধান। হঠাৎ টেকচাঁদ ঠাকুর ও হুতোম আবির্ভূত হয়ে যখন আমাদের ঘরের পানে তাকাতে বললেন, তখন আমরা একটু অবাক হয়েছিলুম বটে, কিন্তু তাদের করে রেখে-ছিলুম কোণঠাসা। সাহিত্যের দরবারে কথ্য ভাষাকে কায়েমী করবার জন্যে পরে দরকার হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর শক্তি ও রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভা। যখন বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' ও মাইকেল মধু-সূদন 'মেঘনাদবধ' নিয়ে আসরে প্রবেশ করেন, তখনও কেউ তাঁদের প্রত্যাশা করেনি।

উপরোক্ত যুগান্তকারী লেখকগণের সঙ্গে নজরুলের তুলনা করা চলে না বটে, কিন্তু বহু কবিদের দ্বারা অধ্যুষিত বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যে এনেছিলেন একটি নূতন সুর সে কথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। বিংশ শতাব্দীর তরুণদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন প্রথম কবি, রবীন্দ্রনাথের যশোমণ্ডলের মধ্যে থেকেও যিনি খুঁজে পেয়েছেন স্বকীয় রচনাভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রথম মহাযুদ্ধে নজরুল 'ইউনিফর্ম' পরে সৈনিকের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। পরে 'ইউনিফর্ম' খুলে ফেললেও কাব্যজগতেও প্রবেশ করেছিলেন সৈনিকের ব্রত নিয়েই। দুর্গত দেশবাসীদের শাক্তের গান শুনিয়ে তিনি দুদিনেই জাগ্রত করে তুললেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেও গ্রহণ করলেন একটি নাতিক্ষুদ্র অংশ। রাজরোষ তাঁকে ক্ষমা করলে না, তাঁর স্থাননির্দেশ করলে বন্দীশালায়। কিন্তু তবু দমিত হল না তাঁর বিদ্রোহ।

কিন্তু তাঁর এ বিদ্রোহ কেবল দেশের রক্তশোষক শাসক জাতির বিরুদ্ধে নয়, এ বিদ্রোহ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিরুদ্ধে, ছুতমার্গ-গামী সমাজপতিদের বিরুদ্ধে, বৈড়ালব্রতী ভণ্ডদলের বিরুদ্ধে—এক কথায় সকল শ্রেণীর অনাচারী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে।

নজরুল যখন সবে কবিতা লিখতে সুরু করেছেন, তখনই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। নিত্য আমাদেরই বৈঠক ছিল তাঁর হাঁফ ছাড়বার জায়গা। সেই সময়েই তাঁর গুটিকয়েক কবিতা পড়ে তাঁকে ভালো কবি বলে চিনতে পেরেছিলুম। তারপরই তিনি আমাকে রীতিমত বিস্মিত করে তুললেন।

সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকা আমার কাছে আসত নিয়মিতরূপে, তার জন্যে আমি রচনা করেছি উপন্যাস, কবিতা ও গান প্রভৃতি। হঠাৎ-এক সংখ্যার 'বিজলী'তে দেখলুম, নজরুলের রচিত দীর্ঘ এক কবিতা, নাম 'বিদ্রোহী'। দীর্ঘ কবিতা আমাকে সহজে আকৃষ্ট করে না। কিন্তু কৌতূহলী হয়ে সে কবিতাটি পাঠ করলুম। দীর্ঘতার জন্যে কোনখানেই তা একঘেয়ে লাগল না, সাগ্রহে পড়ে ফেললুম সমগ্র কবিতাটি। একেবারে অভিভূত হয়ে গেলুম। তার মধ্যে পাওয়া গেল অভিনব স্টাইল, ভাব, ছন্দ, সুর ও বর্ণনাভঙ্গি। এক সবল পুরুষের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর। বুঝলুম, নজরুল আর উদীয়মান নন, সম্যকরূপে সমুদিত। দেশের লোকরাও তাই বুঝলে। সেই এক কবিতাই তাঁকে যশস্বী করে তুললে সর্বত্র। সবাই বলতে লাগল তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি'।

কিন্তু নজরুল কেবল শক্তির দীপক নয়, শুনিয়েছেন অনেক সুকুমার প্রেমের গানও। কখনো ধ্রুপদ ধরেন, কখনো ধরেন ঠুংরী। কখনো তূরী-ভেরী, কখনো বেণু-বীণা। বাজিয়েছেন পাখোয়াজ, বাজিয়েছেন তবলাও। তিনি একজন গোটা কবি।

নজরুলের মুখেই শুনেছি, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, বাল্যকালে তিনিও সেখানে পাঠ করতেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় বিদ্যালয়ে বেশী বিদ্যালাভ করেননি, নিজেকে শিক্ষিত ও মানুষ করে তুলেছেন বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাইরে বৃহৎ বিচিত্র পৃথিবীর রাজপথে গিয়ে। একসময়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে তিনি নাকি মফঃস্বলের কোন চায়ের না রুটির দোকানে 'বয়' বা ছোকরার কাজ করতেও বাকি রাখেননি। পাশ্চাত্ত্য দেশে শোনা যায়, প্রথম জীবনে চাকরের কাজ করে পরে কীর্তিমান হয়েছেন অনেক কবি, অনেক লেখক। কিন্তু চায়ের বা রুটির দোকানের ছোকরা পরে দেশপ্রসিদ্ধ কবি হয়ে দাঁড়িয়েছেন, বাংলা দেশে এমন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আছে বলে জানি না।

আগে আমার বাড়ীতে নিয়মিতভাবে গানের বৈঠক বসত। তার উদ্বোধন করেন নজরুলই। এক একদিন তিনি আমার কাছে আসতেন, আর বাড়ী ফেরবার নাম পর্যন্ত মুখে আনতেন না। একদিন যেত, দুদিন যেত, তিনদিন যেত, নজরুল নিজের স্ত্রী-পুত্রের কথা বেবাক ভুলে আমার কাছে পড়ে আছেন গান আর হারমোনিয়াম আর পান আর চায়ের পেয়ালা নিয়ে। স্নান, আহার, নিদ্রা সব আমার সঙ্গেই। আমার বাড়ীর পরিবেশ হয়ে উঠত গানে গানে গানময়। অক্লান্ত ধারাবাহিক গানের স্রোত। ঠুংরী, গজল, রবীন্দ্রনাথের গান, অতুলপ্রসাদের গান, মেঠো কবির গান, নিজের গান।

তখনকার নজরুলকে স্মরণ করে কিছুদিন আগে এই কবিতাটি রচনা করেছিলুম :—

নজরুল ভাই, রোজই বাজে
মনের মাঝে স্মৃতির সুর,

সেই অতীতের তোমার স্মৃতি।
—আজকে থেকে অনেক দূর
যৌবনেরি শ্যামল স্মৃতি
এই জীবনে অমূল্য।
বন্ধু, তাহার বিনিময়ে
চাইনা আমি কোহিনূর।

দরাজ প্রাণের কবি তুমি,
হস্তে ছিল রুদ্রবীণ,
আকাশ-বাতাস উঠত দুলে
বক্ষে তোমার রাত্রি-দিন।
যেথায় যেতে ছড়িয়ে যেতে
মুক্ত প্রাণের হাস্যকে,
আপন করে নিতে তাকেও,
তোমার কাছে যে অচিন।

দিনের পরে দিন গিয়েছে,
রাতের পরে আবার রাত,
চাঁদের আলোয় ভাসত যখন
আমার বাড়ীর খোলা ছাত,
তাকিয়ে গঙ্গা নদীর পানে
গানের পরে ধরতে গান—
মুগ্ধ হয়ে নিতাম টেনে
আমার কোলে তোমার হাত

হায় দুনিয়ায় যে দিন ফুরায়,
যায় না পাওয়া আর তাকে।
বসন্ত আর গাইবে নাকো,
উঠলে আঁধি বৈশাখে।

তাইতো ঘরে একলা বসে
বাজাই স্মৃতির গ্রামোফোন—
আবার কাছে আসে তখন
দূর অতীতে যে থাকে।

নজরুলের কাছ থেকে বরাবর আমি অগ্রজের মত শ্রদ্ধালাভ করে এসেছি। তিনি আমাকে ভালোবাসতেন। আমার ছোট ছেলে প্রদ্যোত (ডাকনাম গাবলু) কবে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তার খাতায় তিনি এই শ্লোকটি লিখে দিয়েছিলেন ঃ—

'তোমার বাবার বাবা হও তুমি
কবি-খ্যাতিতে যশে,
তব পিতা সম হও নিরুপম
আনন্দ-ঘন রসে।
স্নেহের গাবলু! অপূর্ণ যাহা
রহিল মোদের মাঝে,
তোমার বীণার তন্ত্রীতে যেন
পূর্ণ হয়ে তা বাজে।
শুভার্থী—কাজীকা'

নজরুলের অনেক কথা প্রবন্ধান্তরে বলেছি, এখানে পুনরুল্লেখের দরকার নেই। যখন আমার বাড়ীর বৈঠকের কথা বলব, তখন অন্যান্য নামী গাইয়েদের সঙ্গে মাঝে মাঝে নজরুলেরও দেখা পাওয়া যাবে।

মেঘদূতের মর্তে আগমন

অলৌকিক রহস্য

সেদিন সকাল-বেলায় কমল যখন নিজের পড়বার ঘরে সবে এসে বসেছে, হঠাৎ তার চাকর ঘরে ঢুকে খবর দিলে, 'বাবু, একটা লোক আপনাকে এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।'

কমল চিঠিখানা খুলে পড়লে, তাতে শুধু লেখা আছে—

'প্রিয় কমল,

শীঘ্র আমার বাড়িতে এস। সাক্ষাতে সমস্ত বলব। ইতি—

বিনয় মজুমদার।'

বিনয়বাবুর সঙ্গে কমলের আলাপ হয় মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে। কমলের বয়স উনিশ বৎসর, সে কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বিনয়বাবুর বয়স পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু বয়সে এতখানি তফাৎ হলেও, দুজনের মধ্যে আলাপ খুব জমে উঠেছিল। বিনয়বাবুর

স্বভাবটা ছিল এমন সরল যে, বয়সের তফাতের জন্যে কারুর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের কিছুমাত্র তফাৎ হত না।

কমলের সঙ্গে বিনয়বাবুর আলাপ এত ঘনিষ্ঠ হবার আরও একটা কারণ ছিল। বিনয়বাবু সরল হলেও তাঁর প্রকৃতি ঠিক সাধারণ লোকের মতন নয়। দিন-রাত তিনি পুঁথিপত্র আর লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকেন, সংসারের আর কোন ধার বড় একটা ধারেন না। তাঁর বাড়ীর ছাদের উপরে আকাশ-পরিদর্শনের নানারকম দূরবীন ও যন্ত্র আছে,—গ্রহ-নক্ষত্রের খবর রাখা তাঁর একটা মস্ত বাতিক। এ-সম্বন্ধে তিনি এমন সব আশ্চর্য গল্প বলতেন, তাঁর অন্যান্য বন্ধুরা যা গাঁজাখুরি বলে হেসেই উড়িয়ে দিতেন, এমন কি অনেকে তাঁকে পাগল বলতেও ছাড়তেন না।

কমল কিন্তু তাঁর কথা খুব মন দিয়ে শুনত। কলের মত শ্রোতাকে পেয়ে বিনয়বাবুও ভারি খুসি হয়েছিলেন এবং এইজন্যেই কমলকে তাঁর ভারি ভালো লাগত। নিজের নতুন নতুন জ্ঞানের কথা কমলের কাছে তিনি খুলে বলতেন, কমলও তা ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করত না।

আজ সকালে বিনয়বাবুর চিঠি পেয়ে কমল বুঝল যে, তিনি নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কথা তাকে বলতে চান। সে তখনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।···

বিনয়বাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপরে উঠে কমল দেখলে, তিনি তাঁর লাইব্রেরি-ঘরের ভিতরে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিনয়বাবু দেখতে ফর্সা এবং মাথায় মাঝারি হলেও তাঁর দেহখানি এমন বিষম চওড়া যে, দেখলেই বোঝা যায়, তাঁর গায়ে জোর আছে অত্যন্ত। তাঁর মাথায় কাঁচা-পাকা চুল,—সে চুলে কখনো চিরুনি-বুরুশ পড়েছে বলে সন্দেহও হয় না। মুখেও কাঁচা-পাকা গোঁফ ও লম্বা দাড়ি।

কমলকে দেখেই বিনয়বাবু বললেন, 'এই যে ভায়া, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

কমল বললে, 'কেন বিনয়বাবু, আপনি কোন নতুন নক্ষত্র আবিষ্কার করেছেন নাকি?'

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললেন, 'না হে, না, তার চেয়েও গুরুতর ব্যাপার।'

'তার চেয়েও গুরুতর ব্যাপার! তবে কি ধূমকেতু আবার পৃথিবীর দিকে তেড়ে আসছে?'

'তাও নয়।'

'তাও নয়? কিন্তু আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি বড়ই ভয় পেয়েছেন।'

'ভয় পাইনি, তবে চিন্তিত হয়েছি বটে।...আচ্ছা, আগে এই খবরের কাগজখানা পড়ে দেখ,—এই, এই নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া জায়গাটা'।—এই বলে বিনয়বাবু কমলের হাতে একখানা বাংলা খবরের কাগজ এগিয়ে দিলেন।

কাগজের একটা কলমের চারপাশে নীল পেন্সিলের মোটা দাগ টানা রয়েছে। কমল পড়তে লাগল—

'অলৌকিক কাণ্ড!

ভুত, না, মানুষের অত্যাচার?

কলিকাতার অদূরবর্তী বিলাসপুর গ্রামে সম্প্রতি নানারূপ আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতেছে, পুলিশ অনেক অত্যাচার করিয়াও কিছুই কিনারা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

আজ ঠিক একমাস আগে প্রথম ঘটনা ঘটে। বিলাসপুরের জমিদারের একখানি ছোট স্টীমার গঙ্গার ঘাটে বাঁধা ছিল। হঠাৎ একদিন সকালে দেখা গেল, স্টীমারখানি অদৃশ্য হইয়াছে। স্টীমারে কয়েকজন খালাসি ছিল, তাহারাও নিরুদ্দেশ। পুলিশের বহু অনুসন্ধানেও স্টীমারের কোন সন্ধান মিলে নাই।

তার পরের ঘটনা আরো বিস্ময়কর। বিলাসপুরের শীতলা-দেবীর মন্দিরের সামনে একটি বহু-পুরাতন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলে, বটগাছটির বয়স দেড়শত বৎসরের চেয়েও বেশী। এতবড় বটগাছ এ অঞ্চলে আর দ্বিতীয় ছিল না। গত ৩রা কার্তিক সোমবার সন্ধ্যাকালে এই বটগাছের তলায় কৃষ্ণ-যাত্রার অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, সমগ্র বটগাছটি রাত্রের মধ্যেই ডাল-পালা-শিকড়-শুদ্ধ কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। বটগাছের চিহ্নমাত্রও সেখানে নাই, গাছের উপরে একদল বানর বাস করিত, তাহাদেরও কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। যেখানে বটগাছ ছিল, সেখানে একটি প্রকাণ্ড গর্ত হাঁ-হাঁ করিতেছে, দেখিলে মনে হয়, যেন এক বিরাট-দেহ দানব বটগাছটিকে শিকড়শুদ্ধ উপড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় ঘটনাটিও কম আশ্চর্য নয়। বিলাসপুর স্টেশনে একখানা রেলগাড়ীর ইঞ্জিন লাইনের উপর দাঁড় করানো ছিল। গত ১৩ই কার্তিক তারিখে রাত্রি বারোটার সময় স্টেশন-মাস্টার স্বয়ং ইঞ্জিনখানিকে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু রাত্রি একটার পর থেকে ইঞ্জিনখানিকে আর পাওয়া যাইতেছে না। ইঞ্জিনে আগুন ছিল না, সুতরাং তাহাকে চালাইয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব। তার উপরে সমস্ত লাইন তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ইঞ্জিনের কোন সন্ধান মিলে নাই।

এসব কোন বদমাস বা চোরের দলের কাজ হইতে পারে না। তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্টীমার বা বটগাছ বা ইঞ্জিনের কোন না কোন খোঁজ নিশ্চই পাওয়া যাইত। অতএব অতবড় একটা বটগাছ শিকড়শুদ্ধ উপড়াইয়া ফেলিতে যে কত লোকের দরকার, তা আর বুঝাইয়া বলিবার দরকার নাই—মোট কথা, সেটা একেবারেই অসম্ভব। এসব কাজ এতটা চুপি চুপি, এত শীঘ্র করাও চলে না। অথচ এমনি সব কাণ্ড ঘটিতেছে। এর কারণ কী?

বিলাসপুরের বাসিন্দারা এইসব অলৌকিক ব্যাপারে যে যার-পর-নাই ভয় পাইয়াছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সন্ধ্যার পর গ্রামের কেউ আর বাহির হয় না। চৌকিদারও পাহারা দিতে চাহিতেছে না—সকলেই বলিতেছে, এসব দৈত্য-দানবের কাজ। রাত্রে অনেকেই নাকি একরকম অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পায়—সে শব্দ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। কোন কোন সাহসী লোক জানলায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুই দেখিতে পায় নাই। তবে তাহারা সকলেই এক আশ্চর্য কথা বলিয়াছে শব্দটা যখন খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠে, তখন চারিদিকে নাকি বরফের মত কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে থাকে। এ শব্দ কিসের এবং এ ঠাণ্ডা বাতাসের গুপ্ত রহস্যই বা কী?

আমরা অনেক রকম আশ্চর্য ঘটনার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এমন ব্যাপার আর কখনো শুনি নাই। এ ঘটনাগুলি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সে বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা স্বয়ং ঘটনাস্থলে গিয়া সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। যাহাদের বিশ্বাস হইবে না, তাঁহারাও নিজেরা দেখিয়া আসিতে পারেন।'

শব্দ ও ঠাণ্ডা বাতাস

খবরের কাগজখানা টেবিলের উপরে রেখে কমল খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

বিনয়বাবু তার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, 'সমস্ত পড়লে তো?'

কমল বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী বুঝলে?'

'ঘটনাগুলো যদি সত্যি হয়, তাহলে এ সব ভুতুড়ে ব্যাপার বলে মানতে হবে বৈকি!'

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'প্রথমত, আমি ভূত মানি না। দ্বিতীয়ত, ভূতে যে একদল খালাসি সমেত স্টীমার, ইঞ্জিন আর একদল বানর শুদ্ধ বটগাছ একেবারে বেমালুম হজম করে ফেলতে পারে এমন গল্প কখনো গাঁজাখোরের মুখেও শোনা যায় না।'

কমল বললে, 'তবে কি এ সমস্ত আপনি মানুষের কাজ বলে মনে করেন?'

বিনয়বাবু বললেন, 'মানুষ! মানুষের সাধ্য নেই যে ঘাসের গোছার মত দেড়শো বছরের বটগাছ উপড়ে ফেলবে, খেলার পুতুলের মতন স্টীমার বা ইঞ্জিন তুলে নিয়ে যাবে। বিশেষ, তাহলে ঐ বটগাছ, স্টীমার বা ইঞ্জিনের কোন-না-কোন খোঁজ নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। এই ইংরেজ রাজত্বে একখানা ছোট গয়না কেউ চুরি করে লুকিয়ে রাখতে পারে না, আর অত বড় বড় মালের যে কোন পাত্তাই মিলছে না, তাও কি কখনো সম্ভব হয়? স্টীমারের খালাসিরা আর গাছের বানরগুলোই বা কোথায় যাবে? তারপর, এই শব্দ আর ঠাণ্ডা বাতাস। এরই বা হদিশ কী? কেন শব্দ হয়, কেন ঠাণ্ডা বাতাস বয়?'

কমল বললে, 'তাহলে আপনি কী মনে করেন? এসব যদি ভূত বা মানুষের কাজ না হয়—'

বিনয়বাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'কমল, ভূত কি মানুষের কথা এ সম্পর্কে একেবারে ভুলে যাও। এ এক এমন অজ্ঞাত শক্তির কাজ, আমাদের পৃথিবীতে যার তুলনা নেই। সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা যে শক্তির সন্ধানের জন্যে এতকাল ধরে চেষ্টা করছেন, আমাদের বাংলা দেশেই তার প্রথম লীলা প্রকাশ পেয়েছে।... কমল, তুমি জান না, আমার মনে কী আনন্দ হচ্ছে!'

কমল কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চুপ করে থেকে বললে, 'বিনয়বাবু, আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! আপনি কী বলতে চান?'

বিনয়বাবু কয় পা এগিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন তারপর খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কমল, আজ বৈকালেই আমি বিলাসপুরে রওনা হব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে?'

কমল বললে, 'আমরা সেখানে গিয়ে কী করব?'

বিনয়বাবু বললেন, 'ভয় পেও না। ভয় পেলে মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মর্যাদা রাখতে পারে না। বিলাসপুরে যেসব ঘটনা ঘটছে তা এক আশ্চর্য আবিষ্কারের সূচনা মাত্র। শীঘ্রই এর চেয়ে বড় বড় ঘটনা ঘটবে, আর তা ঘটবার আগেই আমি ঘটনাক্ষেত্রে হাজির থাকতে চাই।'

কমল বললে, 'বিনয়বাবু, আমি ভয় পাইনি। আমি খালি বলতে চাই যে, পুলিশ যেখানে বিফল হয়েছে, আমরা সেখানে গিয়ে কী করব?'

বিনয়বাবু বললে, 'পুলিশ তো বিফল হবেই, এ রহস্যের কিনারা করবার সাধ্য তো পুলিশের নেই। বাংলা দেশে এখন একমাত্র আমিই এ ব্যাপারের গুপ্ত কথা জানি—আমার এতদিনের আলোচনা কি ব্যর্থ হতে পারে? এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও। আমার সঙ্গে আজ কি তুমি বিলাসপুরে যাবে?'

কমল বললে, 'যাব।'

নতুন পরিচয়

বিনয়বাবু আর কমল যখন বিলাসপুরে গিয়ে হাজির হলেন, তখন বিকাল বেলা।

বিনয়বাবু বললেন, 'কমল এখানে আমার এক বন্ধুর বাড়ী আছে। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উঠলে পরে তিনি আমাদের খুব আদর-যত্ন করবেন বটে, কিন্তু কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ গিয়ে পড়লে তাঁর অসুবিধে হতে পারে।'

কমল বললে, 'কিন্তু সেখানে না গিয়েও তো উপায় নেই। রাত্রে একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই তো দরকার।'

বিনয়বাবু হেসে বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমরা কি আর মাঠে শুয়ে রাত কাটাব? এখানে ডাকবাংলো আছে; সেখানে আজকের রাত কাটাতে তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'

কমল বললে, 'কিছু না। বরং অচেনা লোকের বাড়ীর চেয়ে ডাকবাংলোই ভালো।'

স্টেশনের কাছেই ডাকবাংলো। দু'জনে ডাকবাংলোর হাতার ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই সেখানকার চাকর এসে তাঁদের সেলাম করলে।

বিনয়বাবু বললেন, 'এ বাংলো কি তোমার জিম্মায় আছে?'

সে বললে, 'হ্যাঁ, কর্তা-বাবু।'

'তোমার নাম কী?'

'আজ্ঞে, অছিমুদ্দি।'

'দেখ অছিমুদ্দি, আজ আমরা এখানে থাকব। এই ব্যাগটা তোমার কাছে রাখ, আর আমাদের দু'জনের জন্যে রাত্রের খাবারের ব্যবস্থা কর—মুর্গির ঝোল চাই, বুঝলে? এই নাও টাকা। আমরা ততক্ষণে একটু ঘুরে আসি।'

বিনয়বাবু কমলের হাত ধরে বাংলোর হাতা থেকে আবার বেরিয়ে পড়লেন।

কমল বললে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, বিনয়বাবু?'

বিনয়বাবু বললেন, 'শীতলার মন্দিরে। বটগাছের ব্যাপারটা সত্যি কি না, আগে দেখে আসা দরকার।'

বিনয়বাবু বিলাসপুরে আগেও বারকয়েক এসেছিলেন, কাজেই পথ-ঘাট তাঁর জানা ছিল। মিনিট পাঁচেক পরেই তাঁরা শীতলার মন্দিরের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বিনয়বাবু বললেন, 'কমল, সত্যিই তো বটগাছটা নেই দেখছি! সে গাছটা আগেও আমি দেখেছি,—প্রকাণ্ড গাছ। শিবপুরের বোটা-

নিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত বটগাছ দেখেছ তো? এ গাছটি তার চেয়ে কিছু ছোট হলেও এত-বড় গাছ বাংলা দেশে আর কোথাও দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। অথচ দেখ, সেই গাছের বদলে এখন শুধু একটা গর্ত রয়েছে।'

কমল অবাক হয়ে দেখলে, তার সামনে মস্ত বড় একটা গর্ত—তার ভিতরে অনায়াসে শতাধিক মানুষকে কবর দেওয়া যায়। বট-গাছটা যে কত বড় ছিল কমল এতক্ষণে তা আন্দাজ করতে পারলে। অথচ এত বড় একটা গাছকেই সকলের অজান্তে রাতারাতি উড়িয়ে নিয়ে গেছে! মানুষের পক্ষে এমন কাজ অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব!

মন্দিরের ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল।

বিনয়বাবু এগিয়ে গিয়ে তাঁকে একটি প্রণাম করে বললেন, 'আপনি বোধহয় এই শীতলা-দেবীর সেবাইত?'

'হ্যাঁ, বাবা!'

'এখানে নানারকম আশ্চর্য কাণ্ড-কারখানা হচ্ছে শুনে আমরা কলকাতা থেকে দেখতে এসেছি। আচ্ছা, যে রাতে বটগাছটি অদৃশ্য হয়, সে রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?'

'এই মন্দিরের পাশেই আমার ঘর। আমি এইখানেই ছিলুম।'

'অথচ কিছুই টের পাননি?'

'টের যে ঠিক পাইনি, তা নয়; তবে আসল ব্যাপারটা তখন বুঝতে পারিনি।'

'কী রকম?'

'অনেক রাতে হঠাৎ কি-রকম একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তার পরেই ঝড়ে গাছ দোলার মত আওয়াজ শুনলুম—সঙ্গে সঙ্গে একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা জানলা দিয়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল, আর বটগাছের বাঁদরগুলো কাৎরে চ্যাঁচাতে লাগল। ঝড় উঠেছে ভেবে তাড়াতাড়ি আমি জানলা বন্ধ করে দিলুম—তার পরেই সব চুপচাপ। সকালে উঠে দেখি, বটগাছটা আর নেই।'

'তাহলে আপনি কি মনে করেন যে, ঝড় এসেই বটগাছটিকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে?'

'না, না, তা কী করে হবে? এত-বড় বটগাছ উড়িয়ে নিয়ে যাবে, এমন প্রচণ্ড ঝড় উঠলে গাঁয়ের ভিতরে নিশ্চয়ই আরো অনেক গাছপালা তছনছ হত, অনেক ঘর-বাড়ী পড়ে যেত। কিন্তু আর কোথাও কিছু হল না, উড়ে গেল শুধু এই বটগাছটা?'

'তাহলে আপনি কি বলতে চান যে—'

লোকটি বাধা দিয়ে বললে, 'আমি আর কিছু বলতে চাই না বাবা, এসব কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতেও আমার ভয় হয়,'—বলতে বলতে সে আবার মন্দিরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিনয়বাবু ফিরে বললেন, 'চল কমল, আমরা একবার গাঁয়ের ভিতরটা ঘুরে আসি।'

দু-জনে আবার অগ্রসর হলেন। বিলাসপুর গ্রামখানি বেশ বড়—তাকে শহর বললেও চলে। পথে পথে ঘুরে, নানা লোককে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেও বিনয়বাবু আর কোন নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারলেন না। তবে এটুকু বেশ বোঝা গেল, খবরের কাগজের কোন কথাই মিথ্যা নয়।

সন্ধ্যার মুখে তাঁরা যখন আবার ডাকবাংলোর দিকে ফিরলেন, তখন বিনয়বাবু লক্ষ্য করলেন যে, গ্রামখানি এর মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। পথে আর মানুষ নেই, অধিকাংশ ঘর-বাড়ীরই দরজা-জানলা বন্ধ। এখানকার বাসিন্দারা যে খুব বেশী ভয় পেয়েছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

বাংলোর বারান্দায় উঠে বিনয়বাবু দেখলেন, সেখানে দুটি যুবক দু-খানা চেয়ারের উপর বসে আছে। তার মধ্যে একটি যুবকের দেহ যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না যে, তার দেহে অসুরের মতন ক্ষমতা।

তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সেই লম্বা-চওড়া যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করে বললে, 'আজ বৈকালে

আপনারাই কি এসেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমরাও আজ এখানে আপনাদের সঙ্গী হতে চাই। আপনার কোন আপত্তি নেই তো ?'

'না, না, আপত্তি আবার কিসের ? বেশ তো একসঙ্গে সবাই মিলে থাকা যাবে। আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?'

'কলকাতা থেকে। খবরের কাগজে একটা ব্যাপার পড়ে দেখতে এসেছি।'

'ও, তাহলে আপনারাও আমাদেরই দলে ? আমরাও ঐ উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। আপনাদের নাম জানতে পারি কি ?'

'আমার নাম শ্রীবিমলচন্দ্র রায়, আর আমার ঐ বন্ধুটির নাম শ্রীকুমারনাথ সেন।'

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমলবাবু, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তো ?'

বিমল বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার চাকর রামহরিকে বাজারে পাঠিয়েছি, ঐ যে, সে ফিরছে।' চ্যাঙারি হাতে করে একটি লোক বাগান থেকে বারান্দায় এসে উঠল, তার সঙ্গে এল ল্যাজ নাড়তে নাড়তে প্রকাণ্ড একটা কুকুর।

বিনয়বাবু বললেন, 'ও কুকুরটা কার ? কামড়াবে না তো ?'

কুমার বললে, 'না, না, কামড়াবে না, বাঘা বড় ভালো কুকুর।'

কমল এতক্ষণ চুপ করে কথাবার্তা শুনছিল। এখন সে বললে, 'বিমলবাবু, আপনাদের নাম আর ঐ কুকুরের নাম শুনে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।'

বিমল বললে, 'কী কথা ?'

কমল একটু ইতস্তত করে বললে, ' "যকের ধন" বলে আমি একটা উপন্যাস পড়েছিলুম, তাতেও বিমল, কুমার, রামহরি আর বাঘা কুকুরের নাম আছে। কী আশ্চর্য মিল।'

বিমল একবার কুমারের মুখের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হেসে

বললে, 'মিল দেখে আশ্চর্য হবেন না। আমরা সেই লোকই বটে।'

বিস্ময়ে হতভম্বের মত কমল হাঁ করে খানিকক্ষণ বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে রইল ; তারপর বলে উঠল, 'তাও কি সম্ভব ?'

বিমল তেমনি হাসি-মুখে বললে, 'সম্ভব নয় কেন ?'

কমল বললে, 'তারা হচ্ছে উপন্যাসের লোক, আর আপনারা যে সত্যিকারের মানুষ।'

বিমল বললে, "যকের ধন" যে সত্যিকারের ঘটনা ; তা মিথ্যা বলে ভাবছেন কেন ?'

'সত্যি ঘটনা। তাহলে আপনারা কি সত্যি-সত্যিই খাসিয়া পাহাড়ের বৌদ্ধমঠে গিয়েছিলেন ?'

'নিশ্চয়। কিন্তু সে আজ পাঁচ-ছয় বছর আগেকার কথা, সেসব বিপদের কথা এখন আমাদের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়।'

পুকুর চুরি

খাওয়া-দাওয়ার পর বিনয়বাবু 'যকের ধনে'র গল্পটি বিমলের মুখ থেকে আগাগোড়া শ্রবণ করলেন। তারপর আশ্চর্য স্বরে বললেন, 'আপনারা এই বয়সেই এমন-সব বিপদের মধ্যে পড়েও বেঁচে আছেন। ধন্য।'

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, বিপদ আমি ভালবাসি, বিপদকে আমি খুঁজে বেড়াই ; আর আজ এই বিলাসপুরেও আমরা এসেছি নতুন কোন বিপদেরই সন্ধানে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'আপনারা সাহসী লোক বটে।'

কুমার বললে, 'কিন্তু এখানে এই যে সব ঘটনা ঘটছে, আমরা তো তার কোন হদিশ খুঁজে পাচ্ছি না। এসব কি ভুতুড়ে কাণ্ড ?'

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না। তবে, আমার সন্দেহ যদি সত্য হয়, তাহলে—'

বিমল অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনি কী সন্দেহ করেন বিনয়বাবু?'

বিনয়বাবু বললেন, 'এখন বলব না, আরো দু-চারটে প্রমাণ দরকার, নইলে আপনারাই হয়ত বিশ্বাস করবেন না। অনেক রাত হল, আসুন—এবারে নিদ্রালোকে গমন করা যাক।'

গভীর রাত্রে হঠাৎ একসঙ্গে সকলের ঘুম ভেঙে গেল।

কমল লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'উঃ, কী শীত!'

কুমার বললে, 'জানলা দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া আসছে—বাইরে ঝড় উঠেছে,'—বলেই সে উঠে পড়ে জানলা বন্ধ করে দিতে গেল।

বিনয়বাবু বললেন, 'দাঁড়ান কুমারবাবু, জানলা বন্ধ করবেন না।'

'ঝড় উঠেছে যে!'

'না, ঝড় ওঠেনি, দেখছেন না, বাইরে ফুটফুটে চাঁদের আলো!'

'তবে ও শব্দ কিসের?'

সকলে কান পেতে শুনলে, বাইরে থেকে একটা অদ্ভুত-রকম শব্দ আসছে—যেন কারা লক্ষ-লক্ষ পেন্সিল ঘর্ষণ করছে।

বিনয়বাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ও ঝড়ের শব্দ নয়।'

বিমল বললে, 'তবে?'

'সেই রহস্যই তো জানতে চাই,' বলেই বিনয়বাবু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঘা ঘরের ভিতর থেকে এক লাফে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সকলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। চারিদিকে পরিষ্কার চাঁদের আলো, আকাশে মেঘের নামমাত্র নেই। তবে ঝড়ের মতন ঠাণ্ডা-হাওয়া বইছেই বা কেন, আর ঐ রহস্যময় শব্দটাই বা আসছে কোত্থেকে?

বিনয়বাবু বললেন, 'শব্দটা হচ্ছে উপর দিকে।'—তাঁর কথা শেষ হতে-না-হতেই খানিক তফাত থেকে হঠাৎ মানুষের তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল—তার পরেই কুকুরের চীৎকার।

কুমার বললে, 'এ যে বাঘার গলা!'

রামহরি বললে, 'বাঘা বোধহয় কারুকে কামড়ে ধরেছে।'

মানুষ আর কুকুরের চীৎকার আরো বেড়ে উঠল।

কুমার বললে, 'না রামহরি, বাঘা কারুকে কামড়ায়নি,—তার চীৎকার শুনে মনে হচ্ছে, সে যেন ভয়ানক ভয় পেয়েছে!'

বিমল বললে, 'চল, চল, এগিয়ে দেখা যাক!

যেদিক থেকে সেই মানুষ আর কুকুরের আর্তনাদ আসছে, সকলে বেগে সেইদিকে ছুটে গেল। কিন্তু কই, কোথাও তো কিছুই নেই!

আর্তনাদ তখনো হচ্ছে, কিন্তু অতি অস্পষ্ট—যেন অনেক দূর থেকে আসছে।

কুমার চেঁচিয়ে ডাকলে—'বাঘা, বাঘা, বাঘা! কোথায় বাঘা?

বিনয়বাবু উপর-পানে হাত তুলে বললেন, 'আকাশে!'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো! আকাশ থেকেই তো আর্তনাদ আসছে, এ কী কাণ্ড।'

রামহরি বললে, 'রাম, রাম, রাম, রাম! বাঘাকে পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে!'

কুমার কাতরভাবে বললে, 'আমার এতদিনের কুকুর।'

সকলে সভয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিনয়বাবু বললেন, 'ঐ যেন কী দেখা যাচ্ছে না?

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক যেন দুটো কালো ফোঁটা···ঐ যাঃ, মিলিয়ে গেল!'

বিনয়বাবু আরো আশ্চর্য ব্যাপার দেখলেন,—আকাশের বুকে ছায়ার মত অস্পষ্ট কি-একটা প্রকাণ্ড জিনিস। কিন্তু সে ব্যাপার আর প্রকাশ না করে তিনি শুধু বললেন, 'আর সেই শব্দ নেই, আর্তনাদও শোনা যাচ্ছে না—ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে না।'

কমল বললে, 'এমন ব্যাপারের কথাও তো কখনো শুনিনি!

এর মানে কী বিনয়বাবু? আপনি কি এখনো বলতে চান যে, এসব ভৌতিক কাণ্ড নয়?'

বিনয়বাবু কোন জবাব দিলেন না, ঘাড় হেঁট করে কি ভাবতে লাগলেন।...খানিকক্ষণ পরে পথের পাশে তাকিয়ে সচমকে তিনি বললেন, 'ও কী ও!'

সকলেই সেদিকে তাকালে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না। পথের পাশে খালি পুকুর রয়েছে, কিন্তু তার জল প্রায় সমস্তই শুকিয়ে গিয়েছে।

বিনয়বাবুকে তখনো বিস্ফারিত চোখে সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিমল জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কী দেখছেন বিনয়বাবু?'

বিনয়বাবু বললেন, 'ঐ পুকুরটা!'

বিমল কিছুই বুঝতে না পেরে বললে, 'হ্যাঁ, পুকুরে জল নেই; তাতে কী হয়েছে?'

বিনয়বাবু বললেন, 'কিন্তু আজ বৈকালে আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে ঐ পুকুরটার কাণায় কাণায় জল টলমল করছে!'

বিনয় বললে, 'আপনি ভুল দেখেছেন!'

'না, আমি ঠিক দেখেছি।'

'তাহলে এর মধ্যে এক-পুকুর জল কোথায় গেল?

'ঐ আকাশে!'

এই অদ্ভুত উত্তরে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বিমল বললে, 'এক-পুকুর জল আকাশে উড়ে গেছে? না, না, এটা একেবারেই অসম্ভব!'

বিনয়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'কাল সকালে আমি সব কথা খুলে বলব। তখন আপনারা বুঝতে পারবেন, এর মধ্যে কিছুই অসম্ভব নেই। এখন ডাকবাংলোয় ফিরে যাওয়া যাক।'

কুমার মলিন মুখে বললে, 'কিন্তু আমার বাঘা?'

বিনয়বাবু বললেন, 'সে আর ফিরবে না। শুধু বাঘা নয়,

আমরা মানুষের আর্তনাদও শুনেছি, একজন মানুষও নিশ্চয় বাঘার সঙ্গী হয়েছে।'

বিনয়বাবুর কথাই সত্য। পরদিন শোনা গেল, বিলাসপুরের একজন রাতের চৌকিদারের কোনই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা

বিমল বললে, 'দেখুন বিনয়বাবু, আপনি আমাদের চেয়ে বয়সে ঢের বড়। কাজেই এবার থেকে "তুমি" বলেই ডাকবেন।'

বিনয়বাবু হেসে বললেন, 'আচ্ছা বিমল, তাই হবে।'

বিমল বললে, 'তাহলে এইবারে এখানকার আশ্চর্য ব্যাপারের গুপ্ত কথা আমাদের কাছে খুলে বলুন।'

বিনয়বাবু খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'দেখ আমি যা বলব, তা শুনলে তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা, জানি না। কিন্তু বিশ্বাস কর আর নাই কর, এটুকু নিশ্চয়ই জেনো যে, আমি একটিও মন-গড়া বাজে কথা বলব না, কারণ আমার প্রত্যেক কথাটিই বিজ্ঞানের মতে সত্য বলে প্রমাণ করা শক্ত হবে না। এমন কি, যুরোপ-আমেরিকার বড়-বড় পণ্ডিত আর বৈজ্ঞানিকরা এই বিষয় নিয়ে এখন যথেষ্ট মাথা ঘামাচ্ছেন। আমিও এই বিষয় নিয়ে আজ অনেক বৎসর ধরে আলোচনা করে আসছি—'

বিমল বাধা দিয়ে বললে, কিন্তু এখানকার এইসব অলৌকিক কাণ্ডের সঙ্গে বিজ্ঞানের কী সম্পর্ক থাকতে পারে, বিনয়বাবু?'

বিনয়বাবু হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বললেন, 'বিমল ভায়া, এত অল্পেই ব্যস্ত হয়ে উঠো না। আগে মন দিয়ে আমার কথা শোন···তোমরা জান তো, সোম, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি অনেক গ্রহ আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আর এও জানি যে, আমাদের পৃথিবীও একটি গ্রহ। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যে গ্রহ আছে, তার নাম মঙ্গল বা মার্স।'

'হুঁ। য়ুরোপ-আমেরিকার বড় বড় মানমন্দিরে আজকাল এমন সব প্রকাণ্ড দূরবীন ব্যবহার করা হয় যে, ঐসব গ্রহ-উপগ্রহ হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও, আমাদের চোখের সামনে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অন্তত কোন কোন গ্রহে পৃথিবীর মত জীব বাস করে। এই সিদ্ধান্তের কারণও আছে। মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে বলে, দূরবীন দিয়ে তার ভিতরটাই বেশী করে দেখবার সুবিধে হয়েছে। পণ্ডিতেরা দেখেছেন যে মঙ্গল গ্রহের ভিতরটা প্রায় মরুভূমির মত, হয়ত প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে আর জলাভাবে সেখানে উদ্ভিদ জন্মানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই সঙ্গে আরো একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে। মঙ্গল গ্রহের মধ্যে শত শত ক্রোশ ব্যাপী এমন প্রকাণ্ড খাল আছে, যার তুলনা পৃথিবীতেও নেই। সে খাল আবার এমন সোজাসুজি কাটা যে, তা কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারে না।

বিমল অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে বললে, 'অর্থাৎ সে খাল কৃত্রিম?'

'হ্যাঁ। আর এইখানেই একটা মস্ত আবিষ্কারের সূত্রপাত। আরো দেখা গেছে, সে খাল যত দূর অগ্রসর হয়েছে ততদূর পর্যন্ত দু-পাশের জমি সবুজ—অর্থাৎ গাছপালায় ভরা। এখন বুঝে দেখ, কৃত্রিম খাল কখনও আপনা-আপনি প্রকাশ পায় না। নিশ্চয়ই তা মানুষ বা মানুষের মত কোন জীবের হাতে কাটা। আর এমন এক মরুভূমির মতন দেশে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শত শত ক্রোশ ব্যাপী কৃত্রিম খাল কেটে, চাষ-আবাদ করে যে জীব বেঁচে আছে, তারা যে খুব চালাক ও সভ্য, তাতেও আর কোনই সন্দেহ নেই।'

কমল বললে, 'বিনয়বাবু, এসব কথা আপনার মুখে আমি

আরো অনেকবার শুনেছি। কিন্তু বিলাসপুরের এই ভুতুড়ে কাণ্ডের সঙ্গে আপনি মঙ্গল গ্রহকে টেনে আনছেন কেন?'

বিনয়বাবু বললেন, 'ক্রমে বুঝবে, আগে সব শোন। বৎসরের একটা ঠিক সময়ে, মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর অনেকটা কাছে আসে। কিছুদিন আগে কলকাতার সমস্ত খবরের কাগজে তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ যে, পৃথিবীর বড় বড় বেতারবার্তা পাঠাবার স্টেশনে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। বেতারযন্ত্রে এমন সব অদ্ভুত বার্তার সঙ্কেত এসেছিল, যার অর্থ কেউ বুঝতে পারেনি। সেসব সঙ্কেত কোথা থেকে আসছে, তাও জানা যায়নি। ঠিক সেই সময়েই কিন্তু মঙ্গল গ্রহ এসেছিল পৃথিবীর খুব কাছেই। কাজেই বৈজ্ঞানিকরা স্থির করতে বাধ্য হলেন যে, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারাই পৃথিবীর লোকের সঙ্গে কথা কইবার জন্যে বেতার-বার্তা পাঠাচ্ছে। কিন্তু তাদের বার্তার সঙ্কেত আলাদা বলেই আমরা তা বুঝতে পারি না।'

বিমল বললে, 'আজ্ঞে, হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে বটে, কিছুদিন আগে এমনি একটা ব্যাপার নিয়ে খবরের কাগজে মহা আন্দোলন চলেছিল।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তাহলে সংবাদপত্রে আরো একটা খবর তোমরা পড়েছ বোধহয়? আমেরিকার একজন সাহসী বৈজ্ঞানিক রকেটে চড়ে মঙ্গল গ্রহে যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন?'

কুমার আশ্চর্য স্বরে বললে, 'রকেটে চড়ে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এ তোমাদের সাধারণ বাজিওয়ালার হাতে তৈরী ছেলেখেলার রকেট নয়—তার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বড়। তার মধ্যে মস্ত এক ধাতু-তৈরী ঘর থাকবে, সে ঘরে থাককেন সেই সাহসী বৈজ্ঞানিক। উপরের ঘরের তলায় থাকবে বারুদের ঘর। মঙ্গল গ্রহ যে সময়ে পৃথিবীর কাছে আসবে, সেই সময়ে এই রকেট ছোঁড়া হবে। বায়োস্কোপের এক অভিনেতা একটি মাঝারি আকারের রকেটে চড়ে পৃথিবীর এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় নিরাপদে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, এ ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব নয়।'

বিমল বললে, 'কিন্তু এ থেকে কী প্রমাণিত হচ্ছে?'

'এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মঙ্গল গ্রহ আর পৃথিবীর বাসিন্দারা পরস্পরের পরিচয় জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এখন আমি যদি বলি যে, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা আমাদের চেয়ে আরো কিছু বেশি অগ্রসর হয়েছে, অর্থাৎ তারা ইতিমধ্যেই পৃথিবী থেকে নানা নমুনা নিয়ে যেতে সুরু করেছে, তাহলে কি অত্যন্ত অবাক হবে?'

বিমল, কুমার আর কমল একসঙ্গে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'অ্যাঁ, বলেন কী,—বলেন কী?'

বিনয়বাবু দৃঢ় স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, বিলাসপুরে এই যে সব অলৌকিক কাণ্ড হচ্ছে তা মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের কীর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীর যা কিছু দেখেছে, পরীক্ষা করবার জন্যে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে।'

বিমল রুদ্ধশ্বাসে বললে, 'কিন্তু কী উপায়ে?'

'উপায়ের কথা আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারছি না বটে, তবে আমি যা আন্দাজ করেছি, সেটা সম্ভব হলেও হতে পারে।... আমাদের জানা আছে যে পৃথিবীর উপরে মাইল-কয়েক পর্যন্ত বাতাসের অস্তিত্ব, তার পরে আর বাতাস নেই, আছে কেবল শূন্য। এই শূন্যের মধ্যে অন্য অন্য যেসব গ্রহ ঘুরছে, তাদের মধ্যে হয়ত পৃথিবীর মত বায়ু-মণ্ডল আছে। কিন্তু পৃথিবী থেকে অন্য গ্রহে, কিংবা অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবীতে যেতে আসতে হলে বায়ুহীন শূন্য পার হতে হবে। আমার বিশ্বাস, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা ডুবোজাহাজের মত এয়ার-টাইট বা ছিদ্রহীন এমন কোন ব্যোমযান তৈরী করেছে, যার ভিতরে দরকার-মত বাতাসের কিংবা অক্সিজেন বাষ্পের ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যোমযান চড়ে শূন্য পার হয়ে তারা পৃথিবীর আবহাওয়াতে এসে হাজির হয়েছে।...কাল রাত্রে যখন এখানকার চৌকিদার আর বাঘা আর্তনাদ করেছিল আকাশের দিকে চেয়ে তখন আমি লক্ষ্য করেছিলুম,—অনেক উঁচুতে চাঁদের আলোর মাঝখানে

প্রকাণ্ড কি একটা ছায়ার মত ভাসছে—খানিক পরেই আবার তা মিলিয়ে গেল। আমার বিশ্বাস সে ছায়া আর কিছু নয়—মঙ্গল গ্রহের ব্যোমযান।'

খানিকক্ষণ সকলেই অভিভূতের মতন স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল। বিনয়বাবু যা বললেন, কেউ তা স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি। অবশেষে বিমল বললে, 'কিন্তু আমরা মঙ্গল গ্রহের কোন লোককে তো দেখতে পাইনি! তবে বিলাসপুর থেকে স্টীমার, ইঞ্জিন, বটগাছ, পুকুরের জল আর জীবজন্তু কেমন করে অদৃশ্য হচ্ছে?'

বিনয়বাবু বললেন, 'এ প্রশ্নের নির্ভুল জবাব দেওয়া শক্ত; তবে ঐ রহস্যময় ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রবাহের জন্য আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে। তোমরা কেউ Vacuum Cleaner দেখেছ?'

কুমার বললে, 'হ্যাঁ শিয়ালদহ স্টেশনে দেখেছি। একটি যন্ত্রের সঙ্গে লম্বা নল আছে। সেই নলের মুখ ধুলোর উপরে ধরে যন্ত্র চালালেই ভিতর থেকে হু-হু করে হাওয়া বেরিয়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধুলো নলের ভিতর ঢুকে পড়ে। এই উপায়ে খুব সহজেই ধুলো সাফ করা যায়।'

বিনয়বাবু বললেন, 'খুব সম্ভব মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা এইরকম কোন যন্ত্রের সাহায্যেই পৃথিবীর উপরে অত্যাচার করছে। তবে তাদের এই Vacuum যন্ত্রটি এত বড় ও শক্তিশালী যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্টীমার, ট্রেন ও বটগাছ, এমন কি একপুকুর জল পর্যন্ত তা অনায়াসে শুষে গিলে ফেলতে পারে! আচমকা ঠাণ্ডা হাওয়া বইবার আর কোন কারণ তো আমার মাথায় আসছে না। যন্ত্রটি যখন বায়ুশূন্য হয়, সেই সময়েই চারিদিকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগে। এই আমার মত।'

কুমার শোকাচ্ছন্ন স্বরে বললে, 'তাহলে আমার বাঘাকে আর কখনো ফিরে পাব না?'

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে জানালেন, 'না।'

বিমল চিন্তিতভাবে বললে, 'বিনয়বাবু, জানি না আপনার কথা সত্য কিনা। কিন্তু আপনার যুক্তি শুনলে এসব ব্যাপার অবিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হয় না। আচ্ছা, এবিষয় নিয়ে আপনি যখন এত আলোচনা করছেন, তখন বলতে পারেন কি, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের চেহারা কিরকম? তারা কি মানুষেরই মত দেখতে?

বিনয়বাবু বললেন, 'তা কী করে বলব? তবে তাদের মস্তিষ্ক যে খুব উন্নত, তারা যে যথেষ্ট সভ্য, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানেও খাটো নয়, তাদের কাজ দেখে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। পৃথিবীর অবস্থা, জল-মাটি আবহাওয়া আর জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রণালী অনুসারেই আমাদের চেহারা এ-রকম হয়েছে; মঙ্গল গ্রহের ভিতরকার অবস্থা যদি অন্যরকম হয়, তবে সেখানকার জীবেরা মানুষের চেয়ে বেশি সভ্য আর বুদ্ধিমান হলেও, তাদের চেহারা অন্যরকম হওয়াই সম্ভব।'

বিমল কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললে, 'এবার থেকে এখানে বন্দুক না নিয়ে আমি পথে বেরুব না।'

'কেন?'

দাঁতে দাঁত চেপে বিমল বললে, 'যদি সুবিধে পাই, বুঝিয়ে দেব যে, মানুষ বড় নিরীহ জীব নয়!'

আকাশ থেকে মাংস বৃষ্টি

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বিনয়বাবুর সঙ্গে সকলে বেড়িয়ে বাংলোর দিকে ফিরছিল। গেল রাতের সেই প্রায় শুকনো পুকুরটার কাছে এসে বিনয়বাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পুকুরের দু-দিকে বাঁধা ঘাট,—কিন্তু জল নেমে যাওয়াতে ঘাটের সব-নিচের শেওলা-মাখা সিঁড়ির ধাপ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পুকুরের তলায় এখনো অল্প একটু জল চিকচিক করছে।

বিনয়বাবু যেন আপনা আপনি বললেন, 'যে যন্ত্র দিয়ে এত অল্প সময়ে অতখানি জল শুষে নেওয়া যায়, সে যন্ত্রটা না-জানি কী প্রকাণ্ড। খালি ঠাণ্ডা হাওয়া নয়, এই পুকুর-চুরি দেখেও আমার বিশেষ সন্দেহ হচ্ছে যে, যন্ত্রটি নিশ্চয়ই Vacuum। বিশেষ, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা যে এয়ার-টাইট ব্যোমযানে করে এসেছে, তার আকারও নিশ্চয় সামান্য নয়। নইলে তার ভিতরে স্টীমার, ইঞ্জিন, বটগাছ আর প্রায় একপুকুর জল থাকবার ঠাঁই হত না!'

হঠাৎ উপর থেকে কি কতকগুলো জিনিস ঝপাং করে পুকুরের ভিতরে পড়ল এবং কতকগুলো পড়ল পুকুরের পাড়ের উপরে। সকলে বিস্মিত চোখে উপরদিকে তাকিয়ে দেখলে—কিন্তু সেখানে কিছুই নেই। কেবল অনেক উঁচুতে আকাশের বুকে ছায়ার মত কি যেন একটা জেগে রয়েছে,—কিন্তু সেটা এত অস্পষ্ট যে, তার বিষয়ে জোর করে কিছু বলাও যায় না।

বিনয়বাবু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'হায়, হায়, কলকাতা থেকে আসবার সময় একটা ভাল দূরবীন যদি সঙ্গে করে আনতুম, তাহলে এখনি সব রহস্যের কিনারা হয়ে যেত!'

কমল বললে, 'কিন্তু আকাশ থেকে ওগুলো কী এসে পড়ল?'

বিমল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, খানিক তফাতেই রাঙা পিণ্ডের মতন কি একটা পড়ে রয়েছে। কিন্তু কাছে গিয়েই সে সভয়ে আবার পিছিয়ে এসে বলে উঠল, 'বিনয়বাবু!'

'কী বিমল, ব্যাপার কী?'

'এ যে মানুষের দেহ!'

'অ্যাঁ, বল কি!'

সকলেই সেই রাঙা পিণ্ডটার দিকে বেগে ছুটে গেল… সামনে সত্যই একটা রক্তমাখা মাংসের স্তূপ পড়ে রয়েছে, অনেক উঁচু থেকে পড়ার দরুন সেটা এমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে যে সহজে তা মানুষের দেহ বলে চেনাই যায় না। তবে, দেহের কোন-কোন অংশ এখন তার মনুষ্যত্বের অল্প-স্বল্প পরিচয় দিচ্ছে।…

কমল বললে, 'লোকটা বোধহয় মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজ থেকে পালিয়ে আসবার জন্যে লাফিয়ে পড়েছিল।'

কুমার একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আহা বেচারা।...আমার বাঘাও সেখানে আছে, না জানি সে কী করছে।'

কিন্তু বিনয়বাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই মাংস-পিণ্ডের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'না, এই দেহ যার, সে নিজে উপর থেকে লাফিয়ে পড়েনি।'

বিমল বললে, 'তবে?'

'লাফিয়ে পড়বার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল!'

'কী করে জানলেন আপনি?'

বিনয়বাবু মাংস-পিণ্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'দেখ, এই মড়াটার একটা হাত আর বুকের একটা পাশ এখনো থেতলে গুঁড়ো হয়ে যায়নি। ভালো করে চেয়ে দেখ দেখি,—কী দেখছ?'

বিমল হেঁট হয়ে পড়ে দেখতে লাগল। তারপর বললে, 'একি, এর দেহের উপরকার ছাল ছাড়িয়ে ফেলা হয়েছে!'

'খালি তাই নয়। বুকের আর হাতের উপরকার মাংসও ছুরি দিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে।'

'কেন বিনয়বাবু?'

'ভালো করে দেখলে তাও বুঝতে পারবে। দেখ না, মেডিকেল কলেজের ডাক্তারেরা ঠিক যেভাবে মড়া কাটে, এই দেহটার উপরেও ঠিক সেইভাবেই ছুরি চালানো হয়েছে। বিমল, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছে।'

'তার মানে?'

'তারা দেখতে চায়, মানুষ কোন্ শ্রেণীর জীব। হুঁ, এখন বুঝতে পারছি, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের চেহারা নিশ্চয়ই মানুষের মত নয়, কারণ তা যদি হত তাহলে মানুষের দেহ নিয়ে এভাবে পরীক্ষা করবার আগ্রহ তাদের নিশ্চয়ই থাকত না।...বিমল, কুমার, পৃথিবীতে সত্যই যে মঙ্গল গ্রহের ব্যোমযান এসেছে, আর

বিনয়বাবু বললেন, 'উপায় একটা করতেই হবে বৈকি! মানুষ এখনো টের পায়নি, তাদের মাথার উপরে কী বিপদের খাঁড়া ঝুলছে! আজ যে অত্যাচার খালি বিলাসপুরে হচ্ছে, দু-দিন পরে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

বিমল বললে, 'কিন্তু কী উপায় আপনি করবেন?'

বিনয়বাবু বললেন, 'তা আমি এখন বলতে পারি না। তবে, আজকেই আমি আমার মত একটি প্রবন্ধে খুলে লিখব, আর কাল তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করব। সকলকে আগে আসল ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া দরকার,—কারণ আমাদের মত দু-একজনের চেষ্টায় কোনই সুবিধা হবে না, এখন সকলকে একসঙ্গে মিলে-মিশে করতে হবে।'

কমল বললে, কিন্তু বিনয়বাবু, দেশের লোকে যদি আপনার কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেয়?'

'তাহলে তারা নিজেরাই মরবে। আমার যুক্তি আর এমন সব চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেও যদি কেউ বিশ্বাস না করে, তাহলে আমি নাচার। তবু আমার কর্তব্য আমি করে খালাস হব। এখন চল।'
সকলে বাংলোর দিকে ফিরল। যেতে যেতে মুখ তুলে বিমল দেখলে, আকাশের গায়ে সেই অদ্ভুত ছায়াটা এখনো জেগে আছে,—তবে আরো ছোট আরো অস্পষ্ট।

বিমল অবাক হয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল—না জানি এমন কী গভীর রহস্য ঐ বিচিত্র ছায়ার আড়ালে লুকানো আছে, যা শুনলে সারা পৃথিবীর বুক ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে যাবে!

বিখ্যাত হওয়ার বিপদ

পরদিনের সকালে খবরের কাগজ আসবামাত্র বিমল তাড়াতাড়ি সেখানি নিয়ে পড়তে বসল,—কারণ আজকেই বিনয়বাবুর প্রবন্ধটা প্রকাশ হবার কথা।

বিলাসপুরের স্টীমার ইঞ্জিন যে আকাশেই অদৃশ্য হয়েছে, উপর থেকে এই মড়ার আবির্ভাবে তোমরা বোধহয় সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারছ?'

বিমল, কুমার ও কমল কেউ কোন জবাব দিলে না; আজ এই চাক্ষুষ প্রমাণের উপর আর কোন সন্দেহ চলে না।

রামহরি বললে, 'কিন্তু বাবু, পুকুরের ভেতরেও যে এইসঙ্গে কি কতকগুলো এসে পড়েছে! সেগুলো কী, দেখবেন না?'

বিনয়বাবু ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, 'না রামহরি, আর দেখবার দরকার নেই। সেগুলোও হয়ত আর কোন অভাগার দেহ! মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা নিশ্চয় এদের হত্যা করেছে, তারপর পরীক্ষা শেষ করে দেহগুলোকে আবার পৃথিবীতে ফেলে দিয়েছে।'

রামহরি বললে, 'আপনার কথা শুনে তো বাবু আমি কিছুই ঠাউরে উঠতে পারছি না। আকাশে তো দেবতারা থাকেন, তবে কি দেবতারাই পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছেন?'—বলেই সে আকাশের দিকে মুখ তুলে দেবতাদের উদ্দেশে ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করতে লাগল।

বিমল রেগে বললে, 'রামহরি, এখান থেকে তুই বিদায় হ! এ সময়ে তোর বোকামি আর ভালো লাগে না।'

রামহরি বললে, 'চটো কেন খোকাবাবু? আমি তো আর তোমাদের মত ক্রিশ্চান নই, রামপাখির ঝোলও খাই না। ঠাকুর দেবতাকে ভক্তি করা আমি বোকামি বলে মনে করি না।'

বিমল আরো চটে বললে, 'বেশ, এবারে দেবতাদের সাড়া পেলেই তোকে সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব, আপাতত তুই মুখ বন্ধ কর।'

কুমার বললে, 'কিন্তু বিনয়বাবু, এ যে বড় ভয়ানক কথা! আপনার ঐ মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা পৃথিবী থেকে মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করবে, আর আমরা চুপ করে বসে তাই দেখব? তাদের বাধা দেবার কি কোন উপায় নেই?'

খবরের কাগজ খুলেই বিমল সর্বপ্রথমে দেখলে, বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—

বিলাসপুরের নূতন রহস্য !
আকাশ হইতে মানুষের মৃতদেহ পতন !

তারপর গতকল্য বিলাসপুরে যে ঘটনা ঘটেছিল এবং আমরা আগেই যার ইতিহাস দিয়েছি, তার বর্ণনা। তার পরেই আবার বড় বড় অক্ষরে—

বিশেষজ্ঞের বিচিত্র আবিষ্কার
মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা !
পৃথিবীর ভীষণ বিপদ।

শিরোনামার তলায় বিনয়বাবুর প্রবন্ধ। বিনয়বাবু কিছুমাত্র অত্যুক্তি না করে বেশ সরল ও সহজ ভাষায় আপনার মত ব্যক্ত করে গেছেন। তাঁর মতও আমরা আগেই প্রকাশ করেছি, সুতরাং এখানে আর তা উল্লেখ করবার দরকার নেই। প্রবন্ধের শেষে সম্পাদক লিখেছেন—বিনয়বাবু যে আশ্চর্য ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সহজে কল্পনায় আসে না। হয়ত অনেকেই তাঁহার কথাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু আমরা আপাততঃ তাঁহার মত সমর্থন করা ছাড়া উপায়ান্তর দেখিতেছি না। কারণ বিনয়বাবু বহু বৎসর আলোচনা চিন্তা ও বিচারের পর এবং চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব। মঙ্গল গ্রহে জীবের অস্তিত্ব যে বিনয়বাবুর মন-গড়া কথা, তাহাও নহে। য়ুরোপ আমেরিকার অনেক বড় বড় পণ্ডিত এ ব্যাপারটাকে সত্য বলিয়াই মানিয়া থাকেন। এমন কি বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কারক মার্কনি সাহেবও একবার মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং এটা বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বিনয়বাবুর মত যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া বিলাসপুরের আশ্চর্য

রহস্যের কিনারা করিবার আর কোন উপায়ও দেখিতেছি না। আসল কথা, এই গুরুতর ব্যাপার লইয়া এখন রীতিমত চিন্তা করা আবশ্যক। কারণ বিনয়বাবু পরিষ্কারভাবেই দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীর মাথার উপরে বিষম এক বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে,—সময় থাকিতে সাবধান না হইলে এ বিপদ আরো ভয়ানকরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।'

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, সম্পাদক আপনারই মত সমর্থন করেছেন।'

বিনয়বাবু বললেন, 'যার মাথায় এতটুকু যুক্তি আছে, তাকে আমার মত মানতেই হবে।'—এই বলে খবরের কাগজখানা নিয়ে তিনি পড়তে বসলেন।

বৈকালে ডাকবাংলোতে লোক আর ধরে না। স্থানীয় জমিদার, মোড়ল ও মাতব্বর ব্যক্তিরা বিলাসপুরের এবং আশপাশের গাঁয়ের লোকজনে ডাকবাংলোর ঘর থেকে বারান্দা পর্যন্ত ভরে গেল। কলকাতার অনেক খবরের কাগজের অফিস থেকেও সাহেব ও বাঙালী প্রতিনিধিরা এলেন। এ অঞ্চলের পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব ও দারোগা প্রভৃতি এসেও ঘরের একপাশে আসন সংগ্রহ করলেন। সকলেরই ইচ্ছা, বিনয়বাবুর সঙ্গে মঙ্গল গ্রহ নিয়ে আলোচনা করা।

বিনয়বাবুর প্রথমটা ভয় ছিল, লোকে তাঁর কথা বিশ্বাস করবে কিনা। কিন্তু এখন দেখলেন, তাঁর উল্টো বিপদ উপস্থিত। সকলের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে তাঁর প্রাণ যায় আর কি!

পুলিশ সাহেব খানিকক্ষণ বিনয়বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন, 'আচ্ছা বিনয়বাবু, আপনার সন্দেহ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের কী করা উচিত?'

সাহেব বললেন, 'রাত্রে গাঁয়ে সশস্ত্র সেপাই বসিয়ে রাখব কি?'

'কেন?'

'মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজ কাছে এলেই সিপাইরা বন্দুক ছুঁড়বে।'

বিনয়বাবু একটু ভেবে বললেন, 'পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কিন্তু এই উড়োজাহাজ কিরকম পদার্থ দিয়ে তৈরী তা তো আমি বলতে পারি না। বন্দুকের গুলিতে তার ক্ষতি হতেও পারে, না হতেও পারে।'

সন্ধ্যার পরে একে একে সবাই যখন বিদায় নিয়ে চলে গেল, বিনয়বাবু শ্রান্তভাবে বিছানার উপরে শুয়ে পড়লেন।

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'বিনয়বাবু, একদিনেই আপনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন!'

বিনয়বাবু হতাশ হয়ে বললেন, 'বিখ্যাত হওয়ার এত জ্বালা! আমার কী মনে হচ্ছে জানো বিমল? ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!'

বিমল বললে, 'ওরা আপনাকে ছেড়ে দিলে তো কেঁদে বাঁচবেন! কিন্তু ওরা যে আপনাকে ছাড়বেই না। আপনি এখন যেখানে যাবেন ওরাও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।'

'কেন, কেন?'

'কারণ আপনি এখন বিখ্যাত হয়েছেন।'

'বটে, বটে, তাই নাকি? তাহলে আমি অজ্ঞাতবাস করব।'

ওরা আবার আপনাকে খুঁজে বার করবে।'

বিনয়বাবু অত্যন্ত দুঃখিতভাবে বললেন, 'তাহলে আমাকে মঙ্গল গ্রহে যাত্রা করতে হবে। বিমল, এই এক দিনেই কথা কয়ে কয়ে আমার মুখে ব্যথা ধরে গেছে, আজ সারাদিন আমি একটুও *জিরুতে* পারিনি।'

শূন্যে

আজ সকাল থেকে ডাকবাংলোয় লোকের পর লোক আসছে—সারা দিনের মধ্যে বিনয়বাবু একটু হাঁপ ছাড়বারও ছুটি পেলেন না।

বৈকালে তিনি মরিয়া হয়ে বাংলো ছেড়ে পলায়ন করলেন—সঙ্গীদের কোন খবর না দিয়েই।

বিমল, কুমার, কমল ও রামহরি চারিদিকে খুঁজতে বেরুল, কিন্তু বিনয়বাবুকে কোথাও পাওয়া গেল না।

বিমল মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'তাইতো, সত্যি-সত্যিই তিনি দেশত্যাগী হয়ে গেলেন নাকি?'

রামহরি বললে, 'হয়তো এতক্ষণে তিনি নিজেই বাসায় ফিরেছেন।'

'দেখা যাক,' বলে বিমলও আবার বাংলোর পথ ধরল।

তখন সন্ধ্যে হয়েছে। সকলে যখন একটা বাঁশবনের পাশ দিয়ে আসছে—হঠাৎ তার ভিতরে একটা খড়মড় শব্দ শোনা গেল। বিলাসপুরে আজকাল একটা চিতাবাঘের উপদ্রব হয়েছে—বিমল তাড়াতাড়ি তাই তার বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলে। সেদিনের সেই ব্যাপারের পর থেকে বন্দুক না নিয়ে সে আর পথে বেরোয় না।

বন্দুক তোলবামাত্র বাঁশবনের ভিতর থেকে শোনা গেল—'বিমল ভায়া, সাবধান! যেন আমাকে শিকার করে ফেল না!'

কমল বলে উঠল, 'এ যে বিনয়বাবুর গলা!'

বিনয়বাবু হাসতে হাসতে বাঁশঝাড়ের এক পাশ থেকে বেরিয়ে এলেন।

বিমল আশ্চর্য স্বরে বললে, 'ওকি বিনয়বাবু, ওখানে আপনি কী করছিলেন!'

বিনয়বাবু বললেন, 'দিব্যি নিরিবিলি হে, ঘাসের ওপরে পরম আরামে শুয়ে ছিলাম।'

'যদি সাপে কামড়াত?'

'সাপে শুধু কামড়ায়, কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। উঃ, ডাকবাংলোয় আরো কিছুক্ষণ থাকলে আমি পাগল হয়ে যেতুম!… বিমল, বাংলো থেকে আপদগুলো এতক্ষণে বিদায় হয়ে গেছে কি?'

বিমল বললে, 'এতক্ষণে বোধহয় গেছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'দেখ বিমল, বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে আর একটা উপকারও হয়েছে। এখানে শুয়ে শুয়ে আমি একটা দৃশ্য দেখলুম।'

'কী দৃশ্য?'

'সামনেই মাঠের ওপরে গাঁয়ের ছেলেরা ফুটবল খেলছিল। আমি এইখানে শুয়ে অন্যমনস্কভাবে তাই দেখছিলুম। এমন সময় আকাশে হঠাৎ সেই ভয়ানক শব্দটা শুনলুম—যেন হাজার হাজার শ্লেটের ওপরে কারা হাজার হাজার পেন্সিল চালিয়ে যাচ্ছে!'

বিমল, কুমার ও কমল একসঙ্গে বলে উঠল, 'অ্যাঁঃ, দিনের বেলায়?'

বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ। এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের সাহস দিনে দিনে বেড়ে উঠছে। শীঘ্রই তারা আমাদের ওপরে অত্যাচার শুরু করবে।'

বিমল বললে, 'তারপর?'

'শব্দটা শুনেই আমি তো ধড়মড় করে উঠে বসলুম। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, সেই প্রকাণ্ড কালো ছায়াটা ঘুরতে ঘুরতে নিচে নেমে আসছে। মাঠের দিকে চেয়ে দেখলুম, ছেলেরা তখনো ফুটবল খেলা নিয়ে মত্ত—কিছুই তারা টের পায়নি। হঠাৎ ফুটবলটা লাথি খেয়ে খুব উঁচুতে উঠল…কিন্তু সেটা উপর দিকেই সমানে উঠে মিলিয়ে গেল, নিচে আর নেমে এল না। ছেলেরা তো অবাক।

তারপর আকাশপানে চেয়ে সেই কালো ছায়াটা দেখেই তারা ভয় পেয়ে যে যার বাড়ীর দিকে দৌড় মারলে।'

'আর সেই কালো ছায়াটা?'

'সেটা আর নিচের দিকে নামল না, আকাশের গায়ে এক জায়গাতেই দুলতে লাগল। সন্ধে পর্যন্ত যতক্ষণ চোখ চলে, আমি তাকে মাঠের উপরে ঐখানে দেখেছি'—বলে বিনয়বাবু আকাশের একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

সকলে সেইদিকে চেয়ে দেখলে, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না— আকাশ তখন অন্ধকার।

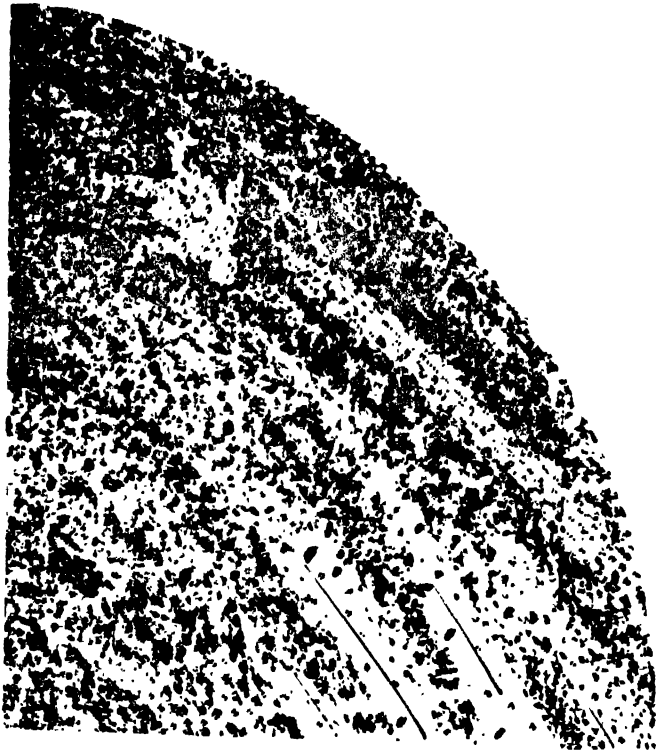
বিনয়বাবু বললেন, 'আজ আমি অনেকক্ষণ ধরে ছায়াটা—অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজখানা দেখবার সুবিধা পেয়েছি। যদিও সেটা অনেক উঁচুতে ছিল, তবু আমি আন্দাজেই বলতে পারি যে,



বিনয়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার!

উড়োজাহাজখানার আকার খুব প্রকাণ্ড—অন্তত মাইলখানেকের কম লম্বা তো হবেই না।'

রামহরি বললে, 'বাবু, আমার বুক কেমন ছম্‌ছম্ করছে।



আর এখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, বাসায় ফিরে চলুন, সেখানে গিয়ে কথাবার্তা কইবেন।'

এমন সময়ে দেখা গেল, গাঁয়ের ভিতর থেকে অনেকগুলো লণ্ঠন নিয়ে একদল লোক মাঠের উপরে এসে দাঁড়াল।

কুমার বললে, 'মিলিটারি পুলিশ, সকলের হাতেই বন্দুক রয়েছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'ছেলেদের মুখে খবর পেয়েই বোধহয় ওরা এইদিকে এসেছে। কিন্তু ওরা আর করবে কী, উড়োজাহাজ পর্যন্ত বন্দুকের গুলি তো পৌঁছবে না।'

ধীরে ধীরে আকাশের গায়ে তৃতীয়ার চাঁদ হাসিমুখে জেগে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দ শোনা গেল—হাজার হাজার প্লেটের

উপর হাজার হাজার পেন্সিলের শব্দ।

বিনয়বাবু বললেন, 'শব্দটা যে আগেকার চেয়েও আরো কাছে বলে মনে হচ্ছে।'

সকলে কান পেতে শুনতে লাগল—শব্দ আরো কাছে নেমে এল, আরো—আরো কাছে।

রামহরি ভীত স্বরে বললে, 'চলুন, চলুন—এইবেলা পালাই চলুন।'

শব্দ আরো কাছে। আচম্বিতে পাশের বাঁশ-ঝাড় ও গাছপালার মধ্যে ঝড় জেগে উঠল—কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড়।

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার।'

সঙ্গে সঙ্গে রামহরি, কুমার ও কমল আর্তনাদ করে উঠল।

বিনয়বাবু ও বিমল স্তম্ভিতের মতন দেখলেন, তারা তিনজনেই ছটফট করতে করতে তীরের মতন বেগে শূন্যে উঠে যাচ্ছে।...মাঠের দিক থেকে সেপাইদের অনেকগুলো বন্দুকের আওয়াজ এল।

পর-মুহূর্তে বিনয়বাবু ও বিমলের দেহও উপরের সেই সর্বগ্রাসী কালো ছায়ার দিকে প্রচণ্ড বেগে উড়ে গেল—চুম্বকের টানে লোহার মত।

সেপাইরা আবার একসঙ্গে বন্দুক ছুঁড়লে।

শূন্যে

কোথা দিয়ে কী যে হল, কেউ তা বুঝতে পারলে না।

বিনয়বাবু প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করেও রক্ষা পেলেন না, শূন্যের সেই অদৃশ্য শক্তির কাছে তাঁর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল, কি একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি হাওয়ার মুখে তুচ্ছ ছেঁড়া পাতার মত তিনি তীরের চেয়েও বেগে আকাশের দিকে উঠে গেলেন—কানের কাছে বাজতে লাগল কেবল একটা ঝড়ের শন্‌শনানি এবং দুম-দুম করে অনেকগুলো বন্দুকের শব্দ।...তার পরেই বিষম একটা ধাক্কা—সঙ্গে

সঙ্গে অত্যন্ত যন্ত্রণায় তিনি কেমন যেন আচ্ছন্নের মতন হয়ে গেলেন।

অনেক কষ্টে আপনাকে সামলে নিয়ে বিনয়বাবু প্রথমেই দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে যেন একটা নীল রঙের স্রোত। হাত দিয়ে অনুভব করে বুঝলেন, তিনি আর শূন্যে নেই, একটা শীতল পদার্থের উপরে শয়ন করে আছেন।

আস্তে আস্তে উঠে বসে দেখলেন, যার উপরে তিনি শুয়ে ছিলেন সেটা কাচের মত স্বচ্ছ এবং তার রঙ আকাশের মতই নীল। কেবল তাই নয়—তার ভিতর দিয়ে অনেক নিচে পৃথিবীর গাছপালা ও আলো দেখা যাচ্ছে।

অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে বিনয়বাবু ভালো করে গৃহতলটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। তিনি বুঝলেন, তা নীল রঙের কাচের মতন এমন কোন স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে তৈরি, পৃথিবীতে যা পাওয়া যায় না। বিনয়-বাবুর এটা বুঝতেও দেরি হল না যে, মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজের সমস্তটাই ঠিক এই একই পদার্থের দ্বারা প্রস্তুত। মেঝের উপরে বারকয়েক সজোরে করাঘাত করে তিনি আরো বুঝলেন, যে জিনিসে এটা তৈরি তা স্বচ্ছ ও পাতলা হলেও, রীতিমত কঠিন ও হাল্কা।

তারপরেই বিনয়বাবুর মনে পড়ল তাঁর সঙ্গীদের কথা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শুনতে পেলেন, বিমল অত্যন্ত বিহ্বল স্বরে ডাকছে, 'বিনয়বাবু, বিনয়বাবু!'

বিনয়বাবু চেয়ে দেখলেন খানিক তফাতেই বিমল দুই হাতে ভর দিয়ে বসে আছে।...আরো খানিক তফাতে রামহরি উপুড় হয়ে পড়ে আছে, তার কাছেই কমল ফ্যাল-ফ্যাল করে চারদিকে তাকিয়ে দেখছে এবং আর একটু দূরে দুই হাঁটুর ভিতরে মুখ ঢেকে বসে রয়েছে কুমার।

দলের সবাইকে একত্রে অক্ষত দেহে দেখতে পেয়ে, এত বিপদের মধ্যেও বিনয়বাবুর মনটা খুসি হয়ে উঠল।

বিমল আবার ডাকলে, 'বিনয়বাবু!'

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বললেন, 'কী ভাই বিমল, কী বলছ ?'

'এসব আমরা কোথায় এলুম ?'

'বুঝতে পারছ না ? মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজে।'

'তাহলে আপনার সন্দেহই সত্য ?'—বলেই বিমল বিস্মিত চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, এ উড়োজাহাজ কী আশ্চর্য জিনিস দিয়ে তৈরি, সেটা কিন্তু ধরতে পারছি না। এ জিনিসটা নীল-রঙা কাচের মত, অথচ কাচ নয়। উপরে চেয়ে দেখ, দেয়ালের ভিতর দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে।'

বিমল বললে, 'কিন্তু এ উড়োজাহাজ চালাচ্ছে কারা ?'

'এখনো তাদের কারুর দেখাই পাইনি।···বিমল, বিমল, মনে আছে তো, আমি বলেছিলুম যে কোন Vacuum যন্ত্র দিয়ে এই উড়োজাহাজ পৃথিবী থেকে নমুনা সংগ্রহ করছে ? ঐ দেখ।'

বিমল হেঁট হয়ে স্বচ্ছ গৃহতলের ভিতর দিয়ে দেখলে, তাদের কাছ থেকে অনেক তফাতে, একটা বিরাট ঘণ্টার মতন জিনিস নিচের দিকে নেমে গেছে—তার দীর্ঘতা প্রায় তিনশো ফুট ও বেড় প্রায় একশো ফুটের কম হবে না।

বিমল আশ্চর্য স্বরে বললে, 'অত বড় একটা যন্ত্র যখন এই উড়োজাহাজের গায়ে লাগানো আছে, তখন এর আকার না জানি কী প্রকাণ্ড।'

বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, এত বড় উড়োজাহাজের কল্পনা বোধহয় পৃথিবীতে এখনো কেউ করতে পারেনি। যে উড়োজাহাজে আমরা আছি, এটা নিশ্চয়ই একটা ছোটখাট শহরের মতন বড়।'

'কিন্তু আমি কি ভাবছি জানো বিমল ? আমরা ঐ Vacuum যন্ত্র দিয়ে এখানে কী করে এলুম ? চেয়ে দেখ, আমরা এখন যেখানে আছি, এর চারদিক দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। কে বা কারা আমাদের এখানে নিয়ে এল ? আর কোন পথ যখন নেই, তখন আমরা

এখানে এলুমই বা কেমন করে ?'

বিমল বললে, 'কেমন একটা ধাক্কা লাগতে আমি আচ্ছন্নের মতন হয়ে পড়েছিলুম, কোথা দিয়ে কী যে ঘটল কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'আমারও ঠিক সেই অবস্থাই ঘটেছিল। কিন্তু ঐ দেওয়াল-গুলোর পিছনে কী আছে ? জানবার জন্যে আমার কেমন কৌতূহল হচ্ছে।'

কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্তির কোন উপায়ও নেই। কারণ বিনয়-বাবুরা যে কামরায় আছেন, তার ছাদ, মেঝে ও এক পাশের দেওয়াল ছাড়া আর তিনদিকের দেওয়াল কালো রঙের পর্দা দিয়ে ঘেরা—স্বচ্ছ দেওয়ালের ও-পাশে পর্দার ভাঁজ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

বিমল বললে, 'এ কামরায় যে আলো জ্বলছে, তা লক্ষ্য করে দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ। ও আলোর ব্যবস্থা হয়েছে নিশ্চই রেডিয়ামের সাহায্যে।'

'রেডিয়ামের সাহায্যে ?'

'হঁ্যা। রাত্রের অন্ধকারে রেডিয়ামের ঘড়ি দেখেছ তো ? এখানে সেই উপায়ে, অর্থাৎ ঘড়ির বদলে ঘর আলোকিত করা হয়েছে। বিমল, মঙ্গল গ্রহের উড়োজাহাজে আসতে বাধ্য হয়ে তুমি ভয় পাওনি তো ?'

'না, বিনয়বাবু, ভয় আমি মোটেই পাইনি, কিন্তু আমি চিন্তিত হয়েছি।'

'চিন্তিত হয়েছ ? কেন ?'

'আমাদের ভবিষ্যৎ ভেবে।'

'ভবিষ্যতের কথা ভুলে যাও বিমল, ভবিষ্যতের কথা ভুলে যাও; এখন খালি বর্তমানের কথা ভাব। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমি কিন্তু খুব খুসি হয়েছি। আমাদের চোখের সামনে এখন এক নতুন জ্ঞানের রাজ্য খোলা রয়েছে—এক নতুন জগৎ, নতুন দৃশ্যের

পর নতুন দৃশ্য! এমন সৌভাগ্য যে আমার হবে, আমি তা কল্পনাও করতে পারিনি!'

পিছন থেকে এতক্ষণ পরে কুমার বললে, 'আপনার এ আনন্দ বেশীক্ষণ থাকবে না বিনয়বাবু! ভেবে দেখেছেন কি, আমরা আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারব না?'

বিনয়বাবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'কিন্তু সে কথা ভেবে মন খারাপ করে কোন লাভ নেই তো ভাই! পুরানো পৃথিবীতে না যেতে পারি, আমরা না হয় এক নতুন পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে নতুনভাবে জীবনযাপন করব। মন্দ কী?'

কমল বললে, 'কিন্তু এটাও ভুলবেন না বিনয়বাবু, যারা আমাদের ধরে এনেছে, তারা মানুষের শব-ব্যবচ্ছেদ করে।'

রামহরি বললে, 'আমরা যে ভূত-প্রেতের হাতে পড়িনি, তাই বা কে বলতে পারে!'

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, 'প্রাণ আমি সহজে দেব না। বাংলো থেকে আমি বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিলুম, সে বন্দুকও আমার সঙ্গে এখানে এসেছে।'

কুমার বললে, 'বন্দুক আমারও আছে। প্রথমে ঝোড়ো হাওয়ার টানে বন্দুকটা আমার হাত থেকে খসে পড়েছিল, কিন্তু এখানে এসে দেখছি আমার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটাও উপরে এসে হাজির হয়েছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, কুমার, তোমরা ছেলেমানুষি করো না। যারা আমাদের ধরে এনেছে, তাদের বুদ্ধি আর শক্তির কিছু কিছু পরিচয় তো এর মধ্যেই পেয়েছ। দুটো বন্দুক নিয়ে এদের বিরুদ্ধে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে? তার চেয়ে—'

বিনয়বাবু কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ কিসের একটা শব্দ হল—সঙ্গে সঙ্গে একদিকের দেওয়াল ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল।

বিনয়বাবু বললেন, 'সাবধান! দেওয়ালটা এরা নিশ্চয় কোন কল টিপে সরিয়ে ফেলেছে। এতক্ষণে বুঝলুম, এ কামরায় দরজা নেই কেন।'

দেওয়ালটা যখন একেবারে সরে গেল, তখন সামনেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সকলেই সবিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

রামহরি তাড়াতাড়ি দুই হাতে চোখ চেপে ফেলে বললে, 'এরা যমদূত, এরা যমদূত! আমাদের নরকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে।'

এমন কি বিনয়বাবু পর্যন্ত কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন—তাঁর মনে হল, তিনি যেন এক ভয়ানক উদ্ভট স্বপ্ন দেখছেন।

মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা

বিনয়বাবু দেখলেন, দেওয়ালটা সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত জীব তাঁদের সামনে এসে আবির্ভূত হল।

তার মাথাটা প্রকাণ্ড, এবং বিশেষ করে বড় কপাল থেকে খুলির দিকটা। মুখখানা অবিকল ত্রিকোণের মতন দেখতে। চোখ দুটো ঠিক গোল গোল ভাঁটার মতন—তাদের ভিতরে রক্তজবার মত রাঙা দুটো তারা। কান দুটো শিঙের মতন। নাকের কাছে গোল একটা ছ্যাঁদা ছাড়া আর কিছুই নেই। ঠোঁট ধনুকের মতন বাঁকা।

তার দেহ ও হাত-পা মানুষের মতন বটে, কিন্তু আকারে সমস্ত দেহটাই মাথা ও মুখের চেয়ে বড় হবে না। বিশেষ, তার দেহ আর হাত-পা অসম্ভব রকম রোগা ও অমানুষিক। তার উচ্চতা হবে বড়-জোর তিন ফুট—এর মধ্যে মাথা ও মুখের মাপই বোধহয় দেড় ফুট।

এই অপরূপ মূর্তির রঙ ঠিক শ্লেটের মতন, কিন্তু তার মাথায় বা মুখে একটিমাত্র চুলের চিহ্নও নেই।

মূর্তির পরনে লাল রঙের খাটো কোট,—কিন্তু কোটের হাতা কনুইয়ের কাছ থেকে কাটা। কোটের তলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত শাদা রঙের ইজের বা হাফপ্যান্ট। পায়ে খড়মের মত কাষ্ঠপাদুকা। খড়মের সঙ্গে তার তফাত শুধু এই যে, আঙুলের ও গোড়ালির

দিকে ছুটো করে চামড়ার ফিতে দিয়ে জুতো-জোড়া পায়ে লাগানো আছে। মূর্তির কোমরে একখানা তরবারি ঝুলছে, লম্বায় সেখানা পৃথিবীতে ব্যবহৃত ছোরার চেয়ে বড় নয়—চওড়ায় আরো ছোট পেন্সিল-কাটা ছুরির মত।

মূর্তি তার ভয়ানক। চোখ মেলে বন্দীদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল; তারপর বাজখাঁই গলায় কি একটা শব্দ উচ্চারণ করলে। তখনি আর একদল ঠিক সেইরকম মূর্তি কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। এই নতুন দলের সকলের হাতেই একগাছা করে বর্শা।

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, এরাই কি মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা?'

বিনয়বাবু বললেন, 'তাই তো দেখছি!'

বিমল বললে, 'এই তুচ্ছ জীবগুলো এসেছে পৃথিবীর উপরে অত্যাচার করতে।'

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'বিমল, চেহারা এদের যেমনই হোক, কিন্তু এদের তুচ্ছ বলে ভেবো না। কারণ যারা এমন আশ্চর্য উড়োজাহাজ তৈরি করেছে তাদের তুচ্ছ বলে ভাবলে ভুল করা হবে। ঐ প্রকাণ্ড মাথাই ওদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। পণ্ডিতদের মতে, হাজার হাজার বৎসর পরে পৃথিবীর মানুষদেরও হাত-পা আর দেহ ছোট হয়ে গিয়ে মাথা বড় হয়ে উঠবে। যারা যে অঙ্গ যত বেশী ব্যবহার করে তাদের সেই অঙ্গ তত বেশী প্রধান হয়ে ওঠে। দিনে দিনে মানুষের মস্তিষ্কের চর্চা বাড়ছে, দেহের চর্চা কমছে; কাজেই তাদের মাথা স্বাভাবিক নিয়মে বড় হয়ে উঠবেই।'

কুমার বললে, 'ওদের বর্শার ফলাগুলো কী দিয়ে তৈরী? ও যে ঠিক সোনার মত দেখাচ্ছে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'আমারও সন্দেহ হচ্ছে। মঙ্গল গ্রহে হয় লোহা পাওয়া যায় না, নয় সেখানে সোনা এত সস্তা যে, তার কোন দাম নেই।'

বিমল বললে, 'প্রথম জীবটা বোধহয় ওদের দলপতি। ঐ দেখুন, এইবারে ওরা আমাদের কাছে আসছে।'

মূর্তিগুলো এগিয়ে এসে বন্দীদের ঘিরে দাঁড়াল। তারপর দলের ভিতর থেকে পাঁচজন লোক বেরিয়ে এল, তাদের প্রত্যেকের হাতে একগাছা করে শিকল।

প্রথমেই একজন এসে বিমলের হাত ধরে টানলে, তারপর তার



বিমলের চারপাশে পঁচিশ-ত্রিশটা বর্শার ফলা চমকে উঠল।

হাতে শিকল পরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। চকিতে হাত সরিয়ে বিমল ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী! এত বড় আস্পর্ধা!' চোখের পলক না ফেলতে বিমলের চারপাশে পঁচিশ-ত্রিশটা বর্শার ফলা চমকে উঠল।

বিনয়বাবু বললেন, 'দোহাই তোমার, ওদের বাধা দিও না, আমাদের প্রাণ এখন ওদেরই হাতে।'

বিমল বললে, 'তা ব'লে আমি আমার হাত বাঁধতে দিচ্ছি না। এই হেঁড়ে-মাথা তালপাতার সেপাইগুলোকে আমরা এখনি টিপে মেরে ফেলতে পারি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'এ দলের পিছনে আরো কত দল আছে কে জানে? ছেলেমানুষি করলে আমরা সকলে মারা পড়ব।'

বিমল অত্যন্ত অনিচ্ছুকভাবে আবার হাত বাড়িয়ে দিলে।... একে একে সকলেরই হাত তারা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেললে।

রামহরি কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে, 'এইবারে আমাদের নিয়ে গিয়ে এরা বলি দেবে।'

কুমার বললে, 'একটু পরে যখন মরতেই হবে, তখন যেচে ধরা দেওয়াটা ঠিক হল কি?'

কমল কিছু বললে না, নিজের বাড়ীর কথা আর বাপ-মায়ের মুখ মনে করে তার তখন কান্না আসছিল।

বিনয়বাবু এক মনে হাতের শিকল পরখ করছিলেন। হঠাৎ তিনি মুখ তুলে বললেন, 'বিমল, হাতের শিকল ভালো করে দেখেছ?'

'কেন?'

'এ শিকল খাঁটি সোনার।'

রামহরি বিস্ফারিত চক্ষে হাতের শৃঙ্খলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তাহলে এ শিকল আর আমি ফিরিয়ে দেব না।' সোনার মায়া এমনি আশ্চর্য যে, বন্দী হয়েও রামহরির মন যেন অনেকটা আশ্বস্ত হল।

এদিকে সেই সশস্ত্র জীবগুলো একদিকে সার গেঁথে দাঁড়াল। তাদের দলপতি বন্দীদের সামনে এসে, হাতের ইশারায় অগ্রসর হতে বললে

বিনয়বাবু বললেন, 'এস, সকলে মিলে এগুনো যাক। এই বারে এখানে আরো কত আশ্চর্য ব্যাপার আছে, সমস্তই দেখতে পাওয়া যাবে।'

চৌবাচ্চায় পুষ্করিণী

সব আগে বিনয়বাবু, তারপর যথাক্রমে বিমল, কুমার, কমল আর রামহরি এবং তারপর মঙ্গল গ্রহের হেঁড়ে-মাথা বামন সেপাইরা পরে পরে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

বিনয়বাবু দেখলেন, তাঁরা একটি খুব লম্বা পথের উপরে এসে দাঁড়িয়েছেন—সে পথের উপরে দীর্ঘতা অন্তত হাজার ফুটের কম হবে না। বলা বাহুল্য, পথটাও সেই নীল রঙা কাচের মত জিনিস দিয়ে তৈরী। পথে দু-পাশে সারি-বাঁধা ঘর এবং সব ঘরের দেওয়ালই কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা।

খানিক দূরে যেতে-না-যেতেই সেপাইদের দলপতি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে, ঝকঝকে সোনার তরোয়াল খুলে বন্দীদের দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলে। তারপর এক পাশের পর্দা সরিয়ে একটা অব্যক্ত তীব্র শব্দ করে সামনের দরজায় তিনবার ধাক্কা মারলে। অমনি দরজাটা ভিতর থেকে খুলে গেল এবং আর-একটি বামন মূর্তি বাইরে এসে দাঁড়াল।

এ মূর্তির আকারও আগেকার মূর্তিগুলিরই মত, কিন্তু তার পোশাক অন্যরকম। তার গলা থেকে পা পর্যন্ত একটা সবুজ রঙের কোর্তা, মাথায় একটা লাল রঙের টুপি—দেখতে অনেকটা গাধার টুপির মত। কোর্তার উপরে একছড়া মালা—তাতে অনেকগুলো পাথর জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

বিনয়বাবু চুপি চুপি বললেন, 'বিমল, পাথরগুলো বোধহয় হীরে!'

বিমল বললে, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে!...কিন্তু এর কাছে আমাদের নিয়ে এল কেন?'

'বোধহয় এই জীবটাই এখানকার কর্তা। দেখছ না, সেপাইদের

দলপতি ওকে হেঁট হয়ে অভিবাদন করলে। ওর পোশাকও সেপাইদের চেয়ে ঢের বেশী জমকালো!'

নতুন মূর্তিটা খানিকক্ষণ বন্দীদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখলে; তারপর সেপাইদের দলপতির দিকে ফিরে মঙ্গল গ্রহের ভাষায় কি বলতে লাগল। বিনয়বাবু খুব মন দিয়ে শুনেও সে ভাষার কিছু বুঝতে পারলেন না, কিন্তু কতকগুলো বিষয় তিনি লক্ষ্য করলেন। প্রথমত, তাদের ভাষায় বর্ণমালা খুব কম, কারণ কথা কইতে কইতে তারা একই বর্ণ ক্রমাগত উচ্চারণ করে। দ্বিতীয়ত, চীনেদের মত তাদের ভাষায় অনুঃস্বরের বিশেষ বাড়াবাড়ি।

কথাবার্তা শেষ করে সেপাইদের দলপতি বন্দীদের কাছে আবার ফিরে এল। তারপর হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে আবার সকলকে অগ্রসর হতে বললে।

বন্দীরা আবার অগ্রসর হল, কিন্তু অল্পদূর অগ্রসর হয়েই সকলে বিস্মিতভাবে শুনতে পেলে, কেমন একটা কিচির-মিচির শব্দ হচ্ছে।

বিনয়বাবু বললেন, 'এ যে একদল বানরের চীৎকার!'

কমল বললে, 'মঙ্গল গ্রহেও বানর আছে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'না, আমার বোধহয় এ সেই বানরের দল—বিলাসপুরের বটগাছের উপরে যারা বাসা বেঁধে থাকত!'

আরো কয়েক পা এগিয়ে আবার এক অভাবিত ব্যাপার! পথের এক পাশে মস্ত বড় একটা খোলা জায়গা, আর সেইখানে বিশাল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে খাড়া হয়ে আছে—প্রকাণ্ড একটা বটগাছ। এত বড় গাছ চোখে দেখা যায় না!

বিনয়বাবু বললেন, 'বিলাসপুরের বিখ্যাত বটগাছ!'

মস্ত একটা মাটির ঢিবি তৈরি করে তার উপরে বটগাছটি পোতা রয়েছে, এবং তার নিচেকার ডালে ডালে সোনার শিকল দিয়ে বাঁধা অনেকগুলো বানর। বিনয়বাবু প্রভৃতিকে দেখে বানরগুলো আরো জোরে কিচির-মিচির করে চেঁচিয়ে উঠল—অমানুষের

আড্ডায় পরিচিত মানুষের দেখা পেয়ে এ যেন বানরদের প্রাণের আনন্দ প্রকাশ।

বটগাছের পাশেই আর এক আশ্চর্য দৃশ্য। সেই নীল-রঙা কাচের মত স্বচ্ছ জিনিস দিয়ে তৈরী পুকুরের মত বড় একটা চৌবাচ্চা এবং তার মধ্যে টল-টল করছে এক চৌবাচ্চা জল। খালি তাই নয়, জলে যে দলে দলে মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে, স্বচ্ছ চৌবাচ্চার পাশ থেকে তাও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, 'বিনয়বাবু, এ জল বিলাসপুরের সেই পুকুর থেকে চুরি করে আনা হয়নি তো?'

বিনয়বাবু বললেন, 'নিশ্চয় তাই হয়েছে।'

কমল বললে, 'কিন্তু এসব নিয়ে এরা করছে কী?'

বিনয়বাবু বললেন, 'সে কথা তো আগেই বলেছি। এরা পৃথিবী থেকে নমুনা সংগ্রহ করছে বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্যে।'

বিমল বললে, 'ঐ নগণ্য বামন-জানোয়ারগুলো যে এমন সব অসাধ্য সাধন করতে পারে, তা তো আমার বিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না।'

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'বিমল, পৃথিবীর মানুষের মত চেহারা না হলেই কোন জীবকে যে মানুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর বলে মানতে হবে, তার কোন মানে নেই। অথচ তুমি বারবার সেই ভ্রম করছ। আকাশে পৃথিবীর চেয়ে ঢের বড় শত শত গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে—হয়ত তার অনেকের মধ্যেই এমন সব সভ্য জীবের অস্তিত্ব আছে যারা মোটেই মানুষের মত দেখতে নয়। তাদের চেহারা দেখলে আমরা যেমন অবাক হব, আমাদের চেহারা দেখলে তারাও তেমনি অবাক হতে পারে। তারাও আমাদের দেখে হয়ত নিচু-দরের জানোয়ার বলেই ধরে নেবে। ভবিষ্যতে এমন ভ্রম আর করো না। কারণ মঙ্গল গ্রহের জীবরা যে নগণ্য নয়, তার অসংখ্য প্রমাণ তো চোখের উপরে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছ! এরা দেহের জোরে আমাদের সমকক্ষ না হলেও বুদ্ধির জোরে আমাদের চেয়েও যে

অনেক এগিয়ে গেছে, এটা আমি মানতে বাধ্য।'

কমল বললে, 'কিন্তু একটা কথা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের মত এরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানে না।'

বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমারও সেই বিশ্বাস। কিন্তু এ থেকে প্রমাণ হয় না যে এরা আমাদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব। দরকার হলেই কোন জিনিসের আবিষ্কার হয়, এটা হচ্ছে সভ্যতার নিয়ম। এদের বন্দুক-কামানের দরকার হয়নি, তাই এরা তার জন্যে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এখানে আগে থাকতে এক বিষয়ে তোমাদের সাবধান করে রাখছি। বিমল, কুমার, তোমাদের বন্দুক আছে বলে তোমরা যেন তার অপব্যবহার করো না।'

রামহরি বললে, 'আমাদের তো হাত বাঁধা, ইচ্ছে করলেও বন্দুক ছুঁড়তে পারব না। সুতরাং আমাদের কাছে বন্দুক থাকা না-থাকা দুইই সমান।'

বিমল হেসে বললে, 'এই পাতলা সোনার শিকল আমি এক টানে এখনি ছিঁড়ে ফেলতে পারি,—আমি কি মঙ্গল গ্রহের বামন যে এই শিকলে বাঁধা থাকব ?'

বিনয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ, যদিও আমার বয়েস হয়েছে, তবু এই সোনার শিকল ছেঁড়বার শক্তি এখনো আছে। তবে, আমাদের এ শক্তিও আপাতত ব্যবহার না করাই ভালো।

সামনে মরণ

সেপাইদের দলপতির ইঙ্গিতে আবার সকলকে দাঁড়াতে হল। সেখানেও পথের দুই ধারেই কালো-পর্দা-ঢাকা দেওয়াল।

হঠাৎ সেই দেওয়ালের ওপাশ থেকে একটা শব্দ শুনে সকলেই চমকে উঠল। কে যেন মানুষের গলায় করুণ স্বরে ক্রন্দন করছে !

দলপতি এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালের উপরে একটা সোনার হাতল

ধরে ঘুরিয়ে দিলে, সামনের লম্বা দেওয়ালটা অমনি একপাশে সরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কান্নার আওয়াজ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু কালো পর্দাটা তখনো সকলের দৃষ্টি রোধ করে ছিল বলে কে কাঁদছে তা দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে বামন-সেপাইরা একসঙ্গে একটা চীৎকার করে উঠল— চীৎকারটা শোনাল অনেকটা এই রকম—'ঘং ঘং ঘং!'—অমনি পথের আর-এক পাশের দেওয়ালও সরে গেল এবং পর্দা ঠেলে দলে দলে বেরিয়ে এল পঙ্গপালের মত শত শত বামন-সেপাই। তাদের সকলেরই হাতে প্রায় সাড়ে তিন ফুট উঁচু একগাছা করে সোনার-ফলা-ওয়ালা বর্শা।

বিনয়বাবু বললেন, 'দেখছ তো বিমল, এখানে জোর খাটিয়ে লাভ নেই! আমরা এদের বিশ-পঁচিশ জনকে বধ করলেও শেষকালে আমাদেরই মরতে হবে।'

নতুন সেপাইয়ের দল আসার সঙ্গে সঙ্গেই দলপতি ওধারকার দেওয়ালের পর্দায় ঝোলানো একটা দড়ি ধরে টানলে, সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটা সরে গেল এবং সকলের চোখের সামনে ফুটে উঠল এক বিচিত্র দৃশ্য!

খুব লম্বা একখানা ঘর এবং কাচের মত মেঝের উপরে শুয়ে বসে ও দাঁড়িয়ে আছে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন মানুষ। তাদের সকলেরই মুখ বিমর্ষ, কেউ চাপা গলায়, কেউ বা উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করছে। দেওয়ালের গায়ে আড়াআড়িভাবে অনেকগুলো সোনার রিঙ্ বসানো এবং এক-একটা রিঙ্ থেকে এক-এক গাছা লম্বা সোনার শিকল ঝুলছে,—প্রত্যেক বন্দীর হাত খোলা থাকলেও ডান পা সেই শিকলে বাঁধা।

বিমল ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'দেখুন, বিনয়বাবু, এই হতভাগা বামনরা পৃথিবী থেকে কত মানুষ ধরে এনেছে!'

বিনয়বাবু দুঃখিতভাবে শুধু বললেন, 'হুঁ!'

রামহরি হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললে, 'আমাদেরও এখুনি ঐ দশা হবে, হা অদৃষ্ট!'

বিমলের কপালের শির ফুলে উঠল, রুদ্ধ আক্রোশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কাঁপতে লাগল।

এমন সময়ে সেপাইদের দলপতি কি একটা হুকুম দিলে—সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সেপাই বিমল ও কুমারের কাছে এসে তাদের বন্দুক দুটো কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে।

বিমল চেঁচিয়ে বললে, 'খবরদার কুমার, বন্দুক ছেড়ো না। বন্দুক গেলে আমাদের আর আত্মরক্ষার কোন উপায়ই থাকবে না।'

বিনয়বাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'বিমল, বিমল, ওদের বাধা দিয়ে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনো না।'

বিমল দৃঢ় স্বরে বললে, 'আসুক বিপদ। এখানে শেয়াল-কুকুরের মত সারাজীবন বাঁধা থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভালো।'

বামন-সেপাইরা নাছোড়বান্দা দেখে বিমল তাদের উপরে বার-কয়েক পদাঘাত করলে,—তিনজন বামন বিকট আর্তনাদ করে মেঝের উপরে ঠিক্‌রে গিয়ে পড়ল—তারপর আর তারা চ্যাঁচালও না, একটু নড়লও না।

সেপাইদের দলপতি তাঁর গোল গোল ভাঁটার মত চোখ আরো বিস্ফারিত করে বললে, 'ভং ভং—ভংকা!'

চোখের পলক না ফেলতে সেই শত শত বামন-সেপাই তাদের হাতের বর্শাগুলো মাথার উপরে তুলে ধরলে।

বিমল পিছু হটে গিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে হাতের শিকল ছিঁড়ে ফেললে। তারপর বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে বললে, 'বিদায় বিনয়বাবু,—আমি মরব, তবু আর বন্দী হব না। কিন্তু মরবার আগে এই মর্কটগুলোকে আমি এমন শিক্ষা দিয়ে যাব যে, এরা জীবনে তা আর ভুলবে না।'

রামহরিও একলাফে বিমলের সামনে এসে, তার দেহ ঢেকে

দাঁড়িয়ে বললে, 'না, না। আগে আমাকে না মেরে এরা আমার খোকাবাবুকে মারতে পারবে না।'

বর্শা উঁচিয়ে বামন-সেপাইরা বিমলের দিকে ছুটে এল।

বন্দুকের শক্তি

বর্শা উঁচিয়ে বামন-সেপাইরা বিমলের দিকে ছুটে এল।

কিন্তু রামহরি হঠাৎ বিমলের দেহ ঢেকে দাঁড়াল দেখে তারা একটু থতমত খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেপাইদের দলপতি আবার ক্রুদ্ধ স্বরে বললে,—'ভং ভং—ভংকা।'

বামনরা আবার অগ্রসর হল।

রামহরিকে এক ধাক্কা মেরে বিমল বললে, 'সরে যাও রামহরি, আমার সামনেটা আড়াল করে দাঁড়িও না।'

বিমলের ঠিক সুমুখে এসে বামনরা তাকে বর্শার খোঁচা মারতে উদ্যত হল।

বিমল এক লাফে এক পাশে সরে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের বন্দুকটা ভীষণ গর্জন করে অগ্নিশিখা উদ্গার করলে।

পরমুহূর্তে দুজন বামন চীৎকার করে গৃহতলে লুটিয়ে পড়ল,—বন্দুকের গুলি নিশ্চয় প্রথম বামনের দেহ ভেদ করে দ্বিতীয় বামনকেও আঘাত করেছে।

বিমল আবার বন্দুক ছুঁড়লে—আবার আর একজন বামনের পতন হল।

ব্যাপার দেখে আর সব বামন-সেপাইরা তাড়াতাড়ি পিছু হটে গেল,—তাদের মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে তারা ভয়ানক স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বন্দুক যে কী সাংঘাতিক জিনিস, তারা তো তা জানে না।

এদিকে বিনয়বাবুও ততক্ষণে নিজের হাতের শিকল ভেঙে ফেলে

কুমার আর কমলের শৃঙ্খলও খুলে দিয়েছেন এবং রামহরিও অল্প চেষ্টাতেই নিজের সোনার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেছে।

সেপাইদের দলপতি পায়ে পায়ে পিছু হটতে হটতে আবার বললে, 'ভং ভং—ভংকা!'

বিমলকে বন্দুকে নতুন টোটা পুরতে ব্যস্ত দেখে কুমার এগিয়ে এসে দলপতিকে লক্ষ্য করে আবার বন্দুক ছুঁড়লে।

শূন্যে দু-হাত ছড়িয়ে দলপতিও ঘরের মেঝের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

কুমার ফের বন্দুক ছুঁড়লে,—পর মুহূর্তে বামন-সেপাইরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মেরে সেখান থেকে অদৃশ্য হল ;—সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্ণভেদী তীব্র শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল—ঠিক যেন দশ-বারোটা রেলের ইঞ্জিন একসঙ্গে 'কু' দিচ্ছে।

বিনয়বাবু চমকে বললেন, 'ও কিসের শব্দ!'

বিমল বললে, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

হঠাৎ ঢং ঢং করে ঘন-ঘন ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল—সেই 'কু' শব্দও তখনো থামল না।

সকলে সবিস্ময়ে দেখতে পেলে, দলে দলে বামন উড়োজাহাজের এক প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে, তাদের সকলের মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে কি-এক অজ্ঞাত ভয়ের রেখা।

কমল বললে, 'ওদের দেখে মনে হচ্ছে, ওরা যেন হঠাৎ কি একটা বিপদে পড়েছে!'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, সেই ভয়ে ওরা এতটা ভেবড়ে পড়েছে যে, আমাদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।'

বিনয়বাবু এগিয়ে গিয়ে ঘরের একটা দেওয়াল খানিকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর ফিরে বললেন, 'বিমল, ব্যাপার যা হয়েছে আমি তা বোধহয় বলতে পারি। উড়োজাহাজের দেওয়াল আমাদের বন্দুকের গুলিতে ছ্যাঁদা হয়ে গেছে। ঐ যে 'কু' শব্দ হচ্ছে, ওটা বাইরে থেকে বাতাস ঢোকার শব্দ। বামনরা সেই ছ্যাঁদা মেরামত করছে।'

কুমার বললে, 'কিন্তু এই উড়োজাহাজের দেওয়াল কি এমন পলকা যে, সামান্য বন্দুকের গুলিতে ভেঙে গেল ?'

বিনয়বাবু বললেন, 'বোধহয় দৈবগতিকে কোন জোড়ের মুখে বা অস্থানে বন্দুকের গুলি লেগেছে।'

বিমল বললে, 'ভারি ভারি জিনিসের ভার বইতে পারলেও হয়ত এই উড়োজাহাজ বন্দুকের গুলির চোট সইতে পারে না।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তাও অসম্ভব নয়,—কি-রকম উপাদানে এই উড়োজাহাজ তৈরী তা তো আমরা জানি না।'

কুমার বললে, 'এখন আমাদের কর্তব্য কী ? আমরা বামনদের হত্যা করেছি, ওরাও নিশ্চয় এর প্রতিশোধ নিতে আসবে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'ওরা কী করবে তা আমি জানি না। তবে, যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে, তখন আর নরম হওয়াও চলবে না, কারণ এখন আত্মসমর্পণ করলেও ওরা বোধহয় আমাদের ক্ষমা করবে না।'

বিমল বললে, 'আমার মনে হয় ওরা আর সহজে এদিকে ঘেঁষবে না, কারণ ওরা আমাদের বন্দুকের শক্তি বুঝে গেছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'ভবিষ্যতের কথা পরে ভাবা যাবে। আমাদের এখন সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, যে মানুষগুলি বন্দী হয়ে আছে তাদের স্বাধীন করে দেওয়া। তাহলে আমরা দলেও রীতিমত পুরু হব, আর ওদের আক্রমণেও বেশ বাধা দিতে পারব।'

রক্ত-তারকার রহস্য

বন্দীদের ভিতরে ভদ্রশ্রেণীর লোক কেউ ছিল না—বেশীর ভাগই পূর্ববঙ্গের মুসলমান খালাসী, বিলাসপুর থেকে যারা স্টীমারের সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছিল। বন্দীরা মুক্তিলাভ করে বিনয়বাবুদের চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মনের খুসিতে জয়ধ্বনি করে উঠল।

বিনয়বাবু সকলকে সম্বোধন করে বললেন, 'দেখ, এ জয়ধ্বনি করবার সময় নয়। আমি যা বলি, তোমরা সবাই মন দিয়ে শোন। আমরা সকলেই এক ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়ে আছি। যে-কোন মুহূর্তে আমাদের প্রাণ যেতে পারে। বিপদে পড়লে বাঘে-গরুতেও একসঙ্গে জল খায়, সুতরাং বড়-ছোট নির্বিচারে আমাদেরও এখন এক মন, এক প্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে। কাজেই এটা আমি অনায়াসেই আশা করতে পারি যে তোমরা কেউ আমার কথার অবাধ্য হবে না।'

তারা সকলেই একসঙ্গে বলে উঠল, 'আপনার কথায় আমরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজি আছি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'যাদের আশ্রয়ে আমরা থাকতে বাধ্য হয়েছি তারা এখন আমাদের পরম শত্রু। অথচ তারা অন্ন-জল না দিলে আমরা প্রাণে বাঁচব না। অতএব এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, অন্ন-জলের ব্যবস্থা করা।'

বিমল বললে, 'কিন্তু কী করে সে ব্যবস্থা হবে?'

বিনয়বাবু বললেন, 'ঐ দেখ, বামনরা সবাই দূর থেকে আমাদের ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের বন্দুকের মহিমা দেখে ওরা বিলক্ষণ ভয় পেয়েছে, আর সেইজন্যেই এদিকে এগুতে সাহস করছে না। কিন্তু প্রবাদে যখন বলে যে, পর্বত মহম্মদের কাছে না এলে মহম্মদই পর্বতের কাছে যেতে পারেন তখন আমরাই বা ওদের কাছে যেতে পারব না কেন? তোমরা সবাই আমার সঙ্গে এস। ভালো কথায় ওরা যদি আমাদের খাবার না দেয়, তাহলে আমরা আবার যুদ্ধ ঘোষণা করব।'

সব-আগে বিনয়বাবু, তাঁর পিছনে বন্দুক বাগিয়ে বিমল আর কুমার, তার পরে বাকি সবাই দলে দলে অগ্রসর হল।

বামনরাও দলবদ্ধ হয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে ভয় ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে সমস্ত দেখতে লাগল।

বিনয়বাবু দল ছেড়ে একটু এগিয়ে গিয়ে, পেটে ও মুখে হাত দিয়ে

আহারের অভিনয় করে ইসারায় জানালেন যে তাঁরা সবাই ক্ষুধার্ত, অবিলম্বেই খাদ্যদ্রব্য আনতে হবে। বামনরা খানিকক্ষণ ধরে পরস্পরের সঙ্গে কি পরামর্শ করলে। তারপর একজন বামন এগিয়ে এসে তেমনি ইসারায় বুঝিয়ে দিলে যে, তারা শীঘ্রই সকলের জন্যে খাদ্যদ্রব্য পাঠিয়ে দেবে।

বিনয়বাবু আনন্দিত কণ্ঠে বললেন, 'যাক, খাবার চাইতে এসে এটাও বেশ বোঝা গেল যে, বামনরা আমাদের আর ঘাঁটাতে চায় না। এ-অবস্থায় ওদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতেও বিশেষ বেগ পেতে হবে না...হুঁ, সকলেই শক্তের ভক্ত! এস বিমল, আমরা সেই পুকুর-চৌবাচ্চার ধারে, বটগাছের তলায় গিয়ে বিশ্রাম করি গে।'

সকলে আবার অগ্রসর হলেন। খানিক দূরে যেতেই বিলাস-পুরের বটগাছ পাওয়া গেল।—তার ডালে বসে বানররা মানুষ দেখে আবার আনন্দে কলরব করে উঠল।

বিনয়বাবু চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর উড়োজাহাজের স্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়ে একবার নিচের দিকে ও একবার উপর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিমল, দেখ!'

'কী বিনয়বাবু?'

'নিচের দিকে কী দেখছ?'

'ধু-ধু শূন্য!'

'এই শূন্যতার অর্থ বুঝতে পারছ কি? পৃথিবী আর দেখা যাচ্ছে না,—আমরা এখন অন্য গ্রহে যাচ্ছি। উড়োজাহাজ স্বদেশে ফিরছে।'

বিমল স্তম্ভিত ও স্তব্ধভাবে নিচের সেই বিরাট শূন্যতার দিকে তাকিয়ে রইল—যে শূন্যতার মাঝখানে তাদের সকলকার মা, পৃথিবীর শ্যামল মুখ হারিয়ে গেছে, হয়ত এ-জীবনের মত!

বিনয়বাবু আবার বললেন, 'উপর-পানে তাকিয়ে দেখ!'

বিমল মাথা তুলে দেখে বললে, 'উপরেও তো দেখছি শুধুই শূন্যতা!...না, না, একটা রাঙা বড় তারা জ্বলজ্বল করছে!'

'হ্যাঁ, ঐ হচ্ছে মঙ্গল গ্রহ। ওর ঐ রাঙা রঙ্ দেখেই য়ুরোপে

সেকালের লোকেরা মঙ্গলকে যুদ্ধ-দেবতার পদে অভিষিক্ত করেছিল মঙ্গল গ্রহ আকারে খুব ছোট, পণ্ডিতেরা হিসাব করে বলেছেন, মঙ্গলের আড়াআড়ি মাপ চার হাজার আটশো মাইলের বেশী নয়, ওর উপরটা পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগের চেয়ে কিছু বেশী মাত্র।'

অনেক উর্ধ্বে সীমাহীন রহস্যের মায়া-রাজ্যে সেই রক্ত-তারকা এক বিপুল দানবের ক্রুদ্ধ নেত্রের মত জ্বলতে লাগল—সকলে বিস্মিতভাবে তার পানে নীরবে তাকিয়ে রইল।

বিনয়বাবুর ডায়েরি

কদিন কেটে গেল,—ঠিক কয় দিন, তার কোন হিসাব আমি রাখিনি। এই কদিন ধরে উড়োজাহাজের একটু বিশ্রাম নেই—সে হু-হু করে শূন্যের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত ভেসে চলেছে—মিনিটে কত মাইল করে তাও জানবার কোন উপায় নেই। তবে এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে মঙ্গল গ্রহের এই বিচিত্র-উড়োজাহাজের গতি পৃথিবীর যে-কোন উড়োজাহাজের চেয়ে ঢের বেশী—কারণ মাথার উপরকার ঐ রক্ত-তারাটি ক্রমেই দেখতে বড় হয়ে উঠছে।

বামনরা আমাদের সঙ্গে আর কোন গোলমাল করেনি, তারা রোজ খাবারের যোগান দিয়ে যাচ্ছে এবং আমরাও নির্বিবাদে তার সদ্ব্যবহার করছি। তবে, তারা আর আমাদের কাছে ঘেঁষতে সাহস করে না, খাবারের পাত্রগুলো খুব তফাতে রেখেই আস্তে আস্তে সরে পড়ে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমাদের বন্দুকের শক্তি দেখে তারা রীতিমত শায়েস্তা হয়ে গেছে। তারা আমাদের উপরে পাহারা দেয় বটে, কিন্তু তাও খুব দূর থেকে, লুকিয়ে-লুকিয়ে।

এরা যে এত শীঘ্র পৃথিবীর আবহাওয়া ছেড়ে পিঠটান দিচ্ছে, তারও কারণ বোধহয় আমাদের বিদ্রোহ। আমাদের বন্দুকের

গুলিতে উড়োজাহাজ ফুটো হয়ে যাওয়াতেই নিশ্চয় তারা এতটা ভয় পেয়েছে। পাছে আমরা কোন নতুন বিপদ ঘটাই, সেই ভয়েই বামনরা আজকাল চুপচাপ আছে বটে, কিন্তু মঙ্গল গ্রহে ফিরে যাবার পর এরা যে আমাদের সঙ্গে কি-রকম ব্যবহার করবে, তা ভগবানই জানেন।

এ-জীবনে হয়ত আর পৃথিবীতে ফিরতে পারব না। সেইজন্যেই এই ডায়েরি লিখতে সুরু করেছি। আমাদের জীবনের উপর দিয়ে কী আশ্চর্য ঘটনার প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, তার একটা লিখিত ইতিহাস থাকা নিতান্ত দরকার। যদিও সেটা সম্ভব নয়,—তবুও আমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনগতিকে আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারে, তাহলে আমার এই ইতিহাস মানুষের অনেক উপকারে লাগবে।

কিন্তু এত বিপদেও আমার মনে আনন্দ হচ্ছে। যে মঙ্গল গ্রহ নিয়ে আমি আজীবন আলোচনা করে আসছি, যার জন্যে পৃথিবীর সর্বত্র কত তর্ক, কত সন্দেহ, কত জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে, এবারে আমি সশরীরে তারই মধ্যে গিয়ে বিচরণ করতে পারব। আমি কী ভাগ্যবান!

খুব শীঘ্রই আমরা যে-গ্রহে গিয়ে অবতীর্ণ হব, তার পরিচয় জানি বলেই আমার বিশেষ কিছু ভয় হচ্ছে না। কিন্তু বিমল, কুমার ও কমল বোধহয় অত্যন্ত দুর্ভাবনায় পড়েছে। আর রামহরির তো কথাই নেই, সে সর্বদাই জড়ভরতের মত এক কোণে বসে থাকে, কারুর সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত কইতে চায় না।

তাদের আশ্বস্ত করবার জন্যে সেদিন বললুম, 'আচ্ছা, তোমরা এতটা বিমর্ষ হয়ে আছ কেন বল দেখি? তোমাদের বিশেষ ভয় পাবার কোন কারণ তো দেখি না।'

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, আমাদের মত অবস্থায় পড়লে পাগল ছাড়া আর কেউ খুসি হতে পারে না। জলের মাছকে ডাঙায় তোলবার সময়ে মাছেরা কি খুসি হতে পারে? আমাদেরও অবস্থা কি অনেকটা সেইরকম হয়নি? আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি, কোন্

সৃষ্টিছাড়া বিপদের রাজ্যে, কে তা বলতে পারে?'

আমি বললুম, 'আমরা যে মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছি সে কথা তো আগেই তোমাদের বলেছি। মঙ্গল গ্রহে যখন জীবের বসতি আছে, তখন তোমাদের এতটা চিন্তিত হবার কোনই কারণ নেই। মঙ্গল গ্রহের ভিতরের অবস্থা অনেকটা পৃথিবীরই মতন। সেখানেও যে পৃথিবীর মত বায়ুমণ্ডল আছে, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। মঙ্গল গ্রহে কুয়াশা আর মেঘ যখন আছে তখন পৃথিবীর জীবদের সব-আগে যা দরকার সেই বায়ুমণ্ডলও নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং জলের মাছের ডাঙায় পড়ার মত অবস্থা আমাদের কখনই হবে না, সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত থাকো।'

কমল বললে, 'কিন্তু মঙ্গল গ্রহের রঙ্ অমন রাঙা কেন?'

আমি বললুম, 'পণ্ডিতরা দেখেছেন মঙ্গলের পাঁচ ভাগের তিন ভাগই হচ্ছে মরুভূমি—সেখানে জল বা ফল-ফসল কিছুই নেই, খালি ধু ধু করছে লাল বালি আর লাল বালি। এই লাল বালির মরুভূমির জন্যেই মঙ্গলকে অমন রাঙা দেখায়।

আরো কতগুলো দিন একভাবেই কেটে গেল।

এখন আমরা পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যেও নেই—এখন কেবল মঙ্গল আমাদের টানছে।—মঙ্গলের আকারও মস্ত বড় হয়ে উঠেছে, আর এখন তাকে দেখতে হলে উপর দিকে নয়, নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে হয়।

সেদিন রাত্রে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলুম। দূরে, বহু দূরে—মাথার উপরে জেগে উঠল উজ্জ্বল পৃথিবী, যেন চাঁদের মতন। আমার মনে হল, মা যেমন কোলের ছেলের মুখের উপরে মুখ এনে নত নেত্রে চেয়ে রাত জেগে বসে থাকেন, পৃথিবীও আমাদের পানে ঠিক সেইভাবেই স্নেহমাখা দরদভরা চোখে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে।

উড়োজাহাজের সমস্ত বন্দীদের ডেকে সেই দৃশ্য দেখালুম। সকলেই দুঃখিতভাবে কাতর আগ্রহের সঙ্গে অথচ গভীর বিস্ময়ে মা

পৃথিবীর উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করল, কেউ কেউ আবার চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিলে,—আমারও মনটা যেন কেমন কেমন করতে লাগল।…হায়, আর কি ঐ মায়ের কোলে গিয়ে উঠতে পারব ?

জোড়া চাঁদের মুল্লুকে

ঐ মঙ্গল গ্রহ। আগেকার চেয়ে অনেক কাছে, কিন্তু এখনো বহু দূরে।

বামনরা এখনো আমাদের কাছে ঘেঁষে না,—আমরা তাদের সঙ্গে মেলামেশার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাদের দিকে এগুলেই তারা পালিয়ে গিয়ে কোন একটা কামরায় ঢুকে পড়ে, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। অথচ আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যে এখন দূরে দূরে চারদিকে সশস্ত্র পাহারারও অভাব নেই।

বিমল সেদিন দৈবগতিকে একটা বামনকে ধরে ফেলেছিল। কিন্তু ধরবামাত্র বামনটা মহা আতঙ্কে বিকট এক চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বিমল তখন বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে এল।

আজ আমাদের এক পরামর্শসভা বসেছিল। বিমল, কুমার, কমল, রামহরি এবং অন্যান্য বন্দীদের ডেকে আমি বললাম, 'দেখ, শীঘ্রই আমরা মঙ্গল গ্রহে গিয়ে উপস্থিত হব। বামনরা এখন ভয়ে আমাদের কিছু বলছে না বটে, কিন্তু স্বদেশে গিয়ে তারা যে আমাদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করবে, তার কিছুই স্থিরতা নেই। তখন তারা দলে ভারি হবে, কেবলমাত্র দুটো বন্দুক দেখিয়ে আমরা বেশীদিন তাদের ভয় দেখাতেও পারব না। কাজেই তখন আমাদের প্রতি পদেই সাবধান হয়ে থাকতে হবে। মঙ্গল গ্রহে গিয়ে তোমরা কেউ যেন দলছাড়া হয়ো না,—সকলে সর্বদাই একসঙ্গে থেকো, একসঙ্গে ওঠা-বসা চলা-ফেরা কোরো। যা করবে সকলকে জানিয়ে করবে। এ ছাড়া আমাদের আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নেই।'

আরো কয়েকদিন গেল।

মঙ্গল গ্রহ এখন আমাদের চোখের উপরে বিরাট একখানা থালার মতন ভেসে উঠেছে। সেখানে পৌঁছতে বোধহয় আর একদিনও লাগবে না।

আজ সকালে উঠে দেখলুম, ঘন মেঘ ও কুয়াশার ঘোমটায় মঙ্গল গ্রহের মুখ ঢাকা। মাঝে মাঝে সে ঘোমটা সরে যাচ্ছে, আর ভিতর থেকে লাল, সবুজ বা সাদা রঙের আভা ফুটে উঠছে। ঐ লাল রঙ নিশ্চয় মরুভূমির, এবং সবুজ ও সাদা রঙ আসছে বোধহয় মঙ্গলের চাষ-ক্ষেত, অরণ্য ও মেরুদেশের তুষার-রাশি থেকে।

মঙ্গলের বয়স পৃথিবীর চেয়ে ঢের বেশী। তার ভিতরে যে-সব নদ-নদী-সমুদ্র ছিল, তা এখন শুকিয়ে গেছে। পণ্ডিতদের মতে, এক-দিন পৃথিবীরও এই দশা হবে। জলের অভাবে জীব বাঁচতে পারে না—সৃষ্টির প্রথম জীবের জন্ম হয়েছে জলের ভিতরেই। কাজেই মঙ্গলের বামনরা আত্মরক্ষার জন্যে শেষ একমাত্র উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। মঙ্গলেরও মেরু-প্রদেশে পৃথিবীর মত তুষারের রাজ্য আছে। মঙ্গলের বাসিন্দারা শত শত ক্রোশ ব্যাপী খাল কেটে সেই বরফ-গলা জল নিয়ে এসে চাষ-আবাদ করে। এমন খাল তারা দুটো-একটা নয়—কেটেছে অসংখ্য।

পৃথিবীর মত মঙ্গলও সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং ঘোরা শেষ করতে সে পৃথিবীর চেয়ে প্রায় দু-গুণ সময় নেয়,—অর্থাৎ ৬৮৭ দিন। সুতরাং আমাদের প্রায় দুই বৎসরে হয় তার এক বৎসর। এর দ্বারা আরো বোঝা যাবে, মঙ্গল প্রতি দুই বৎসর দুই মাস অন্তরে একবার করে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর কাছে আসে। সে সময়ে প্রায় ছয় মাস কাল সে পৃথিবীর চোখের সামনে থাকে, তারপর আবার হাজার হাজার ক্রোশ দূরে, সূর্যের ওপারে অদৃশ্য হয়ে যায়। মঙ্গলের দিন আমাদের দিনের চেয়ে সাঁইত্রিশ মিনিটের চেয়ে কিছু বেশী।

কাল একটা ব্যাপার দেখে বিমল,কুমার আর কমল ভারি অবাক

হয়ে গেছে। আমি কিন্তু মোটেই আশ্চর্য হইনি, কারণ ব্যাপারটা আমার আগে থেকেই জানা ছিল।

ব্যাপারটা এই—মঙ্গল গ্রহে একজোড়া চাঁদ আছে। একটির নাম 'ফোবোস'—মঙ্গলের ঠিক মাঝখান থেকে সে ৫,৮০০ মাইল দূরে থাকে। প্রতি সাত ঘণ্টা উনচল্লিশ মিনিটে সে একবার করে মঙ্গলের চারদিকে ঘুরে আসে—অর্থাৎ প্রতিদিনে তিনবার করে। 'ফোবোসে'র উদয় হয় পূর্বদিকে নয়, মঙ্গলের পশ্চিম দিকে এবং চার-ঘণ্টা পরে পূর্বদিকে সে অস্ত যায়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে খণ্ড থেকে পূর্ণ বা পূর্ণ থেকে খণ্ড চাঁদের রূপ ধারণ করে।

আর এক চাঁদের নাম 'ডিমোস'—মঙ্গল থেকে এর দূরত্ব আরো বেশী—১৪,৬০০ মাইল। প্রতি ত্রিশ ঘণ্টা আঠারো মিনিটে সে একবার করে মঙ্গলের চারদিকে ঘুরে আসে। প্রতি তিন দিন অন্তর সে অস্ত যায় এবং এরই মধ্যে তার আকার খণ্ড থেকে পূর্ণ চাঁদের মত হয়ে ওঠে। এর উদয় হয় পূর্বদিকেই।

'ফোবোস' আর 'ডিমোস' আকারে পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে ঢের বেশী ছোট। 'ডিমোসে'র চেয়ে 'ফোবোসে'র আকার কিছু বড়—তার আড়াআড়ি মাপ প্রায় সাত মাইল। 'ডিমোসে'র আড়াআড়ি মাপ পাঁচ কি ছয় মাইল। এই জোড়া চাঁদ কিন্তু মঙ্গলের রাত্রের অন্ধকারকে দূর করতে পারে না। কারণ আমাদের পৃথিবীর পূর্ণ চাঁদের ষাট ভাগের এক ভাগ আলো নিয়ে 'ফোবোসে'র কারবার, আর, 'ডিমোস' দেয় তার বারোশো ভাগের এক ভাগ মাত্র আলো।

মঙ্গলের মেঘরাজ্য পার হয়ে আমরা আরো নিচে নেমে এসেছি—আমাদের চোখের উপরে জেগে উঠেছে এক কল্পনাতীত দৃশ্য।

পায়ের তলায় দেখা যাচ্ছে ধু ধু মরুভূমি এবং তার উপর দিয়ে হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে রোদের তপ্ত রাঙা বালির ঝড়। সে ঝটিকা-ময়ী মরুভূমির যেন আদি-অন্ত নেই। মরুভূমির বুক ভেদ করে সারি-সারি খাল, তাদের সংখ্যা গণনায় আসে না। স্থানে স্থানে

যেন খালের জাল বোনা রয়েছে, কোথাও একটা খালের উপর দিয়ে আর একটা খাল আড়াআড়িভাবে কাটা হয়েছে, আবার কোথাও বা জোড়া জোড়া খাল পাশাপাশি চলে গেছে—আকার দেখলে বেশ অনুমান করা যায় যে, লম্বায় কোন কোন খাল তিনচার হাজার মাইলের কম নয়। সোজাসুজিভাবে এতগুলো সুদীর্ঘ খাল কাটা যে কিরকম পরিশ্রম সাধ্য ব্যাপার তা ভাবলেও স্তম্ভিত হতে হয়। আর এ কাজ হচ্ছে ঐ বামন জীবদের। ধন্য তাদের বুদ্ধি, ধন্য তাদের শক্তি!

যেখান দিয়েই খাল গিয়েছে, সেইখানেই তার দুই পাশে শ্যামল বনের রেখা। উড়োজাহাজ আরো নিচে নামলে পর দেখলুম, স্থানে স্থানে অনেক ঘরবাড়ী রয়েছে, নিশ্চয়ই সেগুলো নগর। মাঝে মাঝে ছোট-বড় পাহাড়ও চোখে পড়ল।

খানিক পরেই উড়োজাহাজ একটা বড় শহরের উপরে এসে ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল। নিচের শহর থেকে ঘন ঘন ঘণ্টা ও ভেরীর ধ্বনি ও বহু কণ্ঠের চীৎকার শুনতে পেলুম,—চেয়ে দেখলুম, শহরের প্রত্যেক বাড়ীর ছাদের উপরে ও পথে পথে বামনদের জনতা। হঠাৎ শহর থেকে আরো কুড়ি-পঁচিশখানা ছোট ছোট উড়োজাহাজ আমাদের দিকে উড়ে এল,—আগ বাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।

আমি ফিরে বললুম, 'বিমল, তোমরা সব প্রস্তুত হও, এইবারে আমাদের নামতে হবে।'

বিমল বন্দুকটা একবার নেড়ে-চেড়ে পরখ করে, কাঁধের উপরে রেখে বললে, 'আমি প্রস্তুত।'*

---

* বিনয়বাবু স্বয়ং মঙ্গল গ্রহের যে বর্ণনা লিখেছেন, আমাদের কথার চেয়ে তা বেশী চিত্তাকর্ষক হবে বলে আমরা এবার থেকে তাঁর ডায়েরির লেখাই তুলে দেব। বিনয়বাবুর ডায়েরিতে মঙ্গল গ্রহের যে-সব অদ্ভুত তথ্য আছে, তার অধিকাংশই প্রমাণিত সত্য; যাঁদের বিশ্বাস হবে না, তাঁরা এ-সম্বন্ধে সিয়া-প্যারেলি, লাওয়েল, গান, স্ট্যান্লি উইলিয়ম্স্ ও ফ্লামেরিয়ন প্রভৃতি বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতামত পড়ে দেখতে পারেন।—ইতি লেখক।

এক লাফে সাগর পার

উড়োজাহাজ একটা শহরের প্রান্তে এসে নামল।

সঙ্গে সঙ্গে শহরের ভিতর থেকে কাতারে কাতারে বামন এসে উড়োজাহাজের চারিদিক ঘিরে ফেললে। তাদের গোল-গোল ভাটার মতো চোখগুলো আগ্রহে ও বিস্ময়ে আরো বিস্ফারিত হয়ে উঠল এবং তাদের সকলেরই মুখে একই জয়ধ্বনি—'হংচা হং—হংচা হং!'

উড়োজাহাজের একদিককার প্রধান দেওয়ালটা অনেকখানি সরে গেল এবং সেইখানে একদল বামন-সেপাই বর্শা তুলে দুইধারে সার বেঁধে দাঁড়াল—যাতে বাইরের বামনরা হুড়মুড় করে ভিতরে না ঢুকে পড়তে পারে।

কেবল একজন বামন—বোধহয় সে উড়োজাহাজের কর্তা—এগিয়ে গিয়ে নিচে নেমে পড়ল। বাইরে জনতার ভিতর থেকেও তিনজন জমকালো-পোশাক-পরা বামন বেরিয়ে এসে দাঁড়াল।

আমরা সবাই এক জায়গায় দল বেঁধে দাঁড়িয়ে বামনদের কাণ্ড দেখতে লাগলুম।

বিমল বললে, 'দেখুন বিনয়বাবু, ওরা কথা কইতে কইতে ক্রমাগত আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে।'

আমি বললুম, 'বোধহয় আমাদেরই কথা হচ্ছে। তোমরা কেউ ব্যস্ত হয়ো না—শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে দেখ, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

উড়োজাহাজের কর্তা হঠাৎ একটা ভেরীতে জোরে ফুঁ দিলে এবং বোধহয় তাহার উত্তরেই শহরের ভিতর থেকেও আর একটা ভেরীর তীব্র আওয়াজ হল। তার একটু পরেই দেখা গেল শহর থেকে পঙ্গপালের মতন দলে দলে বামন-সেপাই বেগে বেরিয়ে আসছে।

কুমার সভয়ে বলে উঠল, 'এইবারে ওরা আমাদের আক্রমণ করবে।'

আমি বললুম, 'আমরা যদি ওদের কথা শুনি, তাহলে ওরা নিশ্চয়ই আক্রমণ করবে না।'

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, দেখুন—দেখুন। সেপাইদের সঙ্গে প্রকাণ্ড কি-একটা যন্ত্র আসছে। ওটা কি এদেশী কামান?'

তাই তো, মস্তবড় একটা ঘণ্টার মত কী ওটা? উঁচুতে সেটা পঞ্চাশ-ষাট ফুট ও চওড়ায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুটের কম নয় এবং যন্ত্রটা টেনে আনছে কতকগুলো অদ্ভুত আকারের জন্তু। এ জন্তুগুলোকে দেখতে অনেকটা উটের মত, তবে উটদের শিং থাকে না, কিন্তু এদের প্রত্যেকের মাথায় একটা করে খুব লম্বা শিং আছে। আর এদের আকারও উটের চেয়ে অনেক ছোট এবং গায়ের বর্ণও মিশমিশে কালো। এগুলো মঙ্গল গ্রহের গরু, না ঘোড়া?

উড়োজাহাজের কাছে এনে যন্ত্রটা দাঁড় করানো হল। দেখলুম তার তলায় চারখানা বড় বড় চাকা রয়েছে। পাশে দাঁড়িয়ে একজন বামন কি-একটা কল টিপে দিলে, অমনি সেই ঘণ্টার মতন যন্ত্রটা উপরপানে উঠে এমনভাবে কাত হয়ে রইল যে, তার গর্তের দিকটা এল উড়োজাহাজের দিকে।

ধাঁ করে আমার মাথায় একটা সন্দেহ জেগে উঠল। যে-রকম শোষক-যন্ত্রের সাহায্যে বামনরা আমাদের পৃথিবী থেকে ধরে এনেছে, এটাও তারই রূপান্তর নয় তো?···নিশ্চয়ই তাই।

বিমলকে বললুম, 'বিমল, তোমার বন্দুকের জারিজুরি আর খাটছে না। এরা আবার একটা নতুন রকম শোষক যন্ত্র এনেছে।'

বিমল বললে, 'কেন, কী মতলবে?'

'আমরা যদি ওদের কথামত কাজ না করি, তাহলে ওরা ঐ যন্ত্র দিয়ে আবার আমাদের শুষে নেবে। ও যন্ত্রের শক্তি দেখেছ তো?'

বিমল বিষণ্ণ ভাবে মাথা নেড়ে বললে, 'তাহলে আপাতত বামনদের কথামতই কাজ করা যাক—কী বলেন?'

'নিশ্চয়ই। ওদের কথা শুনলে আমাদের লাভ বই লোকসানও তো নেই!'

'কিন্তু ওরা যদি আবার কুকুর-বিড়ালের মত আমাদের বন্দী করে রাখবার চেষ্টা করে?'

'উপায় নেই।'

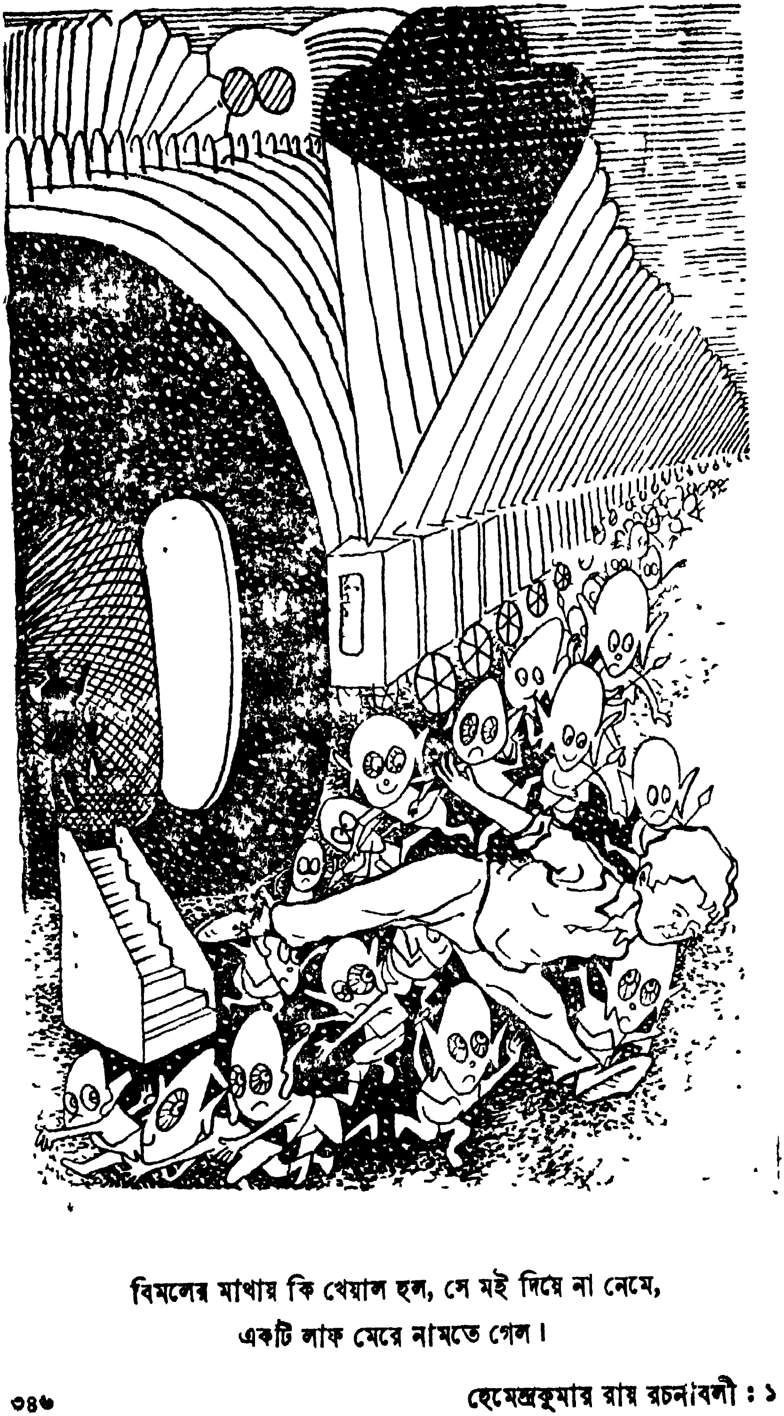
বিমল ম্লান মুখে স্তব্ধ হয়ে রইল। ইতিমধ্যে একদল বামন-সেপাই ভয়ে ভয়ে আমাদের দিকে খানিক এগিয়ে এল, তারপর তফাত থেকেই ইসারা করে আমাদের উড়োজাহাজ ছেড়ে নামতে বললে।

সকলের আগেই সুবোধ বালকের মত বিমল অগ্রসর হল। বাইরে হাজার হাজার বামন-সেপাই হাজার হাজার সোনার বর্শা তুলে প্রস্তুত হয়ে রইল—একটু বেগতিক দেখলেই আমাদের আক্রমণ করবে।

উড়োজাহাজ থেকে নামবার জন্যে এক জায়গায় প্রায় তিনফুট উঁচু একখানা মই লাগানো ছিল। বিমলের মাথায় কি খেয়াল হল, সে মই দিয়ে না নেমে, একটি লাফ মেরে নামতে গেল—কিন্তু পর-মুহূর্তেই তার দেহ মাটি থেকে প্রায় পনেরো হাত উঁচুতে গিয়ে উঠল এবং তারপর প্রায় ত্রিশ হাত তফাতে, বামন-সিপাইদের মাঝখানে ধুপ করে গিয়ে পড়ল।

বামনরা সবাই মহাবিস্ময়ে ও আতঙ্কে চীৎকার করে বিমলের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। এমন ব্যাপার বোধহয় তারা জীবনে কখনো দেখেনি।

আমরাও সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলুম—এ কী অমানুষিক কাণ্ড!



বিমলের মাথায় কি খেয়াল হল, সে মই দিয়ে না নেমে,
একটি লাফ মেরে নামতে গেল।

পলায়ন

বিস্ময়ের প্রথম চমকটা কেটে যাবার পরেই একটা মস্ত কথা আমার মনে পড়ে গেল—মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ হচ্ছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের একশো ভাগের আটত্রিশ ভাগ মাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে যার ওজন হবে একশো সের, মঙ্গলে তার ওজন আটত্রিশ সেরের চেয়ে বেশী হবে না। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপও পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগের বেশী নয়।

বিমলের এই আশ্চর্য লম্ফত্যাগের গুপ্ত রহস্য আমি অল্প কথায় যারা বুঝতে পারলে তাদের বুঝিয়ে দিলুম।

এদিকে বামনরা সবাই মনে করলে, বিমল তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তখনি একদল বামন বিমলের দিকে বেগে ছুটে গেল, আর একদল এগিয়ে এল সেই ভীষণ শোষক-যন্ত্র নিয়ে আমাদের দিকে।

মনে মনে আমি প্রমাদ গুণলুম। আবার ঐ ভয়ানক যন্ত্র যদি আমাদের গ্রাস করে, তাহলে আর আমরা বাঁচব না। বাঁচলেও চিরকাল শিকল-বাঁধা জন্তুর মত কারাগারে বাস করতে হবে।

কুমার তার বন্দুক তুললে।

আমি বললুম, 'রাখ তোমার বন্দুক! যদি বাঁচতে চাও, পালাও।'

'পালাব? কোথায় পালাব?'

'বাইরে লাফ মারো।'

'বামনরাও তো আমাদের পিছনে আসবে।'

'এলেও ওরা আমাদের মত লাফ মারতে পারবে না। দেখলে না, বিমলের লাফ মারবার ক্ষমতা দেখে ওরা কিরকম হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল! আর কথা নয়—দাও লাফ!'

এই বলেই বাইরের দিকে আমি দিলুম এক লাফ। সেই এক

লাফেই আমি একেবারে তিনতলার সমান উঁচুতে উঠে প্রায় চল্লিশ হাত জমি পার হয়ে গেলুম। নামবার সময় ভাবলুম, এত উঁচু থেকে পড়ে হয়ত আমার হাড়গোড় গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যাবে। কিন্তু যখন ফের মাটিতে এসে অবতীর্ণ হলুম, তখন টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলুম বটে, কিন্তু দেহের কোথাও একটুও চোট লাগল না। আমি মাটি থেকে উঠতে না উঠতেই আমার চারপাশে ধপাধপ করে আমার অন্যান্য সঙ্গীরা ঠিক ল্যাজকাটা হনুমানের মতন একে একে মাটির উপরে এসে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। সে এক অবাক কাণ্ড! ...আমাদের কাছাকাছি যত বামন ছিল, তারা তো ভয়ে কোথায় চম্পট দিলে তার কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

আমরা উঠে আবার এক-এক লাফ মারলুম—আবার অনেকটা তফাতে গিয়ে পড়লুম। তার পরেই দেখি, সামনে একটা চওড়া খাল—যার জল আসছে সুদূর মেরুর তুষার-সাগর থেকে। পৃথিবীতে থাকলে এ খাল পার হতে গেলে আমাদের সাঁতার দিতে হত, আজ কিন্তু এক-এক লাফে খুব সহজেই আমরা খাল পার হয়ে গেলুম।

বিমল যাচ্ছিল আমাদের আগে, লাফের পর লাফ দিতে দিতে। ...এইভাবে অতি শীঘ্রই আমরা শত্রুদের কাছ থেকে প্রায় তিন মাইল তফাতে গিয়ে পড়লুম। তারপর লাফ মারা বন্ধ করে বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, এইবারে বিশ্রাম করা যাক, বড় হাঁপ ধরছে।'

পিছনে চেয়ে দেখলুম, কোনদিকে শত্রুর চিহ্ন নেই—কেবল আমাদের সঙ্গীরা মস্ত মস্ত লাফ মেরে এগিয়ে আসছে।

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'বিমল ভায়া, এখনি বিশ্রাম করলে তো চলবে না। বামনরা যদি উড়োজাহাজ নিয়ে আমাদের আক্রমণ করে, তাহলে আমরা এই খোলা জায়গায় কিছুতেই আত্ম-রক্ষা করতে পারব না!'

বিমল হতাশভাবে বললে, 'তাহলে উপায়?'

রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, খানিক তফাতে ঐ একটা ছোট পাহাড় রয়েছে, ওখানে হয়ত লুকোবার ঠাঁই পাওয়া যেতে পারে।'

রামহরি বড় মন্দ কথা বলেনি। আমরা আবার কয় লাফে সেই পাহাড়ের কাছে গিয়ে হাজির হলুম। রামহরি মানুষ-ক্যাঙারুর মতন লাফাতে লাফাতে পাহাড়ের উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। মিনিট-পাঁচেক পর ফিরে এসে সে জানালে, পাহাড়ের ভিতরে খুব বড় একটা গুহা আছে—সেখানে আমাদের সকলের স্থান-সঙ্কুলান হতে পারে।

ঠিক সেই সময়েই আকাশে কিসের একটা শব্দ উঠল। মুখ তুলে চেয়ে দেখি, বামনদের উড়োজাহাজ। একখানা নয়, দু-খানা নয়, একেবারে বিশ-পঁচিশখানা!

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'চল চল, গুহায় চল।'

আবার উড়োজাহাজ

পাহাড়টা বেশী উঁচু নয়—বড়-জোর দুশো ফুট। তার গায়ে কোথাও গাছপালার চিহ্ন নেই। আমরা সকলে সেই কালো, ন্যাড়া পাহাড়ের অলিগলি পথ দিয়ে লাফাতে লাফাতে উপরে উঠে একটা জায়গায় গিয়ে দেখলুম, সামনেই একটা মস্ত গুহা।

সব-আগে আমি ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। গুহাটির মুখ ছোট বটে, কিন্তু ভিতরটা বেশ লম্বা-চওড়া—সেখানে অন্তত একশো জন লোক অনায়াসেই হাত-পা ছড়িয়ে বাস করতে পারে।

গুহার ভিতর থেকে সবাইকে আমি চেঁচিয়ে ডাকলুম।

সকলে একে-একে গুহার ভিতরে এসে ঢুকল।

আমি বললুম, 'এখন আমরা কতকটা নিরাপদ হলুম।'

কমল বললে, 'কিন্তু আমরা খাব কী? মানুষ তো আর না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না!'

আমি বললুম, 'আগে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাই, তারপর পেটের কথা ভাবা যাবে-অখন।'

বামনদের উড়োজাহাজগুলোর শব্দ তখন খুব কাছে এসে পড়েছে। গুহার মুখ থেকে আকাশের দিকে উঁকি মেরে আমি দেখলুম, অধিকাংশ উড়োজাহাজ নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু দু-খানা উড়োজাহাজ এই পাহাড়ের ঠিক উপরেই ঘুরছে, ফিরছে—দানব-দেশের বিপুল দুটো ডানা-ছড়ানো চিলের মত। এরা বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে, আমরা এই পাহাড়ের ভিতরেই লুকিয়ে আছি।

হঠাৎ আবার সেই ভীষণ শব্দ জেগে উঠল—যেন হাজার হাজার শ্লেটের উপরে কারা হাজার হাজার পেন্সিল ঘর্ষণ করছে।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'সাবধান, কেউ গুহার বাইরে যেও না। বামনরা আবার শোষক-অস্ত্র ব্যবহার করছে।'

একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা গুহার ভিতরে ঢুকে সকলকে কাঁপিয়ে দিলে। আমি গুহার মুখ ছেড়ে কয়েক পা পিছিয়ে এসে দাঁড়ালুম—কী জানি বলা তো যায় না।

শব্দ আরো বেড়ে উঠল। গুহার ভিতর থেকেই দেখা গেল, পাহাড়ের গা থেকে একরাশি নুড়ি ও কতকগুলো ছোট-বড় পাথর সেই শোষক-যন্ত্রের বিষম টানে হু-হু করে শূন্যে উঠে গেল।

বিমল সভয়ে বললে, 'বাইরে থাকলে এতক্ষণে আমাদেরও ঐ দশা হত।'

আচম্বিতে শব্দটা আবার থেমে গেল—ঠাণ্ডা হাওয়াও আর বইছে না।

আমি আবার ধীরে ধীরে গুহার মুখে এগিয়ে গেলুম। মাথা বাড়িয়ে উপরপানে তাকাতেই দেখলুম, উড়োজাহাজ দু-খানা ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের দিকে নেমে আসছে।

সকলেই তখন গুহাতলে শুয়ে বা বসে বিশ্রাম করছিল, আমার কথা শুনে সকলেই আবার লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

বিমল শুষ্ক স্বরে বললে, 'আসুক ওরা। আমরা যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেব, তবু ওদের হাতে আর বন্দী হব না।'

অন্য সকলেও উচ্চ স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত।'

আমি বললুম, 'তোমরা ঠাণ্ডা হয়ে আমার কথা শোন। আপাতত বোধহয় কারুকে প্রাণ দিতে হবে না। তোমাদের মনে আছে তো, এদের উড়োজাহাজ এমন জিনিস দিয়ে তৈরী, যা বন্দুকের গুলি সইতে পারে না। বিমল আর কুমার বন্দুক ছুঁড়লেই উড়োজাহাজ দু-খানা নিশ্চয়ই জখম হয়ে পালিয়ে যাবে।'

বিমল বললে, 'ঠিক কথা। কুমার, শিগগির বাইরে এস।'

বিমল আর কুমার বন্দুক নিয়ে গুহার মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি বললুম, 'তোমরা কিন্তু গুহার মুখ ছেড়ে এগিয়ে যেও না—ওরা আবার শোষক-যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে।'

আমিও গুহার মুখে গিয়ে দেখলুম, উড়োজাহাজ দু-খানা খুব কাছে নেমে এসেছে। বন্দুকের লক্ষ্যের মধ্যে না-আসা পর্যন্ত বিমল ও কুমার অপেক্ষা করতে লাগল।

উড়োজাহাজ আরো নিচে নেমে এল—ক্রমে আরো, আরো নিচে।

বিমল লক্ষ্য স্থির করতে বললে, 'কুমার, সময় হয়েছে। যে উড়োজাহাজখানা বেশী নিচে নেমেছে, ওরই ওপরে গুলি চালাও।'

দুজনেই পরে পরে বন্দুক ছুঁড়লে। সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে দুটো উচ্চ ও তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল—ইঞ্জিনের 'কু' দেওয়ার মত।

আমি সানন্দে বললুম, 'তোমরা লক্ষ্য ভেদ করেছ—সাবাস, সাবাস! ঐ শোন, উড়োজাহাজের বায়ুহীন কামরার ভিতরে বাতাস ঢোকার শব্দ হচ্ছে।'

বিমল ও কুমার উৎসাহিত হয়ে আবার বন্দুক ছুঁড়লে এবং বন্দুকের ধ্বনির প্রতিধ্বনি থামতে না থামতে আরো দুটো তীব্র 'কু' শব্দ যেন আকাশের বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে লাগল।

উড়োজাহাজ দু-খানা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে তীরবেগে পলায়ন করলে।

বিমল আনন্দে লম্ফ ত্যাগ করে বললে, 'জয়, বন্দুকের জয়!'

চতুষ্পদ পক্ষী

সূর্য অস্ত গেছে।

চারিধারে মরুভূমির রাঙা বালি, তারই মাঝখানে এই ছোট পাহাড়টি। ভাগ্যে মঙ্গলের অবহাওয়া পৃথিবীর চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা, নইলে আজ সারা দিনে আমাদের অবস্থা নিশ্চয়ই বিষম শোচনীয় হয়ে উঠত। তবু তাপ যা পাচ্ছি, তাও বড় সামান্য নয়।

মঙ্গলের এই মরুভূমির আর এক বিশেষত্ব, এখানে জলের জন্যে একটুও ভাবতে হচ্ছে না। কারণ মরুভূমির বুক চিরে খালের পর খাল চলে গেছে, তাদের কানায় কানায় পরিষ্কার স্বচ্ছ জল টলমল করছে। পাহাড় থেকে প্রায় আধ মাইল তফাতেই একটি খাল,— আমরা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে জলপান করে আসছি। আমাদের সঙ্গে জল রাখবার পাত্র থাকলে বারবার আনাগোনা করতেও হত না। তবে, এখানে আধ মাইল পথ যেতে বেশীক্ষণ লাগে না, কারণ এখন আমরা এক-এক লাফে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারি কিনা!

খালের ধারে ধারে বন-জঙ্গল আর শস্যখেতের পর শস্যখেত। কিন্তু এখানকার গাছপালা সব ছোট ছোট—বোধহয় মাটির গুণ। একরকম গাছ এখানে খুব বেশী রয়েছে—দেখতে অনেকটা খেজুর গাছের মত এবং এইগুলোই এখানে সবচেয়ে বড় জাতের গাছ। বন-জঙ্গলের মধ্যে তিন-চার রকম পাখিও দেখলুম, কিন্তু পৃথিবীর কোন পাখির সঙ্গেই তাদের চেহারা মেলে না। একরকম পাখির আকার বড়ই অদ্ভুত। তাদের দেহ চিলের মত বড়, কিন্তু গায়ের রঙ একেবারে বেগুনি। তাদের পা চারটে করে, আর ল্যাজও পাখির মত নয়—হনুমানের মত লম্বা, ডগায় তেমনি লোমের গোছা। এই আশ্চর্য চতুষ্পদ পাখিগুলো আমাদের দেখেই তাড়াতাড়ি উড়ে পালিয়ে যেতে লাগল।

রাত্রি এল। আকাশে উঠল চাঁদ—কিন্তু তাদের আলো এত কম যে, অন্ধকার দূর হয় না বললেই চলে।

আজ সারা দিন অনাহারে কেটে গেল। কালও যে খেতে পাব, তার কোন আশা দেখছি না। গুহার ভিতরে প্রায় সকলেই শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কেবল আমি, বিমল, কুমার আর কমল অন্ধকারে জেগে বসে আছি।

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, এখন উপায় কী? খালি জল আর হাওয়া খেয়ে তো প্রাণ বাঁচবে না!'

আমি বললুম, 'এক আত্মসমর্পণ ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না। এখন মনে হচ্ছে, পালিয়ে এসে আমরা ভালো করিনি।'

কুমার বললে, 'আর আত্মসমর্পণ করাও চলে না। এখন আমাদের হাতে পেলে বামনরা আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই ভালো ব্যবহার করবে না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু এখানে থাকলেও আমাদের তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে হবে!'

সকলেই স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল।

বাইরে রাত তখন থমথম করছে।

আচম্বিতে আমাদের সকলকেই স্তম্ভিত করে, মরুভূমির বুক থেকে এক বিকট চীৎকার জেগে উঠল—'বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ!' তার পরেই আবার সব চুপচাপ!

বিমল সচকিত স্বরে বললে, 'কে এখানে মানুষের ভাষায় আর্তনাদ করছে?'

কুমার বললে, 'বামনরা কি কোন মানুষকে হত্যা করছে?'

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম—এ আবার কী ব্যাপার!

ফের সেই বিকট আর্তনাদ: 'বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ!'—আবার সব চুপ।

বিমল বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল। আমি তার হাত

চেপে ধরে বললুম, 'যেও না।'

বিমল বললে, 'কেন?'

'বুঝতে পারছ না, এ মানুষের গলার আওয়াজ নয়।'

'তবে এ কী?'

'কাল সকালে খোঁজ নিলেই চলবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিমল আবার বসে পড়ল।

বাইরে, মরুভূমির ভয়-মাখানো আলো-আঁধারের দিকে তাকিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলুম;—গভীর রাত্রে এমন নির্জন স্থানে এই রহস্যময় আর্তনাদের কারণ কী? এ আমাদের চির-চেনা পৃথিবীর নয়, এখানকার সমস্ত ব্যাপারই অপূর্ব, প্রত্যেক পদেই নব-নব বিস্ময় আর বিপরীত কাণ্ড, কাজেই কোন হদিশ না পেয়ে সে-রাত্রের মত আমি নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করলুম। ঘুমোবার আগে আর সেই নিশীথ রাতের ভীষণ আর্তনাদ শুনতে পাইনি।

পরদিন প্রভাতে বাইরে বেরিয়ে আমরা পাহাড়ের চূড়ায় বসে পরামর্শ করছি, এমন সময় কমল চেঁচিয়ে উঠল—'দেখুন, দেখুন কারা সব যাচ্ছে!'

তাড়াতাড়ি পাহাড়ের ধারে গিয়ে দেখলুম, নিচ দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন বামন সারি সারি অগ্রসর হচ্ছে। তাদের অনেকেরই মাথার উপরে এক-একটা ঝাঁকা বা মোট বা বড় বড় পাত্র, কেউ কেউ পৃথিবীর মত বাঁকও বহন করছে। ঝাঁকাগুলো নানারকম ফল-ফসলে পরিপূর্ণ। বোধহয় এরা দূর গ্রাম থেকে শহরের বাজারে মাল বিক্রি করতে চলেছে। আমাদের খবর নিশ্চয়ই এরা জানে না, তাহলে কখনই এ পথ মাড়াবার ভরসা করত না!

বিমল মহা উৎসাহে বলে উঠল, 'ভাইসব, সামনেই খানা তৈরী! এস আমরা ওদের আক্রমণ করি!' বলেই তো সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল, আমরাও তার পিছনে পিছনে চললুম।

পাহাড় থেকে নিচে নামবামাত্রই বামনরা বিমলকে দেখতে পেল। জীবনে এই প্রথম মানুষের চেহারা দেখে প্রথমটা তারা

ভয়ানক হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর বিমলের পিছনে আবার আমাদের সবাইকে দেখে তারা বিষম এক আর্তনাদ করে পালাবার উপক্রম করলে, অমনি বিমল দিলে এক তিন-তালা উঁচু লম্ফ,—সঙ্গে সঙ্গে আমরাও লাফ মারলুম।···চোখের নিমেষে আমরা তাদের মোটমাট সমস্তই কেড়ে নিলুম, তারা কোনই বাধা দিলে না, প্রাণ নিয়ে প্রাণপণে তারা যে যেদিকে পারলে পলায়ন করলে।

রামহরি এক গাল হেসে বললে, 'খোকাবাবু, তোমরা একেলে ছেলে, ভগবান মান না, কিন্তু এই দেখ, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দিলেন তিনি।'

অবাক কারখানা

আহারাদির পরে সবাইকে ডেকে আমি বললুম, 'দেখ, এ-রকম করে তো আর বেশীদিন চলবে না, এখন আমাদের কর্তব্য স্থির করতে হবে। নইলে কাল থেকে আবার অনাহার ছাড়া আর কোন উপায় তো আমি দেখছি না।'

কুমার বললে, 'হ্যাঁ, এ পথ দিয়ে ভবিষ্যতে আর যে বামনের দল ফল-ফসল নিয়ে যাতায়াত করবে, তাও তো আমার মনে হয় না।'

বিমল একটু ভেবে বললে, 'আজ রাত্রে একবার শহরের দিকে লুকিয়ে গেলে হয় না?'

আমি বললুম, 'কেন?'

বিমল বললে, 'বামনরা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে নেই, আমাদের বন্দী করবার জন্যে তারা নিশ্চয়ই কোন উদ্যোগ-আয়োজন করছে। তারা কী করছে আগে থাকতে জানতে না পারলে পরে আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব না।'

আমি বললুম, 'তোমার পরামর্শ মন্দ নয়। সুবিধে পেলে শহর থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্যও লুঠ করে আনা যাবে,—কী বল?'

বিমল হেসে বললে, 'নিশ্চয়! দলে আমরাও তো কম ভারি নই, আমরা প্রত্যেকেই শুধু হাতে আট-দশ জন বামনকে অনায়াসে বধ করতে পারি। বামনরা আমাদের মত লাফাতেও পারে না, বেগতিক দেখলে লাফিয়ে লম্বা দিলেই চলবে।'

হঠাৎ বাইরে থেকে শব্দ এল—'বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ!'

এ সেই কালকের রাতের আর্তনাদ।

আমরা সবাই তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে গেলুম, কিন্তু পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে মরুভূমির চারিধারে চেয়েও কোথাও জনপ্রাণীকে দেখতে পেলুম না।

রামহরি বললে, 'ঠিক দুপুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা,—খোকাবাবু, এ সব ভুতুড়ে ব্যাপার!' তারপরেই দূর থেকে আর এক চীৎকার শোনা গেল—ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ।

এ আবার কি, এ যে কুকুরের চীৎকার!

রামহরি চোখ পাকিয়ে বললে, 'এ ভূত না হয়ে যায় না—কখনো মানুষের মত, কখনো কুকুরের মত চেঁচাচ্ছে। এস বাবুরা, পালিয়ে এস।'

দূর থেকে কুকুরের চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে খুব কাছে, একেবারে আমাদের মাথার উপর থেকে আবার সেই আর্তনাদ শোনা গেল—বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ! বাপ বাপ, বাপরে বাপ!

চমকে উপরে তাকিয়ে দেখি, পাহাড়ের টঙে হনুমানের মত ল্যাজ-ওয়ালা সেই আশ্চর্য চতুষ্পদ পক্ষী বসে আছে। সেই পাখিটাই অমন বিকট স্বরে ডাকছে।

কমল বললে, 'পাখির ডাক মানুষের শব্দের মত। অবাক কারখানা!'

কিন্তু দূরে কুকুরের চীৎকার তখনো থামেনি। আমরা চারিদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দেখলুম, খালের জল থেকে ডাঙায় উঠে

একটা মিশমিশে কালো মস্ত জানোয়ার বেগে ছুটতে সুরু করলে। খানিক পরেই জানোয়ারটা পাহাড়ের কাছে এসে পড়ল—সেটা কুকুরই বটে।

কুমার বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই আমার বাঘা!' বলেই সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল, আমরাও তার পিছনে পিছনে চললুম।

কুমার চেঁচিয়ে ডাক দিলে, 'বাঘা, বাঘা, বাঘা!'

কুকুর পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘেঁষে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমারের ডাক শুনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরে খুব জোরে চীৎকার করতে করতে তীরের মতন বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। হ্যাঁ, এ যে বাঘা, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

বাঘা ছুটে এসে একেবারে কুমারের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল, কুমার মহানন্দে তাকে নিজের কোলের ভিতরে টেনে নিলে।

আমি দেখলুম, বাঘার গলা থেকে একগাছা সোনার শিকলের আধখানা ঝুলছে। বাঘা নিশ্চয়ই শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে।

বাঘা তারপর বিমল, রামহরি, কমল ও আমার কাছেও এসে ল্যাজ নেড়ে মনের খুসি জানালে ও আমাদের গা চেটে দিয়ে বা পায়ের কাছে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে সকলকে বুঝিয়ে দিলে যে, তার নূতন আর পুরাতন কোন বন্ধুকেই সে ভুলে যায়নি।

বাঘাকে ফিরে পেয়ে আমাদেরও কম আনন্দ হল না। এই নূতন জগতে এসে পৃথিবীর সমস্তই আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছে, কুকুর বলে বাঘাকে আর ছোট ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে না। উড়ো-জাহাজে যে বানরদের দেখেছিলুম, তারাও যদি কোন গতিকে আসতে পারে, তাহলে তাদেরও আমি আদর করে আশ্রয় দিতে নারাজ হই না! তারাও যে পৃথিবীর জীব, আমাদের প্রাণের সঙ্গে তাদেরও যে যোগ আছে!

বামনদের আস্তানায়

সন্ধ্যা উৎরে গেছে। আকাশের দুই চাঁদ যেন পরস্পরকে দেখে হাসতে সুরু করে দিয়েছে—যদিও তাদের হাসির ক্ষীণ আলো চারিদিকের আবছায়া দূর করতে পারছে না।

আমরা একে একে পাহাড় থেকে মরুভূমিতে এসে নামলুম, তারপর সকলে মিলে যাত্রা করলুম বামনদের শহরের দিকে। সব-আগে রইল বন্দুক নিয়ে বিমল ও কুমার, তারপর আমি, কমল ও রামহরি, তারপর আর সকলে। বিমল ও কুমারের পকেটে দু'খানা বড় ছোরা ছিল, আমি আর কমল সে দু'খানা চেয়ে নিলুম। অন্য সকলে বন থেকে গাছের এক-একটা মোটা ডাল ভেঙে নিলে—দরকার হলে তা দিয়ে বামন বধ করা কিছুমাত্র শক্ত হবে না। মানুষের হাতের অমন লম্বা ও মোটা ডালগুলোর কাছে বামনদের ক্ষুদে তরোয়ালগুলো একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এক-এক লাফে আমরা খাল পার হয়ে গেলুম। আমাদের দেখাদেখি বাঘাও লাফিয়ে খাল পার হল—মঙ্গলে এসে তারও লাফ মারবার ক্ষমতা আশ্চর্যরকম বেড়ে গেছে।···

বারবার লাফ মেরে অগ্রসর হলে পাছে হাঁপিয়ে পড়ি, সেই ভয়ে আমরা পায়ে হেঁটেই এগুতে লাগলুম। আর বেশী তাড়া করবারই বা দরকার কী, আমাদের সামনে এখন সারা রাত্রিটাই পড়ে রয়েছে।

ঘণ্টা-আড়াই পরে দূর থেকে বামনদের শহর আবছায়ার মত দেখা গেল। শহরটা দেখেই বাঘা রেগে গরর্-গরর্ করে উঠল, কিন্তু কুমার তখনি তার মাথায় এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললে, 'খবর্দার বাঘা, চুপ্ করে থাক!' বাঘা একেবারে চুপ হয়ে গেল, তারপর একবারও সে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলে না। আশ্চর্য কুকুর।

শহরের ভিতরে মাঝে মাঝে আলো দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু

জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বামনরা বোধহয় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আচম্বিতে বিমল ও কুমার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি বললুম, 'ব্যাপার কী?'

বিমল সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখালে।

তাই তো, প্রকাণ্ড একটা ছায়ার মত, অনেকখানি জায়গা জুড়ে কী ওটা পড়ে রয়েছে?

বিমল চুপি চুপি বললে, 'বিনয়বাবু, উড়োজাহাজ।'

কুমার বললে, 'বোধহয় এইখানাই আমাদের পৃথিবীতে গিয়েছিল।'

আমি বললুম, 'হুঁ, এর আকার দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে। এখানা নিশ্চয় পৃথিবী আক্রমণ করতে যাবে বলে বিশেষভাবে তৈরি হয়েছিল, কারণ মঙ্গলের আর যত উড়োজাহাজ দেখেছি সবই ছোট ছোট। কিন্তু এখানা এমন খোলা জায়গায় পড়ে কেন?'

বিমল বললে, 'বোধহয় শহরের ভিতরে এতবড় উড়োজাহাজ রাখবার জায়গা নেই।'

বিমলের অনুমান সত্য বলেই মনে হল।...আমি নীরবে ভাবতে লাগলুম।

বিমল বললে, 'এখন আমাদের কী করা কর্তব্য?'

ধাঁ করে আমার মাথায় এক ফন্দি জুটে গেল।...এর আগে এমন ফন্দি আমার মাথায় ঢোকেনি কেন, পরে তাই ভেবে আমি নিজের বুদ্ধিকে যথেষ্ট ধিক্কার দিয়েছি, কারণ তাহলে আজ আমাদের মঙ্গল গ্রহে হয়ত আসতেই হত না। আমি বিমলকে বললুম, 'দেখ, এই উড়োজাহাজখানা আমরা যদি আক্রমণ করি, তাহলে কী হয়?'

বিমল বললে, 'এ প্রস্তাব মন্দ নয়। উড়োজাহাজের ভিতরে হয়ত অনেক রসদ আছে। তাতে আমাদের পেটের ভাবনা দূর হতে পারে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু খুব চুপি চুপি কাজ সারতে হবে। কারণ শহরের লোক জানতে পারলে আমাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠবে।'

বিমল বললে, 'দাঁড়ান, আগে আমি দেখে আসি।'

বিমল হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। আমরা স্তব্ধ হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

খানিক পরে বিমল ফিরে এসে বললে, 'আক্রমণের কোনই বাধা নেই। উড়োজাহাজের প্রধান দরজাটা খোলা রয়েছে। সিঁড়ির উপরে বসে একজন বামন-সেপাই ঢুলছে, আমি এখনি এমনভাবে চেপে ধরব, যাতে সে কোন গোলমাল করতে পারবে না। আপনারা চুপি চুপি আমার পিছনে আসুন।'

বিমল আবার হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হল, আমরা সকলেও ঠিক সেইভাবেই তার পিছু নিলুম।

খানিক দূর অগ্রসর হয়েই দেখলুম, উড়োজাহাজের ভিতর থেকে খোলা দরজা দিয়ে একটা আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে। দরজার তলাতেই নিচে নামবার জন্যে সিঁড়ি, ঠিক তার উপর-ধাপে পা ঝুলিয়ে এবং উড়োজাহাজের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসে আছে এক বামন-সেপাই।

আমাদের অপেক্ষা করতে বলে বিমল বুকে হেঁটে আরো খানিক এগিয়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চোখের পলক ফেলতে না-ফেলতে সে মারলে এক লাফ এবং সিঁড়ি টপকে পড়ল গিয়ে একেবারে সেই বামন-সেপাইয়ের বুকের উপরে। তারপর কী হল তা জানি না, কিন্তু বামনটার মুখ থেকে কোনরকম আর্তনাদই আমাদের কানে এসে বাজল না। অল্পক্ষণ পরেই বিমল উঠে দাঁড়াল এবং হাতছানি দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে বললে।

জয়, জয়, জয়

বামনদের বাগে আনতে আমাদের বেশী বেগ পেতে হল না। একেই তো তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল, তার উপরে তারা অস্ত্র

ধরবার সময় পর্যন্ত পেলে না। অস্ত্রগুলো আমরা আগেই কেড়ে নিলুম, তারপর তাদের সবাইকে ভেড়ার পালের মত তাড়িয়ে একটা ঘরের ভিতরে পুরে ফেললুম এবং ইশারায় জানিয়ে দিলুম যে, দুষ্টুমি করলে তারা কেউ প্রাণে বাঁচবে না।

বামনদের দলে লোক ছিল মোট আশি জন। মানুষের তুলনায় তারা এত দুর্বল যে, আমরা ইচ্ছা করলেই তাদের সবাইকে টিপে মেরে ফেলতে পারতুম।

একটা বামন চেঁচিয়ে গোলমাল করে উঠেছিল। কিন্তু কুমার তখনি তাকে খেলার পুতুলের মত মাটি থেকে তুলে মারলে এক আছাড়। তাকে হত্যা করবার ইচ্ছা কুমারের মোটেই ছিল না, কিন্তু সেই এক আছাড়েই বেচারির ভবের লীলাখেলা সাঙ্গ হয়ে গেল একেবারে। লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

আমরা দুঃখিত হলুম, কিন্তু হাতে হাতে এই কঠোর শাস্তি দেখে অন্যান্য বামনরা দস্তুরমত টিট্ হয়ে গেল—সবাই বোবার মত চুপ করে রইল।

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, এইবারে এদের ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে রসদ-টসদ যা আছে লুটপাট করে নেওয়া যাক।'

আমি বললুম, 'না, এইবারে আবার পৃথিবীর দিকে যাত্রা করা যাক।'

বিমল, কুমার ও কমল একসঙ্গে বললে—'পৃথিবীর দিকে যাত্রা!'

রামহরি এত আশ্চর্য হয়ে গেল যে, প্রকাণ্ড হাঁ করে আমার মুখের পানে শুধু তাকিয়ে রইল—একটা কথা পর্যন্ত কইতে পারলে না।

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, এইবারে আমাদের পৃথিবীতে ফিরতে হবে, নইলে শীঘ্র আর ফেরবার সময় পাওয়া যাবে না: কারণ এখনো মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর কাছেই রয়েছে—যতই দেরি করব, ততই সে দূরে চলে যাবে।'

কমল বললে, 'কিন্তু যাব কী করে? আমাদের তো ডানা নেই!'

আমি বললুম, 'যেমন করে এসেছি, তেমনি করেই যাব—অর্থাৎ এই উড়োজাহাজে চড়ে।'

বিমল বললে, 'বিনয়বাবু, আপনি বোধহয় মনের খুসিতে ভুলে গেছেন যে আমরা কেউই এ উড়োজাহাজ চালাতে জানি না।'

আমি বললুম, 'না, আমি কিছুই ভুলিনি। উড়োজাহাজখানা দেখেই আমার মাথায় এই নতুন ফন্দি জুটেছে। আমরা পৃথিবীতেই যাব, আর এই উড়োজাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে ঐ বামনরাই।'

বিমল সানন্দে এক লম্ফ ত্যাগ করে বললে, 'ঠিক, ঠিক! এতক্ষণে আমি বুঝেছি। বামনদের আমরা জোর করে আমাদের সারথি করব—কেমন, এই তো?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ। বামনরা এখন দলে হালকা হয়ে পড়েছে, সেপাইরা সব শহরে আছে। এই হচ্ছে শুভ মুহূর্ত, প্রাণের ভয়ে ওরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রস্তাবে রাজি হবে।'

বিমল আনন্দে অধীর হয়ে বললে, 'জয়, বিনয়বাবুর বুদ্ধির জয়!'

কুমার আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে গদগদ স্বরে বললে, 'বিনয়বাবু, বিনয়বাবু, তাহলে আবার আমরা পৃথিবীতে ফিরতে পারব?'

কমল আর রামহরি পরস্পরের হাত ধরে অপূর্ব এক নৃত্য সুরু করে দিলে। তাদের দেখাদেখি বাঘারও স্ফূর্তি বেড়ে উঠল, সেও লাফিয়ে লাফিয়ে হরেকরকম নাচের কায়দা দেখাতে লাগল, আর এত জোরে ল্যাজ নাড়তে লাগল যে, আমার মনে হল ল্যাজটা বুঝি এখনি ছিঁড়ে ঠিকরে পড়বে!

অন্যান্য সকলেও নানাভাবে ও নানা ভঙ্গীতে আপন আপন মনের আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

আমি বললুম, 'এখনি এতটা আহ্লাদ করে কোন লাভ নেই। আগে দেখ আমরা সত্যিই পৃথিবীতে গিয়ে পৌঁছতে পারি কিনা। তার উপরে বামনরা উড়োজাহাজ চালাতে রাজি হবে কিনা, এখনো তাও আমরা জানি না।'

বিমল চোখ পাকিয়ে বললে, 'কী! রাজি হবে না? তাহলে ওদের কারুকেই আমি আর আস্ত রাখব না!'—বলেই বন্দুক বাগিয়ে সে বামনদের দিকে অগ্রসর হল। আমরাও সদলবলে তার পিছনে পিছনে চললুম।

যে-কয়জন বামন উড়োজাহাজের কলঘরে থাকত, পৃথিবী থেকে আসবার সময়ে আমরা তাদের অনেকবার দেখেছিলুম। তাদের পোশাক সেপাইদের পোশাকের মতন নয়। সেই পোশাক দেখেই বিমল তাদের একে-একে দল থেকে টেনে বার করলে। তারা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

উড়োজাহাজের কলঘর আমরা আগে থাকতেই জানতুম।



বিমলের ইসারা ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বামনদের মুখ শুকিয়ে গেল।

বিমল ইঙ্গিতে তাদের সেদিকে অগ্রসর হতে বললে। তারা সুড়-সুড় করে বিমলের আগে আগে চলতে লাগল!

কুমার ও আরো জন পনেরো লোককে বাকি বামনদের কাছে

পাহারায় নিযুক্ত রেখে আমিও কলঘরের দিকে চললুম। উড়ো-জাহাজের প্রধান দরজা অনেক আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

সবাই কলঘরে গিয়ে ঢুকলুম। মস্ত ঘর। চারিদিকে নানান রকম যন্ত্র রয়েছে—ছোট, বড়, মাঝারি। সমস্ত যন্ত্রই পাকা সোনার তৈরী।

কমল বললে, 'বিনয়বাবু, এই উড়োজাহাজে এত সোনা আছে যে, আমরা সবাই বড়লোক হয়ে যেতে পারি!'

আমি বললুম, 'রও, আগে প্রাণে বেঁচে মানে মানে পৃথিবীতে ফিরে যাই, তারপর সোনাদানার কথা ভাবা যাবে-অখন! এখন এ সোনার কোনই দাম নেই।'

বিমল কলের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইসরায় বামনদের কল চালাতে বললে। বিমলের ইসারা ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বামনদের মুখ শুকিয়ে গেল। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়র মত পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

বিমল ক্রুদ্ধভাবে আবার ইসারা করলে।

কিন্তু বামনরা তবুও যন্ত্রের দিকে এগুল না।

বিমল তখন বন্দুকটা তুলে বামনদের দিকে এগিয়ে গেল।

বন্দুক দেখেই তারা আঁৎকে উঠল, তারপর তীরের মত ছুটে গেল—যন্ত্রপাতির দিকে। আর কারুকে কিছু বলতে হল না। এমনি বন্দুকের মহিমা!

উড়োজাহাজ উপরে উঠতে লাগল—ধীরে, ধীরে, ধীরে।

বিপুল পুলকে আমিও আর চুপ করে থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলুম,—'জয়, পৃথিবীর জয়!'—আমার জয়নাদে অন্য সকলেও যোগ দিলে। সে যে কী আনন্দ, লিখে তা জানানো যায় না।

উড়োজাহাজ আরো উপরে উঠল—আরো—আরো উপরে।

স্বচ্ছ কক্ষতল দিয়ে দেখতে পেলুম, নিচে শহরের চারিদিকে বড় বড় আলো জ্বলে উঠেছে। নিশ্চয়ই উড়োজাহাজের শব্দে শহরের

ঘুম ভেঙে গেছে। হয়ত এখনি শত-শত উড়োজাহাজ আমাদের আক্রমণ করতে আসবে।

বিমল ইসারায় বারংবার শাসিয়ে বলতে লাগল, উড়োজাহাজের গতি বাড়াবার জন্যে।···বামনরা কল টিপে উড়োজাহাজখানাকে ঠিক উল্কার মত বেগে চালিয়ে দিলে, দেখতে দেখতে শহরের আলোগুলো ঝাপসা হয়ে এল। আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম, কারণ শহরের উড়োজাহাজগুলো প্রস্তুত হবার আগেই আমরা বোধহয় নাগালের বাইরে চলে যেতে পারব। বিশেষ, আমাদের উড়োজাহাজের আকার যে-রকম বিশাল, তাতে এর সঙ্গে আর কোন উড়োজাহাজ পাল্লা দিতে পারবে বলে মনে হয় না!

শহরের খুব অস্পষ্ট আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে আমি বললুম—বিদায় মঙ্গল গ্রহ, তোমার কাছ থেকে চির বিদায়! তোমার রক্ত-মরুভূমির কাছ থেকে, তোমার যুগল চন্দ্রের কাছ থেকে, তোমার অপূর্ব জীব-রাজ্যের কাছ থেকে আজ আমরা চির-বিদায় গ্রহণ করলুম। তোমার অনেক রহস্যই হয়ত জানা হল না, কিন্তু যেটুকু দেখবার সুযোগ পেয়েছি, এ-জীবনের পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট, তোমাকে ভালো করে জানবার জন্যে আর আমার কোনই আগ্রহ নেই। পৃথিবীর ডাক আমাদের কানে এসে পৌঁছেছে—বিদায় মঙ্গল গ্রহ, চির-বিদায়!

আবার পৃথিবীতে

সব কথা আর খুঁটিয়ে না বললেও ক্ষতি নেই। কারণ আসবার মুখে আজ পর্যন্ত আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।

বামনদের উপরে আমরা পালা করে দিন-রাত পাহারা দিয়েছি, কাজেই তারাও বাধ্য হয়ে বরাবর উড়োজাহাজ চালিয়ে এসেছে।

সোনার পৃথিবী এখন আমাদের চোখের উপরে ছবির মতন ভাসছে। দেখতে দেখতে আমাদের চোখ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

আমরা পৃথিবীর কোন্ দেশে গিয়ে নামব, তা জানি না। কিন্তু যেখানেই নামি, আমাদের ইতিহাস নিয়ে যে সারা পৃথিবীতে একটা মহা আন্দোলনের সূত্রপাত হবে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। আমাদের মুখের কথায় নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাস করত না; কিন্তু এই অদ্ভুত উড়োজাহাজ আর বামনদের স্বচক্ষে দেখলে আর কেউ সন্দেহ করবার ওজরটুকু পর্যন্ত তুলতে পারবে না।

বামনরা এসেছিল পৃথিবী থেকে নমুনা জোগাড় করতে। আমরাও আজ মঙ্গল থেকে অনেক বিচিত্র নমুনা নিয়ে ফিরে আসছি। শুধু নমুনা সংগ্রহ নয়,—আমরা ফিরছি মঙ্গলকে জয় করে। মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব যে মঙ্গলে নেই, আমরা তা প্রমাণিত করেছি।

কিন্তু এ কী মুস্কিল! শেষটা কি ঘাটে এসে নৌকো ডুববে?

আমরা যখন পৃথিবীর খুব কাছে, আমাদের সকলেরই মুখে যখন নিশ্চিত হাসির লীলা, চোখে যখন নির্ভয় শান্তির আভাস, তখন চারিদিক আঁধার করে আচম্বিতে ঝড়ের এক ভৈরব মূর্তি জেগে উঠল।

তেমন ঝড় আমি জীবনে কখনো দেখিনি। আমাদের এমন যে প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ, ঠিক যেন ছেঁড়া পাতার টুকরোর মতন ঝোড়ো হাওয়ার মুখে ঘুরতে ঘুরতে উড়ে চলল। কোন রকমেই সে বাগ মানলে না। প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যু যেন আমাদের চোখের উপরে নৃত্য করতে লাগল।...

প্রায় চার ঘণ্টা ধরে আমাদের উড়োজাহাজ নিয়ে দিকে দিকে ছোঁড়াছুঁড়ি করে ঝড়ের শখ যেন মিটল। ধীরে ধীরে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস থেমে আসতে লাগল, কিন্তু চারিদিকের নিবিড় অন্ধকার তখনো একটুও কমল না। এ অন্ধকারে পৃথিবীতে নামাও নিরাপদ নয়।

অথচ আমরা নামতে না চাইলেও, উড়োজাহাজ যে ধীরে ধীরে নামছে, সেটা বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারলুম। বামনরা চেষ্টা করেও

তাকে আর উপরে তুলতে পারছে না।—নিশ্চয়ই ঝড়ের দাপটে কোন কল-কব্জা বিগড়ে গেছে।

তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে, উড়োজাহাজখানা আস্তে আস্তে নামছে। নইলে পৃথিবীর উপরে আছড়ে প'ড়ে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, আমাদেরও আর কিছু আশা-ভরসা থাকত না।

কিন্তু কোথায় আমরা নামছি—জলে, না স্থলে? অন্ধকারে কিছুই বোঝবার জো নেই।

যেখানেই নামি, এ যে আমাদের নিজেদের পৃথিবী, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। এ একটা মস্ত সান্ত্বনা। মা-পৃথিবীর সবুজ বুক স্পর্শ করবার জন্যে প্রাণ আমার আনচান করতে লাগল।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে উড়োজাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়াল।

আমরা আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছি!

আমরা সকলে মিলে জয়ধ্বনি করে উঠলুম এবং তাই শুনে বামনরা যেন আরো মুষড়ে পড়ল।

উড়োজাহাজের দরজা খুলে আমি বাইরের দিকে তাকালুম। একে রাত্রি, তায় আকাশ মেঘে ঢাকা। কাজেই দেখলুম, খালি অন্ধকার আর অন্ধকার আর অন্ধকার।

রাত না পোয়ালে কিছুই দেখবার উপায় নেই। আমরা সাগ্রহে প্রভাতের অপেক্ষায় বসে রইলুম। খোলা দরজা দিয়ে মাঝে মাঝে দমকা বাতাস এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে যাচ্ছিল। এ বাতাসকে আমি চিনি। এ আমাদের পৃথিবীর বাতাস। তাকে কি ভোলা যায়?⋯

ঐ ফুটে উঠেছে ভোরের আলো—পুব আকাশের তলায় আশার একটি সাদা রেখার মত। আকাশের বুকে তখনও রাতের কালো ছায়া ঘুমিয়ে আছে এবং সামনের দৃশ্য তখনো অন্ধকারের আস্তরণে ঢাকা। তবে, অন্ধকার এখন অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে বটে।

মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, পৃথিবীর সমস্তই আবছায়ার মতন,—

এখনো গাছপালার সবুজ রঙ চোখের উপরে ভেসে ওঠেনি।

বিমল, কুমার, কমল ও রামহরি আর থাকতে পারলে না, তারা তখনি উড়োজাহাজ ছেড়ে নেমে পড়ল। আমিও নিচে নামলুম— বাঘাও আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না।

আঃ, কী আরাম! এতকাল পরে পৃথিবীর প্রথম স্পর্শ, সে যে কী মিষ্টি! মাটিতে পা দিয়েই টের পেলুম, আমরা স্বদেশে ফিরে এসেছি।

কমল তড়াক করে এক লাফ মেরে বললে, 'হ্যাঁ, এ পৃথিবীই বটে! এক লাফে আমি আর তিন-তলার সমান উঁচু হতে পারলুম না তো!'

খানিক তফাতে হঠাৎ কি একটা শব্দ হল—দুড়ুম, দুড়ুম, দুড়ুম! যেন ভীষণ ভারি পায়ের শব্দ।

আমরা সচমকে সামনের দিকে তাকালুম। অন্ধকারের আবরণ তখনো সরে যায়নি, তবে একটু দূরে প্রকাণ্ড একটা চলন্ত পাহাড়ের কালো ছায়ার মত কি যেন চলে যাচ্ছে বলে মনে হল।



আমরা সবাই স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

বাঘা ভয়ানক জোরে ডেকে উঠল, আমরা সবাই স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

নিজের চোখকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে বলতে পারি, আমাদের সুমুখ দিয়ে যে জীবটা চলে যাচ্ছে, সেটা তালগাছের চেয়ে

কম উঁচু হবে না! তার পায়ের তালে, দেহের ভারে পৃথিবীর বুক ঘন-ঘন কেঁপে উঠছে।...

মহাকায় জীবটা কোথায় মিলিয়ে গেল, কিন্তু তার চলার শব্দ তখনো শোনা যেতে লাগল—দুড়্‌ম, দুড়্‌ম, দুড়্‌ম।

বিমল শুষ্ক স্বরে বললে, 'বিনয়বাবু!'

'অ্যাঁ?'

'ওটা কী?'

'অন্ধকারে তো কিছুই দেখতে পেলুম না।'

'কিন্তু যেটুকু দেখলুম, তাই-ই কি ভয়ানক নয়? এ আমরা কোথায় এলুম?'

'পৃথিবীতে।'

'কিন্তু এইমাত্র যাকে দেখলুম, সে কি পৃথিবীর জীব?'

আমিও অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। ওদিকে আকাশের কোলে শুয়ে উষার চোখ ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল।

ছড়া

॥ প্রলাপ ছড়া ॥

কে সদরে নাড়ছে কড়া এখন রাত্রি দুপুরে?
কে ধরে রে ইলিশ-ছানা উনিশ-বিঘে পুকুরে?
অশোক বাবু? আসুন-আসুন। আসন পেতে আসুন দি,
অমন করে গোসলখানায় খাবেন না আর কাসুন্দি!
রস গোল্লার গোল্লা খতম, রস যে পড়ে চল্‌কে।
বটুক বাবু গুড়ুক টানেন, নেই যদিও কলকে।
কে নাচেরে মৌমাছি-নাচ সুধীর বাবুর আসরে?
কে বাজায় রে ওস্তাদি-সুর ভাঙা ফাটা কাঁসরে?
খোকন ডাকে 'আম, আম, আম।' চাকর দিলে তিনটে আম,
জানেনা সে, খোকন মোদের 'আম' বলে যে বলতে 'রাম।'
গদাই ভায়া পদ্য লিখে সদ্য পাঠায় 'মৌচাকে',
তাই পড়ে আজ ধরল মাথা, তাই ঘোষেদের বৌ-হাঁকে।
গুম্ফ থাকা ভালো কিংবা ভালো দাড়ি কামানো,
এই নিয়ে কি ঘুসোঘুসি যায় না ওদের থামানো।
কোকিল পাখির বাসায় গিয়ে শিখছে যে গান কালপ্যাঁচা,
চট্‌পটাপট্ হাততালি দে, হো-হো করে খুব চ্যাঁচা।
হাবু বাবুর হাস্যে কাঁপে হোগল-কুড়িয়া,
হেথায় করে হাতাহাতি মোগল-উড়িয়া।
বাদলা গেল পাগলা হয়ে দেখে নতুন জোছ্‌না;
ডাকছে খালি—'আয় মেঘ আয় আলোর লিখন মোছ্‌না'।
ভট্ট সতীশ ডাকাচ্ছে নাক, স্তম্ভিত মাস-পয়লা,
গরুগুলো তুললো পটল, খাচ্ছে যে ঘাস গয়লা।

মশার জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে কলের কামান দাগ্‌চি,
শব্দ শুনে ভিরমি গেল শ্রীঅপূর্ব বাগ্‌চী।
চক্ষু মুদে চন্দ্র দেখে পাতালপুরের মাতালরা,
'ডেন্টিষ্ট'দের কবলগত বড় বড় দাঁতালরা।
বেড়াল দেখে মাসী বলে চিনতে পারে শার্দুলরা?
লম্বা লোকের বুদ্ধি বেশী? কিংবা চালাক বাঁটকুলরা?
মা-কালীকে চমকে দিয়ে ধমকে ওঠে পট্‌কা,
'সোনার পাথরবাটিতে আজ কাঁচা ফলার চটকা'।
একটাকাতে একটি মুড়ি অনেক খুঁজেও পেলুম না,
এ শনিবার তাইতে আমি মামার বাড়ী গেলুন না।
সর্বজনীন পূজার ভিড়ে সর্বজনের প্রাণান্ত;
শিঙে-ফোঁকার ইংরেজী কি? জানিনে তার বানান তো!
আমার লেখা প'ড়ে তোমরা ভাবছো কি তাই বল তো,
রাঁচীর মানুষ হচ্ছে মনে, বেশ সেখানেই চল তো!
আমার হয়ে দাও যদি কেউ রাঁচীর ভাড়া চুকিয়ে,
গারদখানায় যেতে বললেও পড়বো নাকো লুকিয়ে

।। কাগজের নৌকো ।।

আকাশ গাঙে বান ডেকেছে রম্-ঝম্-ঝম্-ঝম্
বাজের অট্টহাসে ভুবন করছে রে গম্-গম্!
ধানের ক্ষেতে নদীর দোলা,
কইরে যদু, আয়রে ভোলা!
বৃষ্টিতে আজ ভিজব মজায়, আমরাও নই কম।

তেপান্তরে দাঁড়িয়েছে আজ একটি-কোমর জল,
সাঁতার কাটে দোপাটি আর চাঁপা, জুঁই-কমল!

আন খবরের কাগজ তোরা,
নৌকো জাহাজ গড়ব মোরা,
ভাসব সবাই ভাসিয়ে তরী টল্‌মল্‌ টল্‌মল্‌!

মাঠ সাগরে আজ যে শুনি সাত সাগরের গান,
ওরে, মোদের বক্ষে লাগে নিরুদ্দেশের টান।
কোথায় কঙ্কাবতীর দেশে
পাগলা তরী চলল ভেসে,
দেখবে কোথায় শিবের বিয়ের তিনটি কন্যে দান

তন্দ্রাপুরীর ছন্দা-রাণী কোথায় একেলা
টাট্‌কা স্বপন-ফুলের তোড়া বাঁধছে দু বেলা!
লাল মাছেদের কাছে কাছে
ঝিনুক খুলে মুক্তো নাচে,
প্রবাল ছুঁড়ে জলপরীরা করছে কি খেলা!

রামধনুকের রঙিন মুলুক, রঙের রাজত্ব!
রঙিন রসগোল্লা সেথায় সব রোগে পথ্য!
কাফ্রী রাঙা টুকটুকে রে
আমরাও তাই বুক ঠুকে রে
নাচের রঙের দুলাল হয়ে করছি তিন সত্য।

আনবো তরী বোঝাই করে সোনার পারিজাত,
ঘুমল-ঘাটে ফেলব নঙর এলে কাজল রাত।
ভেট পাঠাবে ঘুমতি-বুড়ী
পদ্ম মুড়ি ঝুড়ি ঝুড়ি
আমরা খেতে বসব পেতে সবুজ কলাপাত!

আকাশ ডাকে বাতাস ডাকে, ডাকছে মেঘের জল,
অঙ্ক কষে, হিষ্ট্রি পড়ে মরবে কে আর বল্ ?
মাষ্টার আজ করবে কামাই,
মিথ্যে কেন মাথা ঘামাই ?
কোমর বেঁধে আজ কাগজের নৌকো ভাসাই চল্।

॥ টাপুর-টুপুর তানে ॥

ভোর না হতে কে এলে গো ? বাদল নাকি ? বটে।
তাই বুঝি নেই আলোর তুলি আজকে আকাশ পটে ?
যেই দিয়েছি জানলা খুলে
শিশুর কলহাসি তুলে
বৃষ্টির ছাট্ ঘরে ঢুকে কি কথা কয় কানে—
টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর তানে।

রবিবারের বৃষ্টি তুমি খেল্‌তে এলে বুঝি ?
ঘরে ঘরে খেলার সাথী করচ খোঁজাখুঁজি।
চল তবে বেরিয়ে পড়ি
মানস-পক্ষীরাজে চড়ি
অজানা সব মাঠে-বাটে অচেনা দেশ পানে—
এই সুমধুর টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর তানে।

মেঘ পাখোয়াজ বাজিয়ে তুমি, জলের নূপুর পায়ে,
বনে বনে কি নাচ নাচো, ছায়ার চাদর গায়ে।
সেই নাচেরি মাতন লেগে
পাগলা ঝোড়ো উঠছে জেগে
দোল দিয়ে যায় জল-থৈ-থৈ ক্ষেতের ধানে ধানে—
একটানা ঐ টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর তানে।

গাঁয়ের পথে পথ নেই আর—নতুন নদীর খেলা,
দস্যি ছেলে ঝাঁপাই ঝোড়ে ভাসিয়ে কলার ভেলা।
বাঁধা-বটের রোয়াকটাতে
ব্যাঙেরা সব আসর পাতে,
থেকে থেকে ময়ূর কোথায় দিচ্ছে সাড়া গানে—
সারা বেলাই টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর তানে।

যেদিকে চাই কেবল দেখি তাজা ছবির বাজার
রং-চঙে কি ফুল ফুটেচে কত হাজার হাজার
ফুলঝুরি ঐ ঝরচে দেয়ার,
থরথরে বুক কদম কেয়ার,
পদ্মপুটে লুকোয় অলি, ভয় জাগে তার প্রাণে—
মন ভরে যায় টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর তানে।

আকাশ চাওয়া বন্ধু এলো আকাশ ছাওয়া বেশে
মন ছোটে মোর শিবঠাকুরের আর তিন কন্যের দেশে
ছেলেবেলা গল্প নিয়ে
বাদল আসে জানলা দিয়ে
পুরোনো দিন নতুন করে ফিরিয়ে যেন আনে—
ঘুম-ভোলানো ঘুম-পাড়ানো টাপুর-টুপুর তানে।

॥ খোকার বীরত্ব ॥

(প্রথমে ভেরী বা বিউগ্‌ল্‌ বাজবে—ফৌজের বাদ্যের অনুকরণে)

(খোকা)

মাগো, তোমার ছেলে ভর্তি হবে রাজার সেপাই-দলে
ডাকলে কামান, এগিয়ে যাব যেথায় লড়াই চলে।

খোকার টুপী ইজের জামায়
দেখবে মানায় কেমন আমায়
বন্দুক আর সঙিন নিয়ে
মাত্‌ব ডাঙ্গায়, জলে—
ভর্তি হব রাজার সেপাই-দলে

(মা)

সোনার যাদু, বুকের রতন
বীর কে হবে তোমার মতন… ?
বাংলা-মায়ের আশিস্‌-মালা
দুলবে তোমার গলে—

(খোকা)

ভর্তি হব রাজার সেপাই-দলে।

(দিদি)

ভাই আমাদের বিজয়-রথে
আসবে ক'রে লড়াই ফতে,
বাঙালীকে দেখব তখন
কে কাপুরুষ বলে!

(খোকা)

ভর্তি হব রাজাই সেপাই-দলে।
(ভেরী বা বিউগল্‌ বাজল)

হব না হীন কেরাণী মা
বলচি আমি সাচ্চা!
কলম ফেলে ধরব অসি
তোমার মরদ বাচ্চা!
ঘরের কোণে ভাত খেয়ে বেশ,
ঘুমোক যত গোবর-গণেশ!

আমার খেলায় জীবন মরণ
হাস্‌বে চরণ-তলে
ভর্তি হব রাজার সেপাই-দলে।

(মা)

মন আছে যার দেশের কাজে
অমর সে যে ভুবন মাঝে
বাংলা মায়ের শ্যামলা-ছেলের
ভয়ে কি প্রাণ টলে?

(খোকা)

ভর্তি হব রাজার সেপাই-দলে।

(দিদি)

ধন্য বিধি, ধন্য বিধি
হয়েছি ভাই তোমার দিদি!
তোমার গুণে দেখব দেশের
সোনার স্বপন ফলে!

(খাকা)

মাগো, তোমার ছেলে ভর্তি হবে রাজার সেপাই-দলে।

(খুব জোরে ভেরী বা বিউগ্‌ল্ বাজিবে)

চিঠি

হেমেন রায়

কলিকাতা
২১ নং পাথুরিয়াঘাটা বাই লেন
................১৩

তা দেখ, বাছা গৌরী-মা,

তুমি আমাকে যত-বড় চিঠি লিখেছ, এবং উত্তরে যত-বড় চিঠি লিখতে আমাকে হুকুম দিয়েছ, তত-বড পত্র লেখবার সময় আপাততঃ আমার নেই। কারণ সিন্দবাদ-কথিত দ্বীপবাসী বুদ্ধের মতন 'নাচঘর' আমার স্কন্ধের উপরে আরোহণ ক'রে আছে জানোতো? আজ তার কপি লিখতে হবে। তার উপরে প্রায় ৮।৯ খানা চিঠির জবাব দিতে হবে (তার ভিতরে মা-পুসার চিঠিও আছে)। অতএব গৌরী-মা, এবারে—

যেমন আমায় ক্ষমা করে মা পুসী
তুমিও তেম্‌নি ক্ষমা ক'রে হও খুশি।

তোমরা তাহলে ওখানে গিয়েও খুব সভা-সমিতিতে আসা-যাওয়া করছ? কিন্তু আমি মফঃস্বলে গেলে কি করি জানো? একটি মনের মত জায়গা বেছে নিয়ে চুপটি করে বসে থাকি। আর নির্জনতাকে উপভোগ করি। কেউ তখন সভা-সমিতির নাম করলে মন তাকে তেড়ে মারতে চায়। পৃথিবীতে ক্রমেই নিস্তব্ধ জায়গার অভাব বেড়ে উঠছে। ছবি—চিরকাল যে বোবা ছিল, বায়স্কোপে গেলে দেখি সেও এখন কথকতা শুরু করে দিয়েছে। 'এভারেষ্টে'র চির-নির্জন ও চির-স্তব্ধ চূড়ার উপরে চড়ে আধুনিক মানবক আজ কোলাহলের সৃষ্টি করেছে। কোথাও স্তব্ধতা নেই। অথচ জানো-কি গৌরী-মা, নির্জনতার ভিতরেই মানুষ নিজের যথার্থ স্বরূপটিকে ধরতে পারে। জনতার ভিতরে সে পাঁচজনের মত হয়ে মেলামেশা করে, নির্জনতার ভিতরে নিজেকে সে একেবারে খুলে ছড়িয়ে দেয়। এই জন্যেই মুনি-ঋষিরা নির্জন ঠাঁই বেছে নিয়ে তপস্যায় বসতেন। এইটুকুই হল আমার এবারকার পত্রের 'ময়্যাল'—নির্জনতা অন্বেষণ কর, নিজেকে চেনো।

তুমি কি ভ্রূ সঙ্কোচ করে চটে যাচ্ছ? এ-সব 'লেকচার' কি তুমি শুনতে প্রস্তুত নও? তাহলে একটি গল্প শোনো:

এক যে ছিল মস্ত হাতী, রাগ হলেই সে উঠত রেগে,
হস্তীমূর্খ বললে পরেই চার পা তুলে ছুটত বেগে।
বিদ্যা তাহার করতে প্রমাণ, খাটিয়ে অনেক নিজের মগজ,
শেষটা সে মা, করলে প্রকাশ একখানা ঐ বাংলা কাগজ।
তার ছিল চার গোদা পায়া, সেইগুলো সে বাড়িয়ে দিত,
বাণীর কুঞ্জে ফুটলে কমল তাই দিয়ে সে মাড়িয়ে দিত।
তার পরে সে মজার ব্যাপার, বুঝলে কিনা গৌরী মাতা!
কাণ্ড যে কি, যদিও আমি তোমার কাছে বলব না তা!

—বললে বিপদের ভয় আছে। কারণ তাহলে এই হস্তীমূর্খটিকে তোমরা যদি চিনে ফেলো, তবে আমার নামে মানহানির মামলা রুজু হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব গল্পটি অসমাপ্তই থাক। তার চেয়ে এখন একটি মেয়ের কথা বলি, যা শুনতে তোমার খুব ভালো লাগবে:—

একটি ছিল দুষ্টু মেয়ে, দুষ্টুমি তার মিষ্টি মাখা,
পরী বলাও চলত তাকে, পৃষ্ঠে যদি থাকত পাখা।
ঝর্ণা যেমন নৃত্যময়ী, তেমনি সেও নৃত্যশীলা,
কইলে কথা, কানের ভিতর দেয় বহিয়ে গানের লীলা।
আমার তরে পান সাজে সে দিয়ে জর্দা, এলাচ, মৌরি—
নামটিও তার নয়কো কটু, সবাই তাকে বলে 'গৌরী'।—

এ মেয়েটির কথা শুনে তোমার হয়তো হিংসা হবে, তুমি হয়তো বলবে, না, এ মেয়েটির কথা শুনতে তোমার একটুও ভালো লাগচে না। কিংবা হয়তো আরো বেশী রেগে বলে বসবে, বাংলা কাগজের পূর্ব কথিত হস্তীমূর্খটির নাম হচ্ছে, 'হেমেন মেশো'!

মা-পুনাকে তোমার পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি—সে পেলে কত খুশী হবে! হরেনের সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা হয়। তর্শুদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তার সঙ্গে ছিলুম। পর্শুদিন তার ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। এবার দেখা হলে তোমার কথা তাকে বলব। ছবি নিয়ে সে এখন ভারি ব্যস্ত।

তুমি লিখতে পারো না বলে দুঃখ করেছ কেন? তুমি তো বেশ চিঠি লেখো। আর একটু ভেবে, মন দিয়ে লিখলেই তুমি বেশ ভালো গল্প লিখতে পারবে। খুব চলতি কথায় সোজাসুজি ভাষায় কিছুমাত্র আয়োজন না করে লিখে যেও, লেখা ভালো হবেই।

ছোট চিঠি লিখতে গিয়ে ক্রমেই পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে। আর সময় নেই।...

গৌরী, একটা কথা। আমি হচ্ছি পেশাদার লেখক। বিনামূল্যে তোমাকে এতখানি লেখা দিতে পারব না। অতএব কলকাতায় এসে আমার লেখার মূল্যস্বরূপ তোমাকে গান গেয়ে শোনাতে হবে। কেমন, রাজি তো? নইলে আর চিঠি লিখব না।

কলকাতায় কবে আসবে, ঠিক দিনটি জানিও। শুনছি তোমরা নাকি কলকাতায় দু-একদিন থেকেই আবার দিল্লী রওনা হবে?

তোমাদের কুশল জানিও। তুমি স্নেহাশীষ নাও। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

হেমেন মেসো

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

২১নং, পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন,

কলিকাতা

তারিখ·········রবিবার······১৩

শ্রীচরণেষু,

আমি মাঝে পেটের অসুখে অত্যন্ত ভুগেছি। কারণ আমাদের ভাড়াটিয়াদের বাড়ীতে আহার। ওরা তেল দিয়ে পোলাও আর মাংস রাঁধে—বোধ হয় এটা পূর্ববঙ্গের দস্তুর; আমার সহ্য হল না। সেই রাত থেকেই পেট নামাতে সুরু করল। উপোস করে আপাততঃ ভালো আছি।

একটা কথা আপনাকে বলতে চাই। আমার কোন ডাক্তার-বন্ধু বললেন, যাঁদের হাত-পা ফোলে, তাঁদের নাকি মেদিনীপুরে কিছুতেই থাকা উচিত নয়। আপনি এখন কেমন আছেন?

একটা সুখবর দি। Dr. Reinhard Wagner সাহেব আমাকে একখানি চমৎকার বাঁধানো মোটা বই উপহার পাঠিয়েছেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রভাত মুখুয্যে ও শরৎ চাটুয্যে প্রভৃতির সঙ্গে আমার পাঁচটি গল্পের জার্মান অনুবাদ আছে। আপনার বোধ হয় মনে আছে Wagner সাহেবকে আমি লিখেছিলুম যে তিনি যে গল্পগুলি পছন্দ করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি গল্প আমার 'Callow days'-এ লেখা। উত্তরে বই পাঠিয়ে তিনি লিখেছেন: 'You will find in it 5 of your stories, among them the two master-pieces "Siuli" and "Kusum". Blessed be the "callow

days" which produce works of such a high standard ! Kusum is scarcely to be surpassed in its psychological development and the art of unuttered feelings, employed in this story, must be highly admired.'

সাহেব আরো লিখেছেন : 'I also hope to translate other short stories from your works later and to publish the Bengali text of Kusum and Siuli in a Bengali Reader of German Sanskrit students' ইত্যাদি। অথচ আপনি বোধ হয় শুনলে অবাক হবেন যে, Wagner সাহেব যে 'কুসুম' গল্পকে 'Master-piece' বলেছেন, সে গল্পটি দুজন বিখ্যাত বাঙালী সম্পাদক খেলো বলে ছাপাতে রাজি হননি ! মণিলাল পরে ঐ গল্পটি প্রশংসা করে 'ভারতী'তে ছাপায়।

ললিতবাবুর ছেলে অরুর মুখে শোনা গেল, পুসী নাকি গেল শুক্রবারে জয়পুর ছেড়েছে। কিন্তু পুসী আজ প্রায় ১৪ ১৫ দিন কোন চিঠি লেখেনি বা আমার পত্রেরও উত্তর দেয়নি। কারণ কিছুই বুঝচি না।

হেবোকে আপনি কি লিখেছেন জানিনা, সে কিন্তু আমার সঙ্গে আপনাকে জবাব দিতে রাজি হল না। তার একজামিন শেষ হয়েছে।

কাগজের রিপোর্টে প্রকাশ, কলকাতায় কলেরার প্রকোপ এখন কমে আসছে। মৃত্যু সংখ্যাও ঢের কমেছে। আমি সাবধান হলে কি হবে, বাড়ীর কেউ তো লুকিয়ে অত্যাচার করতে ছাড়ছে না।

আমার সর্দি এখনও আছে। ব্রায়োনিয়া খেয়েও কমছে না।

আমাদের পাড়ায় সেদিন এক ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে। নন্দ মল্লিকের বাড়ীর পাশের বস্তিতে আগুন লেগে ২৪।২৫ জন স্ত্রীলোক, পুরুষ আর ছেলে-মেয়ে জ্যান্ত পুড়ে মারা গেছে।

নেংকু কেমন আছে ? আশা করি মায়ের শরীর ভালো ? আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

সেবক

হেমেন্দ্র